মাসুদ রানা

কোকেন সম্রাট-১

কাজী আনোয়ার হোসেন

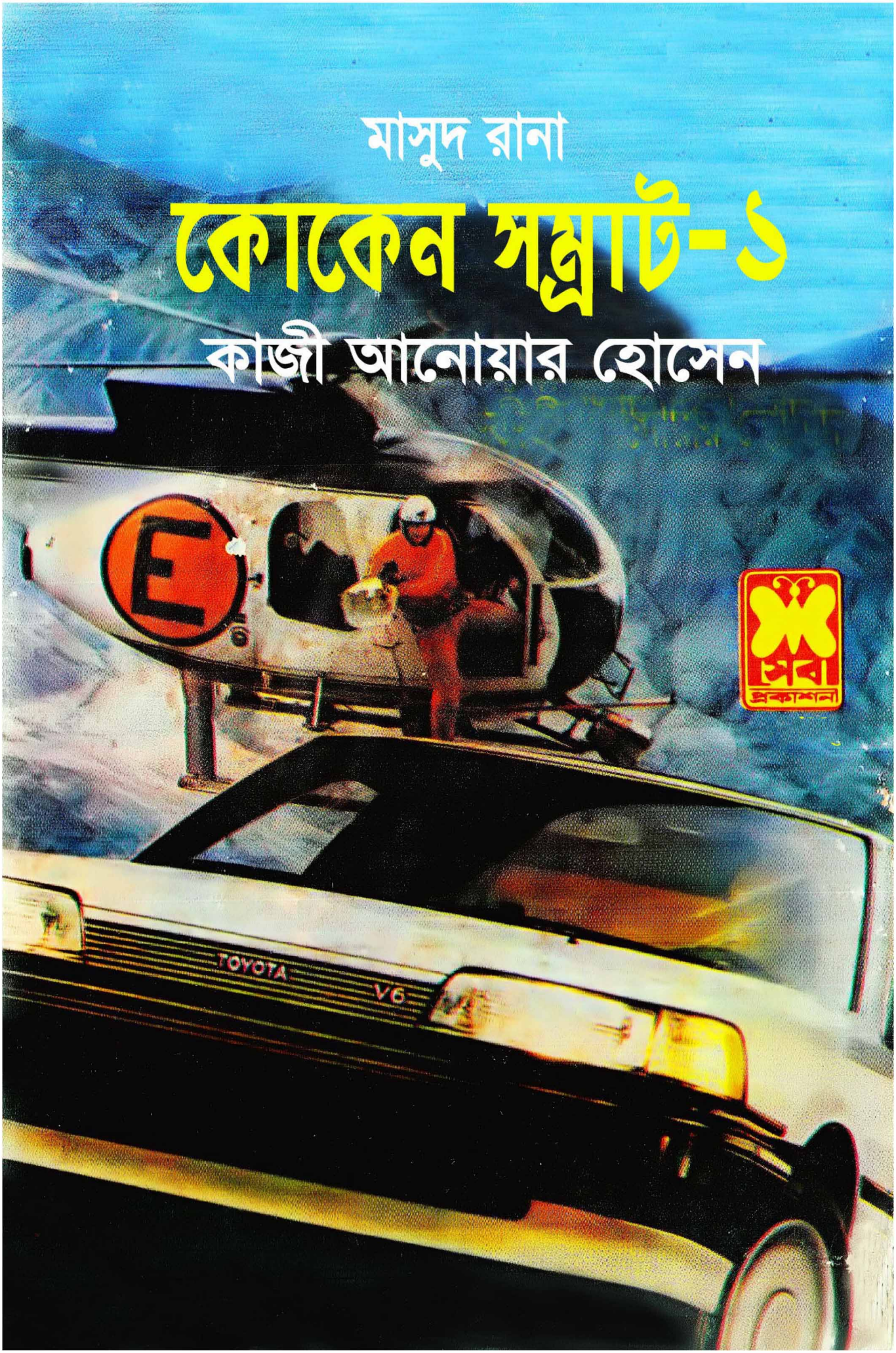

সেবা প্রকাশনী

মাসুদ রানা-১৭৬

কোকেন সম্রাট-১

দুইখণ্ডে সমাপ্ত রোমাঞ্চোপন্যাস

কাজী আনোয়ার হোসেন

সবাই নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন ব্যাপারটা—
চোরাপথে প্রচুর পরিমাণ কোকেন ঢুকছে বাংলাদেশে।
গোড়াটা কোথায়?
কোত্থেকে আসছে এই কোকেন? কলম্বিয়া?
কলম্বিয়া পৌঁছেই তাজা বোমায় পা দিলো মাসুদ রানা।
ছিন্ন ভিন্ন করে দিতে চাইলো ওকে
লা ব্লাঙ্কা, ওরফে হোয়াইট লেডি।
কোকেন সম্রাটকে একের পর এক খোঁচা মারছে রানা—
ফেলে দিলো মরিসনের স্ট্যাচু,
হানা দিলো ভিক্টর লজেনের হাসিয়েনদায়।
তারপর শুরু হলো এক ভয়ঙ্কর যুদ্ধ।

বাইশ টাকা

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রুম : ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

এক নজরে মাসুদ রানা সিরিজের সমস্ত বই

ধ্বংস-পাহাড় * ভারতনাট্যম * স্বর্ণমৃগ * দুঃসাহসিক * মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা * দুর্গম দুর্গ * শত্রু ভয়ঙ্কর * সাগরসঙ্গম * রানা ! সাবধান !! * বিস্মরণ * রত্নদ্বীপ * নীল আতঙ্ক * কায়রো * মৃত্যুপ্রহর * গুপ্ত-চক্র * মূল্য এক কোটি টাকা মাত্র * রাত্রি অন্ধকার * জাল * অটল সিংহাসন * মৃত্যুর ঠিকানা * ক্ষ্যাপা নর্তক * শয়তানের দূত * এখনো ষড়যন্ত্র * প্রমাণ কই ? * বিপদজনক * রক্তের রঙ * অদৃশ্য শত্রু * পিশাচদ্বীপ * বিদেশী গুপ্তচর * ব্ল্যাক স্পাইডার * গুপ্তহত্যা * তিন শত্রু * অকস্মাৎ সীমান্ত * সতর্ক শয়তান * নীলছবি * প্রবেশ নিষেধ * পাগল বৈজ্ঞানিক * এসপিওনাজ * লাল পাহাড় * হৃৎ-কম্পন * প্রতিহিংসা * হংকং সম্রাট * কুউউ ! * বিদায়, রানা * প্রতিদ্বন্দ্বী * আক্রমণ * গ্রাস * স্বর্ণতরী * পপি * জিপসী * আমিই রানা * সেই উ সেন * হ্যালো, সোহানা * হাইজ্যাক * আই লাভ ইউ, ম্যান * সাগর কন্যা * পালাবে কোথায় * টার্গেট নাইন * বিষ নিঃশ্বাস * প্রেতাত্মা * বন্দী গগল * জিম্মি * তুষার যাত্রা * স্বর্ণ সংকট * সন্ন্যাসিনী * পাশের কামরা * নিরাপদ কারাগার * স্বর্গ-রাজ্য * উদ্ধার * হামলা * প্রতিশোধ * মেজর রাহাত * লেনিনগ্রাদ * অ্যামবুশ * আরেক বারমুডা * বেনামী বন্দর * নকল রানা * রিপো-র্টার * মরুযাত্রা * বন্ধু * সংকেত * স্পর্ধা * চ্যালেঞ্জ * শত্রুপক্ষ * চারিদিকে শত্রু * অগ্নিপুরুষ * অন্ধকারে চিতা * মরণকামড় * মরণ-খেলা * অপহরণ * আবার সেই দুঃস্বপ্ন * বিপর্যয় * শাস্তিদূত * শ্বেত সন্ত্রাস * ছদ্মবেশী * কালপ্রিট * মৃত্যু আলিঙ্গন * সময়-সীমা মধ্যরাত * আবার উ সেন * বুমেরাং * কে কেন কিভাবে * মুক্ত বিহঙ্গ * কুচক্র * চাই সাম্রাজ্য * অনুপ্রবেশ * যাত্রা অশুভ * জুয়াড়ী * কালো টাকা

সেবা প্রকাশনী

কোকেন সম্রাট-১

দুইখণ্ডে সমাপ্ত সম্পূর্ণ রোমাঞ্চোপন্যাস

সিরিজের অন্যান্য বই পড়া না থাকলেও বুঝতে অসুবিধে নেই

কাজী আনোয়ার হোসেন

রানা-১৭৬

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০০

প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর, ১৯৯০

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা শরাফত খান

রচনা বিদেশী কাহিনী অবলম্বনে

মুদ্রণে
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০০

যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন ৪০৫৩৩২
জি. পি. ও. বক্স নং-৮৫০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

Masud Rana-176
KOKEN SAMRAT-1
by Qazi Anwar Husain

মাসুদ রানা

বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের
এক দুর্দান্ত দুঃসাহসী স্পাই
গোপন মিশন নিয়ে ঘুরে বেড়ায় দেশ-দেশান্তরে।
বিচিত্র তার জীবন। অদ্ভুত রহস্যময় তার গতিবিধি।
কোমলে-কঠোরে মেশানো নিষ্ঠুর-সুন্দর এক অন্তর।
একা।
টানে সবাইকে, কিন্তু বাঁধনে জড়ায় না।
কোথাও অন্যায় অবিচার অত্যাচার দেখলে
রুখে দাঁড়ায়।
পদে পদে তার বিপদ শিহরণ ভয়
আর মৃত্যুর হাতছানি।
আসুন, এই দুর্ধর্ষ চির-নবীন যুবকটির সাথে
পরিচিত হই।
সীমিত গণ্ডিবদ্ধ জীবনের একঘেয়েমি থেকে
একটানে তুলে নিয়ে যাবে ও আমাদের
স্বপ্নের এক আশ্চর্য মায়াবী জগতে।
আপনি আমন্ত্রিত।
ধন্যবাদ।

সেবা প্রকাশনী

প্রিয় পাঠক

এই বইটিতে, অথবা সেবা প্রকাশনীর অন্য যে-কোন বইয়ে বাঁধাইয়ের ভুলে যদি কোনও ফর্মা বাদ পড়ে, কিংবা উল্টোপাল্টা হয়, তাহলে দয়া করে সেটি সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা-১০০০—এই ঠিকানায় পোস্ট করুন। আমরা নিজ খরচে একটি ভাল বই আপনার ঠিকানায় রেজিস্টার্ড বুকপোস্টে পাঠিয়ে দেব।

ঢাকার পাঠক হাতে হাতে বদলে নিতে পারবেন।

বইয়ের ভেতর আপনার নাম লিখে থাকলেও ক্ষতি নেই, বরং নামের নিচে ঠিকানাটাও স্পষ্ট হস্তাক্ষরে লিখুন, এবং নির্দ্বিধায় পাঠিয়ে দিন। প্রকাশক।

এই বইয়ের প্রতিটি ঘটনা ও চরিত্র কাল্পনিক। জীবিত বা মৃত ব্যক্তি, বা বাস্তব ঘটনার সঙ্গে এর কোনও সম্পর্ক নেই। লেখক।

এক

২৮ এপ্রিল, ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দ।

'বার্লিন আর আমি একসাথে মরবো,' কথাটা এমন সুরে বলা হলো যেন বার্লিন কোনো শহর নয়, জ্যান্ত কিছু।

হেনেরিক মুলার কোনো জবাব দিলেন না, কারণ এই একই রহস্যময় উক্তি গত এক মিনিটে তিনবার উচ্চারণ করলেন ফুয়েরার। অ্যাডলফ হিটলার নিজের মধ্যে নেই, নাকি অবশেষে নিজেকে তিনি চিনতে পেরেছেন, কোনটা যে ঠিক বুঝতে পারলেন না মুলার। জার্মান জাতির মহাশক্তিধর নেতার মাথার চুল এখন সাদা হয়ে গেছে, একটা হাত অকেজো, আর বাম পা-টা গুলি খাওয়া পশুর মতো তাঁর পিছনে ঝুলে থাকে। তাঁর নীলচে-খয়েরি চোখ দুটো এখন পুরোপুরি একজন বদ্ধ উন্মাদের।

শিরায় টান পড়ায় বা যে-কোনো কারণেই হোক, ভালো হাতটা মৃদু ঝাঁকি খেতে শুরু করলো, তাড়াতাড়ি সেটা মুঠো পাকিয়ে ডেস্কের মাথায় চেপে ধরলেন ফুয়েরার। কয়েকটা ইঞ্জেকশন নেয়ার পর সমস্ত শারীরিক বৈশিষ্ট্য আর মর্যাদা হারিয়ে স্রেফ মাংসের স্তূপে পরিণত হয়ে-

ছেন চীফ। ইঞ্জেকশন দিয়ে ডাক্তার বিদায় নেয়ার পর দেখা গেল এক-জন মাদকাসক্তকে সরবরাহ বন্ধ করে দিলে যে প্রতিক্রিয়া হয় তাঁরও ঠিক হুবহু সেই অবস্থা হয়েছে। পীড়ন আর শাসন করার উদগ্র কামনা নিস্তেজ হয়ে গেছে, অবশিষ্ট ইচ্ছাশক্তি এখন শুধু মৃত্যুকে ডেকে আনতে চায়। প্রথমে অন্যদের, সবশেষে নিজের। এ-ব্যাপারে ঘড়ির কাঁটা ধরে ভূমিকা পালন করছে রাশিয়ান আর্মি, প্রকৃতির অমোঘ বিধানের মতো পতন ঘটতে যাচ্ছে বার্লিনের।

'তার আগে আমরা বেঈমানদের শায়েস্তা করবো,' বললেন তিনি, ক্ষমা না করার প্রবণতা এখনো তাঁর মধ্যে পুরোমাত্রায় সক্রিয়। 'শুরুতে যারা বেঈমানী করেছে, আর এখন শেষ মুহূর্তে যারা করছে, দু'দলের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই।'

'ইয়েস, চীফ,' বললেন মুলার, বাংকারে তাঁর সব স্টাফই তাঁকে চীফ বলে সম্বোধন করে।

'ফেগেলাইনের মেয়েমানুষটা,' কণ্ঠে অস্বস্তি নিয়ে প্রশ্ন করলেন ফুয়েরার, '...সে কি...সুন্দর?'

'দারুণ।' একেবারে উল্টোকথা বলার আগে এক সেকেণ্ড বিরতি নিলেন মুলার। 'তবে দুশ্চরিত্রা। সন্দেহ নেই, সে-ই ফেগেলাইনকে সর্বনাশা পথে পা বাড়াতে প্ররোচিত করে।'

'তোমার কাছে প্রমাণ আছে, সত্যি সে পালাবার চেষ্টা করেছিল?'

'আছে, চীফ। তার লাগেজ থেকে অনেকগুলো প্রমাণ উদ্ধার করেছে বোরম্যানের লোকজন। সোনা, অলংকার, মোটা অংকের সুইস কারেন্সি। জেরার মুখে সব কথা স্বীকারও করেছে জেনারেল ফেগে-লাইন। তার অপরাধ সম্পর্কে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই।'

ঝুলন্ত পা-টা পিছন দিকে ঠেলে দিলেন হিটলার, যেন রায় ঘোষণার

সময় তাঁর শারীরিক ত্রুটি দৃষ্টিগোচর হওয়া চলবে না। অবশ্যই তিনি বিবেকের তাড়নায় পীড়িত। ফুয়েরার-বাংকারে এস এস-এর প্রতিনিধিত্ব করছে জেনারেল ফেগেলাইন, তার সৈন্যরা শুধু যে আক্রমণ করতে ব্যর্থ হয়েছে তাই নয়, বার্লিনের ওপর শত্রুপক্ষের চাপ কমাতেও সফল হয়নি। তবে জেনারেল ফেগেলাইন গ্রেটল-এর স্বামীও বটেন। ইভা ব্রাউন, বহু বছর ধরে হিটলারের রক্ষিতা, তারই ছোটো বোন গ্রেটল। রাজনীতি, না রক্ত? কোন্‌টা বেশি শক্তিশালী?

'ইভা এখন আমার কাছে আগের চেয়ে অনেক বেশি প্রিয়,' বললেন হিটলার। 'কথাটা তুমি বিশ্বাস করো, মুলার?'

'আমি জানি, চীফ।'

পায়ের কাছে বসে থাকা অ্যালসেশিয়ান কুকুরীটার দিকে তাকালেন হিটলার। 'দুনিয়া কোনোদিন জানবে না জার্মান জাতির জন্যে যা অবদান রয়েছে আমাদের, তার কতটুকু সম্ভব হয়েছে শুধু এই মেয়েটির জন্যে।'

তবে মুলার জানেন। তিনিই সম্ভবত ফুয়েরারের যৌন রুচি সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি জানেন। বেশিরভাগ সময় যৌনাবেগের কোনো অস্তিত্বই থাকে না, তারপর হঠাৎ ভয়ংকর রুদ্র মূর্তি নিয়ে মাথাচাড়া দেয়। ফ্রাউলিন ইভা, সাবেক জিমন্যাস্টিক ইনস্ট্রাক্টর; গোটা জার্মানীতে সম্ভবত সে-ই একমাত্র মেয়েমানুষ যার কাছে ফুয়েরারের অনিয়মিত ও চরম যৌন বিকৃতি সামাল দেয়ার মতো শারীরিক উপকরণ আছে।

'আপনার জন্যে ব্যাপারটা বোধহয় কঠিন, স্যার। আপনি যদি বলেন তো আমি ম্যানেজ করতে পারি···।'

'না,' বললেন হিটলার, এক মুহূর্তের জন্যে কর্তৃত্বের সুর ফিরে পেলেন তিনি, যে কর্তৃত্বের সুর গোটা একটা জাতিকে গৌরবের স্বর্ণ-

শিখরে পৌঁছে দিয়েছিল, তারপর সেখান থেকে নিক্ষেপ করতে যাচ্ছে বিস্মৃতির অতল গহ্বরে। 'উত্তরটা পরিষ্কার। জেনারেল ফেগেলাইন বার্লিনে মারা যাবে। আমরা সবাই মারা যাবো এখানে।'

খানিক পর হিটলারের সিটিংরুম থেকে বেরিয়ে এসে স্টাডিরুমে ঢুকলেন মুলার, ফুয়েরারের সেক্রেটারি বোরম্যানের সাথে কথা বলবেন। বিশালদেহী হলেও, বোরম্যানের চেহারায় আভিজাত্য বা কর্তৃত্বের কোনো ভাব নেই, আছে বুনো একটা ভাব, রাইখসলাইটার-এর ইউনিফর্মও সেটা ঢাকতে পারেনি। নির্মম খুনির হাতের মতো শার্টের কলার তাঁর মোটা গলাটা খামচে ধরে আছে, চর্বিবহুল বেঢপ ভুঁড়িটা রীতিমতো কুৎসিত। বেশিরভাগ লোক তাঁকে চাষা বলে ডাকে, যদিও সেটা তাদের উদারতাই বলতে হয়। মার্টিন বোরম্যানকে দেখে মনে হয় আদিম যুগের প্রতিনিধিত্ব করছেন তিনি, বাস করেন গুহায়।

তবে বোরম্যানকে ছোটো করে দেখার মতো ভুল মুলারের কখনো হয়নি। রাইখসলাইটার বোরম্যান একটা জিনিস খুব ভালো বোঝেন: কিভাবে তাঁর প্রভুকে খুশি রাখতে হবে। তিনি আরো বোঝেন, বাকি সব তুচ্ছ। বছরের পর বছর ধরে বোরম্যানের প্রতি মুহূর্তের প্রতিটি চিন্তার বিষয়বস্তু একটাই, কিভাবে ফুয়েরারের চাহিদা পূরণ করা যায়। প্রভুর সেবা করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হতে যাচ্ছেন তিনি, এটা বুঝতে পারার পর থেকে তাঁর চেহারায় নির্ভেজাল উদ্বেগ ফুটে আছে। রাইখসলাইটার বড় বেশি মদ খাচ্ছেন আজকাল। হিটলার পছন্দ না করলেও, প্রায় সারাক্ষণই তাঁর হাতে জ্বলছে সিগারেট।

পায়ের শব্দ পেলেও, ডেস্কে মেলা ম্যাপটা থেকে দেরি করে মুখ তুললেন বোরম্যান, ভুঁড়ির আড়ালে সেটা প্রায় ঢাকা পড়ে আছে।

'কি ব্যাপার ?' জানতে চাইলেন তিনি।

'ফুয়েরার নির্দেশ দিয়েছেন বেঈমানদের বিরুদ্ধে এখুনি ব্যবস্থা নিতে হবে, কারো প্রতি দয়া দেখানো চলবে না,' আবেগশূন্য, বেসুরো গলায় বললেন মুলার। 'পালিয়ে যাবার ষড়যন্ত্র করায় দোষী সাব্যস্ত হয়েছে জেনারেল ফেগেলাইন। এসকর্ট বাহিনী গ্রেফতার করে বাগানে নিয়ে যাবে, ওখানে গুলি করা হবে তাকে।'

'চমৎকার,' বড় বড় দাঁত বের করে হাসলেন বোরম্যান, চওড়া মাড়ির মাথায় এলোমেলোভাবে সাজানো ওগুলো। 'আমার ভয় হচ্ছিলো, স্বজনপ্রীতির কারণে সুবিচার বিঘ্নিত হতে পারে। ভালোই হলো, এখনো যাদের মনে দ্বিধা বা সংশয় আছে তাদের জন্যে কঠিন একটা দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে ব্যাপারটা।'

মাথা নেড়ে মুলার বোঝাতে চাইলেন বোরম্যানের সাথে তিনি একমত, যদিও ফেগেলাইনের বিয়ের অনুষ্ঠানে ফিরে গেছে তাঁর মন। আমন্ত্রিত অতিথিদের মধ্যে বোরম্যানও ছিলেন। মদ্যপ, সুদর্শন, তরুণ এসএস জেনারেলকে 'প্রিয় বন্ধু' বলে প্রথমবার সম্বোধন করেছিলেন তিনি। পরবর্তী বছরগুলোয় একই বোতল থেকে মদ খেয়েছেন তাঁরা, বিশেষ করে মাটির নিচে আশ্রয় নেয়ার পর থেকে গত কয়েক হপ্তায় তাঁদের ঘনিষ্ঠতা আগের চেয়ে আরো বরং বেড়েছে। একমাত্র বন্ধুর মৃত্যুদণ্ডকে চমৎকার বলে আখ্যায়িত করতে পারেন বোরম্যান, এ থেকেই তাঁর সম্পর্কে একটা ধারণা পাওয়া যেতে পারে।

'ফুয়েরারের নামে আমি একটা নির্দেশ জারি করেছি,' বললেন তিনি। পদমর্যাদার গর্ব তাঁর চেহারা ও সুরে কখনোই অনুপস্থিত থাকে না। 'আর্মির প্রতিটি ইউনিট আত্মসমর্পণের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করবে। কেউ যদি শত্রুর হাতে ধরা দেয়, কোর্ট মার্শাল ছাড়াই তাকে

মৃত্যুদণ্ড দেয়া হবে। এই আইন-বলে বার্লিনে আমরা মিরাকল ঘটাবো।'

একজন নির্বোধ ফ্যানাটিকের মতো কথা বলছে, তবু তার কথায় সায় দিতেন মুলার, যদি না ঠিক সেই মুহূর্তে কামানের গোলাটা সরাসরি মন্ত্রণালয়ে আঘাত করতো। ভোঁতা একটা শব্দ হলো, অনেকটা মট্ করে হাড় ভাঙার মতো। পরবর্তী ধাক্কাটা হলো দীর্ঘস্থায়ী, নাড়া দিয়ে গেল গোটা বার্লিনকে, থরথর করে কেঁপে উঠলো আট ফুট চওড়া কংক্রিটের দেয়ালগুলো, নিস্তেজ হয়ে গেল বাংকারের সবগুলো আলো।

রাশিয়ান আর্মির খোঁচা খেয়ে তাড়াতাড়ি আবার মুখ খুললেন বোরম্যান, এই মুহূর্তে সম্পূর্ণ বাস্তববাদী তিনি। 'বিষয়টা নিয়ে তাঁর সাথে তুমি কথা বলেছো? তিনি কি যাবেন?'

'শহর ত্যাগ করার কোনো প্রস্তাব শুনতে পর্যন্ত রাজি নন ফুয়েরার,' বললেন মুলার। 'বার্লিনের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা যদি ব্যর্থ হয়, বলছেন তিনি আত্মহত্যা করবেন।'

চর্বি থলথলে মোটা গলা নিয়ে ষাঁড়ের মতো মাথা ঝাঁকালেন বোরম্যান। 'কাল রাতে ব্যাপারটা নিয়ে ওঁরা আলোচনা করেছেন,' বললেন তিনি। 'টেবিলের চারধারে বসে কে কিভাবে নিজের জীবন দেবেন তারই বর্ণনা শুরু হলো। সবশেষে ফুয়েরার একটা ডকুমেণ্ট দিলেন আমাকে—তাঁর টেস্টামেণ্ট—উনি মারা যাবার পর দুনিয়ার লোককে জানাতে হবে।'

এর অর্থ দু'জনেরই জানা আছে। উত্তরে রয়েছেন হিমলার, তাঁর কোনো উপায় নেই উত্তরাধিকার দাবি করেন; দক্ষিণে গ্রেফতার হবার পর অপদস্থ হচ্ছেন গোয়েরিং, কাজেই বুদ্ধিহীন বিশিষ্ট ব্যক্তি মার্টিন

বোরম্যান হতে যাচ্ছেন একদিনের বাদশা। কথাটা ভাবতেই আতংক বোধ করলেন মুলার।

তবে, বোরম্যানের বাদশাহী টিকবে না। গত এক দশকে বহুবারই অসম্ভবকে মেনে নিয়েছেন মুলার। এটা ধরে নেয়া যুক্তিসঙ্গত ছিলো না যে মাত্র কয়েক হপ্তায় গোটা ইউরোপ দখল করা সম্ভব, বা জার্মানীর মাটি থেকে সব ক'জন ইহুদিকে নিশ্চিহ্ন করা যাবে; অথচ কাজগুলো বাস্তবায়িত করা গেছে। 'রাইখসলাইটার, আমার বিশ্বাস, ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আমাদের অন্য পরিকল্পনা করা দরকার।'

'বলো,' সাড়া দিলেন ফোরম্যান।

'আমি তোমাকে বলতে চাই, যেমন ফুয়েরারকেও বলেছি, নিজের নিরাপত্তার কথা ভেবে কিছু একটা করার এখনই সময়।'

হাত দুটো পিছনে নিয়ে গিয়ে ভাঁজ করলেন বোরম্যান। 'সম্ভব নয়,' বললেন তিনি। 'দায়িত্ব পালন করতে হলে পালাবার কথা ভুলে থাকতে হবে আমাকে। আমি এখানে, আমার নেতার পাশে থাকবো।'

'অবশ্যই,' অহেতুক জোর দিয়ে বললেন মুলার। 'যতোক্ষণ তোমাকে তাঁর দরকার।'

নিঃশব্দে দৃষ্টি বিনিময় হলো, দু'জনেই পরস্পরকে পুরোপুরি বুঝতে পারলেন। ডেস্ক থেকে ম্যাপটা তুলে নিয়ে ভাঁজ করলেন বোরম্যান, মন্ত্রণালয়ের এমন একটা কামরা থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে ওটা যেখানে খুব কম লোকেরই প্রবেশাধিকার আছে। ম্যাপটা ভাঁজ করার সময় তাঁর চেহারায় চাপা উত্তেজনা ফুটে উঠলো। 'চলো, তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসি, হেনেরিক। আমি জানি, তোমার হাতে এই মুহূর্তে অনেক কাজ, কিন্তু সময় খুব কম।'

কনুইয়ের কাছে বোরম্যানকে নিয়ে ছোট্ট কনফারেন্স রুমটা পেরিয়ে

এলেন মুলার, আক্ষরিক অর্থেই বোরম্যান তাঁর কনুইয়ের সাথে সেঁটে থাকলেন। করিডর হয়ে পেঁচানো সিঁড়ি বেয়ে বাংকারের ওপরতলায় উঠে এলেন ওঁরা। করিডরের মাঝখানটায় বোরম্যানের অফিস—বড় দুটো খুপরি, তাঁর আর স্টাফদের জন্যে। বোরম্যানের শক্তি আর স্থূলতা সম্পর্কে জানেন ফুয়েরার, তাঁর নির্দেশ যাতে প্রতিপালিত হয় সেটা নিশ্চিত করার জন্যে সেক্রেটারির এই গুণ দুটো তিনি ব্যবহার করেন, সেই সাথে তাঁকে গভীর নিভৃত ছায়ায় রাখারও ব্যবস্থা করেছেন।

খুব বেশি কিছু কখনোই চাননি বা আশা করেননি রাইখসলাইটার। যা তিনি পেয়েছেন তাতেই তৃপ্ত বোধ করেছেন—ক্ষমতা। নাৎসী পার্টিকে নিয়ন্ত্রণ করেন বোরম্যান, পৃষ্ঠপোষকদের তালিকা আর তহবিল তাঁর হাতের মুঠোয়, সেই সাথে ফুয়েরারের ব্যক্তিগত আর্থিক ব্যাপারগুলো দেখাশোনা করেন।

অফিসে ঢোকার পর মেয়ে সেক্রেটারিদের অশ্লীল গালাগাল দিয়ে ভাগিয়ে দিলেন বোরম্যান। ফ্রাউলিন ক্রুগারের নিতম্বে কষে একটা চাপড় মারলেন, ছুটে পালাবার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হলো বেচারি। অধস্তনদের সাথে এ-ধরনের অশোভন আচরণ করতে অভ্যস্ত তিনি ; কাল রাতে যদি ওদের কারো সাথে রাতও কাটিয়ে থাকেন বোরম্যান, সেও তাঁর এই অশ্লীল অমর্যাদাকর পীড়ন থেকে রেহাই পাবে বলে আশা করতে পারে না। বোরম্যান তাঁর সব ক'জন সেক্রেটারির সাথে রাত কাটান, তারপরও তাঁর শোবার ঘরে ডাক পড়ে অভিনেত্রী আর বেশ্যাদের। বলা হয়, তাঁর রাক্ষুসে যৌনক্ষুধা মিটবার নয়। এ-সবই জানা আছে মুলারের। স্থান-কাল-পাত্রী, সবই তিনি জানেন—জানাটাই তাঁর কাজ।

'বসো, প্লিজ,' বললেন বোরম্যান, দেয়ালের কাছাকাছি একটা চেয়ার ইঙ্গিতে দেখালেন।

বসলেন মুলার। চেয়ারটা এখনো গরম হয়ে রয়েছে, মেয়েলি একটা গন্ধও যেন পেলেন তিনি। মুখে মৃদু হাসি নিয়ে অপেক্ষা করছেন। দরজা বন্ধ করলেন বোরম্যান, ফুয়েরারের গোপন কামরা থেকে সংগ্রহ করা ম্যাপটার ভাঁজ খুললেন। বার্লিন আর চারপাশের এলাকা নিয়ে হাতে আঁকা একটা নক্সা ওটা। লাল কালিতে একটা বৃত্ত এঁকে দেখানো হয়েছে রাশিয়ান সৈন্যদের অগ্রগতি।

থার্ড রাইখ পিছু হটে যেখানে সরে এসেছে, এলাকাটা শুধু মিটার দিয়ে মাপা যায়। বার্লিনের মাঝখানে অবশিষ্ট জায়গাটুকুকে আসলে একটা দ্বীপ বলা চলে, উত্তর দিকে স্প্রি নদী, দক্ষিণে ল্যাণ্ডওয়েহর খাল। দ্বীপের ভেতর রয়েছে টিয়েরগার্টেন-এর কিছু মাঠ আর কংক্রিটের জঙ্গল—অর্থাৎ দালান-কোঠা ও ভবনাদি। গোটা এলাকাটাকে সিটাডেল বলা হয়। নাৎসী সরকারের অবশিষ্ট ঠাঁই নিয়েছে এখানেই।

'দক্ষিণের যুদ্ধক্ষেত্রে শান্ত একটা ভাব দেখা যাচ্ছে,' বোরম্যান বললেন, ম্যাপের ওপর হাত রাখলেন তিনি। 'তোমার কি ধারণা?'

'জেনারেল চুইকভ তার সৈন্যদের বিশ্রাম নিতে দিচ্ছে, সেই সাথে নতুন ঢঙে সাজাচ্ছে ব্যাটল লাইন,' বললেন মুলার। 'কাল বারো শো ঘণ্টায় আবার আক্রমণ করবে সে।'

'ঠিক জানো তুমি?'

'নিঃসন্দেহে,' বললেন মুলার। 'মে ডে-তে যে জেনারেল বার্লিনের পতন ঘটাবে, স্ট্যালিন তাকে পুরস্কৃত করবে। সোভিয়েত ইউনিয়নের একজন বীর নায়ক হিসেবে আখ্যায়িত করা হবে তাকে। চুইকভ তা

জানে।'

'তাহলে তো বেরিয়ে যাওয়া অসম্ভব ব্যাপার,' বললেন বোরম্যান, সবার জানা পরিষ্কার কথাটাই পুনরাবৃত্তি করলেন তিনি। 'গুরুত্বপূর্ণ কোনো অফিসার স্ট্যালিনের হাতে পড়বে, এ ভাবাই যায় না। স্রেফ আত্মহত্যা করা হবে।'

'হ্যাঁ।'

'আর, এমনকি ভাগ্যবান লোকটা যদি রাশিয়ান লাইন ভেদ করে বেরিয়েও যেতে পারে, তারপরও সে শহর ত্যাগ করতে পারবে কিনা সন্দেহ,' কথাটা এমন সুরে শেষ করলেন বোরম্যান, যেন আশা করছেন বাকি অংশটুকু পূরণ করবেন মুলার।

সাথে সাথে নয়, কয়েক সেকেণ্ড পর মুখ খুললেন মুলার, 'কাজটা কঠিন। সম্ভবত ভাগ্যের সহায়তা পেতে হবে। আমার কাছে ইন্টেলিজেন্স রিপোর্ট আছে, রাশিয়ান সৈন্যরা অত্যন্ত সুশৃঙ্খল। সাধারণ নাগরিকদের সাথে যোগাযোগ করার ব্যাপারে খুবই সতর্ক তারা। অন্তত সিভিলিয়ানদের তারা দেখা মাত্রই গুলি করছে না। ভালো কাগজ-পত্র সাথে থাকলে, আর লোকটা যদি যথেষ্ট বুদ্ধিমান হয়, পার পেয়ে যাবার সম্ভাবনা তার আছে।'

'ভালো কাগজ-পত্র,' বললেন বোরম্যান। 'তারমানে তুমি বলতে চাইছো জাল পরিচয়-পত্র। ওগুলো সাথে পাওয়া গেলে তোমার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগ আনা হবে, হেনেরিক।'

কিছু বললেন না মুলার, কারণ দু'জনেই তাঁরা জানেন যে সরকারের প্রতিটি অফিসার এক বা একাধিক অতিরিক্ত পরিচয়-পত্র সাথে রাখছেন। রাইখ সিকিউরিটির ডকুমেণ্ট সেকশন আর সব কাজ বাদ দিয়ে গত তিন মাস ধরে শুধু জাল কাগজ তৈরি করছে। নিজের জন্যে বোরম্যানও কয়েকটা পরিচয়-পত্র তৈরি করিয়েছেন, তাঁর স্টাফরাও

বাদ যায়নি। প্রায় প্রত্যেকেই ইহুদিদের নামের সাথে মিল রেখে নতুন নাম গ্রহণ করেছে।

'ঠিক আছে, ধরা যাক, লোকটার কাছে ভালো কাগজ আছে,' ঠোঁটে শান্ত, ক্ষীণ হাসি নিয়ে বললেন বোরম্যান। 'মুক্ত হওয়ার আগে তারপরও তো তাকে আরো অনেক কাঠখড় পোড়াতে হবে, তাই না? প্রথম কাজ বেঁচে থাকা।'

'নিরাপদ একটা লুকানোর জায়গা পেতে হবে তাকে,' বললেন মুলার, তাঁর মুখভাব দেখে মনে হলো কঠিন শর্ত আরোপ করছেন।

মাথা ঝাঁকিয়ে একমত হলেন বোরম্যান, তাঁর গোটা শরীর দুলে উঠলো। তারপর শরীরটা আড়ষ্ট হলো, কোমর ভাঁজ করে সামনের দিকে ঝুঁকলেন, উরু দুটোর ওপর হাত রেখে কাছ থেকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন মুলারের দিকে। 'সে-ধরনের একটা জায়গার কথা শুনেছি আমি,' তাঁর চাপা গলা খসখসে শোনালো। 'বলা হয় সেটা নাকি আরেকটা বাংকার···একটা গোপন বাংকার···আরেকটা সিটাডেল—তবে আরো ছোটো, আরো নির্জন। এমনভাবেই লুকানো আছে যে আমার একজন এজেন্ট অনেক চেষ্টা করেও ওটার কোনো হদিশ বের করতে পারেনি। বলা হয়, মাত্র একজনই নাকি ওটার অস্তিত্ব সম্পর্কে জানে।'

'রাইখসলাইটার, তোমাকে স্মরণ করিয়ে দেয়া আমার কর্তব্য বলে মনে করছি, যে-লোকটার কথা তুমি বলছো সে আসলে একজন বেঈমান।'

'আজ—হ্যাঁ। কাল—কে বলতে পারে!' অর্থটা পরিষ্কার করার জন্যে কাঁধ ঝাঁকালেন বোরম্যান, শূকরসদৃশ তাঁর মুখটাও যেন ঝাঁকি খেলো। 'তবে একটা কথা ঠিক, অত্যন্ত অল্প সময়ের ভেতর বিরাট

এক ধনী লোক হওয়ার সুযোগ আছে তার।'

'কোন্ কারেন্সিতে?' জিজ্ঞেস করলেন মুলার, তাঁর চোখে নিষ্পলক দৃষ্টি।

'সুইস ফ্র্যাঙ্ক।'

'কোথায় জমা আছে?'

'জুরিখে।'

'নম্বর?'

'সেটা জানতে পারবে মাত্র কয়েকজন, শুধু তারাই টাকাগুলোর ভাগ পাবে,' বললেন বোরম্যান। 'সংক্ষেপে, যারা বেঁচে যাবে।'

'এই কয়েকজনের পরিচয়?'

চেহারা দেখে মনে হলো প্রশ্নটা সরাসরি করায় আহত হয়েছেন রাইখসলাইটার। তবে মুলার তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে জানেন মানুষ নামক পশু নির্যাতন ভোগের সময়, বড় কোনো অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হবার পরও, তুচ্ছ অপরাধের অভিযোগ প্রচণ্ডভাবে অস্বীকার করে। একজন খুনি ব্যভিচারের অভিযোগ অস্বীকার করবে, একজন ধর্ষকামী অস্বীকার করবে সিঁদ কাটার অভিযোগ। রাইখসলাইটার বোরম্যান, যিনি এ-ধরনের সব অপরাধেই হাত পাকিয়েছেন, সঙ্গী বেঈমানদের নাম উচ্চারণ করতে দ্বিধা বোধ করবেন তাতে আর আশ্চর্য হওয়ার কি আছে। আলোচনাটা থেমে থাকলেও, সময়টুকু অস্বস্তিকর হয়ে উঠলো না পর পর তিনটে কামানের গোলা বিস্ফোরিত হওয়ায়। কাছাকাছিই পড়লো কোথাও, সম্ভবত মন্ত্রণালয়ের বাগানে, যেখানে জেনারেল ফেগেলাইন তার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করবে। তিনটে বিস্ফোরণের সাথে তিনবার নিভু নিভু হলো আলো। তারপর আবার নিস্তব্ধতা নামলো কামরার ভেতর।

'কালটিনব্রুনার আর তার মিসট্রেস,' গম্ভীর একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে বললেন বোরম্যান। 'আর আমি।'

আচ্ছা। আর্নেস্ট কালটিনব্রুনার হলেন রাইখ সিকিউরিটির চীফ, বুদ্ধি করে কয়েকদিন আগেই বার্লিন ছেড়ে বাভারিয়ায় চলে গেছেন তিনি। তাঁর রক্ষিতা কাউন্টেস ফন ওয়েসট্রপ, গত কয়েক মাসে অন্তত দু'বার সুইটজারল্যাণ্ড থেকে ঘুরে এসেছে। 'কোত্থেকে যোগাড় হলো টাকাগুলো?' জানতে চাইলেন মুলার।

'বেশিরভাগই ইহুদিদের কাছ থেকে এসেছে,' বোরম্যান জানালেন। 'সৎ কোনো পার্টি মেম্বারের কাছ থেকে একটা পয়সাও নেয়া হয়নি, বিশ্বাস করো।'

'ফেরত পাবার কি ব্যবস্থা করা হয়েছে?'

কোটের পকেটে হাত ভরে সাদামাঠা একটা এনভেলাপ বের করলেন বোরম্যান, এনভেলাপের ওপর তাঁর নিজের হাতে লেখা দুটো শব্দ—অপারেশন ওভারসীজ। 'টাকাগুলো আছে একটা ট্রাস্ট অ্যাকাউন্টে, চারভাগে,' গোপন লেনদেনে অভ্যস্ত একজন মানুষ, তাঁর বলার ভঙ্গিতে কর্তৃত্ব আর আত্মবিশ্বাস ফুটে উঠলো। 'তিন ভাগ টাকা জমা আছে আগে যাদের কথা বলা হয়েছে তাদের সাংকেতিক নামে। শেষ ভাগের টাকাটা পাবে এই চিঠির বাহক।'

'কতো টাকার অ্যাকাউন্ট, রাইখসলাইটার?' জিজ্ঞেস করলেন মুলার, তাঁর হাবভাব দেখে বোঝার উপায় নেই যে জানা কথাই নতুন করে জেনে নিচ্ছেন তিনি।

'প্রায় পঞ্চান্ন মিলিয়ন মার্কিন ডলার,' হিসেব করার জন্যে বিরতি না নিয়েই অঙ্কটা উচ্চারণ করলেন বোরম্যান। 'বিনিময় হার, সুদ ইত্যাদি কারণে অঙ্কটা সামান্য কমবেশি হতে পারে। ট্রাস্টিদের

কাউকে মৃত বলে ঘোষণা করা হলে, তার ভাগের টাকা চলে যাবে আলাদা একটা ফাণ্ডে, ওই ফাণ্ড থেকে সংকটে পড়া বন্ধুদের সাহায্য করা হবে।'

'গুড,' শান্ত সুরে বললেন মুলার। 'চিঠিটা নেবো আমি।'

এক মুহূর্ত ইতস্তত করলেন বোরম্যান, সম্ভবত ভাবছেন, গোটা আয়োজনটা মুলারের নির্দেশে করা হলেও, চিঠিটা তার বিরুদ্ধে বেঈমানীর প্রমাণ হিসেবে ব্যবহার করা হতে পারে। তবে উদ্বিগ্ন হবার তেমন কোনো কারণ নেই, একাধিক পরিচয়-পত্র তৈরি করে রেখেছেন তিনি, পালাবার সময় কোন্‌টা ব্যবহার করবেন কেউ তা জানে না। ইতস্তত ভাবটা কাটিয়ে উঠে চিঠিটা মুলারের দিকে বাড়িয়ে দিলেন তিনি। 'বেশ,' বললেন। 'পরস্পরকে আমরা বিশ্বাস করলাম।'

বোরম্যানের শব্দচয়ন লক্ষ্য করে হাসি পেলেও হাসলেন না মুলার। চিঠিটা খুঁটিয়ে পরীক্ষা করলেন তিনি, সন্তুষ্ট হয়ে চেয়ার ছাড়লেন, তারপর দেয়ালে সাঁটা বড় ম্যাপটার সামনে এসে দাঁড়ালেন। ম্যাপে ৮নং প্রিঞ্জ-আলব্রেখট-স্ট্রাসে রয়েছে, ওটাই তার হেডকোয়ার্টার ছিলো, কামানের গোলায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। হেডকোয়ার্টার ছেড়ে আইখম্যানের হেডকোয়ার্টার কারফরস্‌টেনস্ট্রাসেতে আশ্রয় নেন তিনি, জেনারেল চুইকভের সৈন্যরা ওটার ওপর হামলা চালায় ছাব্বিশ তারিখে।

মুলারের দৃষ্টি ম্যাপটার উত্তর আর পশ্চিম দিকে সরে এলো, একটা আঙুল তাক করে তিনি বললেন, 'দু'মাস আগে, রাইখসলাইটার, বিমান হামলা চলার সময়, এই মোয়াবিট এলাকার কাছাকাছি কিছু বিল্ডিঙের ওপর একগাদা বোমা পড়ে। রাস্তার খানিক সামনে একটা

ছোটো ভাঁটিখানা ছিলো, বোমার আঘাতে গুরুতর ক্ষতি হয় সেটার। আর্থিক বিবেচনায় মেরামত করার অযোগ্য হয়ে পড়ে। তবে সেলার-গুলো অক্ষতই ছিলো। ওগুলোকে আরো মজবুত ও প্রয়োজনীয় উপ-করণে সাজাবার জন্যে ছোটো একটা বিদেশী শ্রমিক দলের শ্রম আর প্রাণ ব্যয় করা হয়। ডিফেন্সিভ পজিশন হিসেবে আমাদের সৈন্যরা বিল্ডিংটাকে ব্যবহার করেনি, ব্যবহার না করার নির্দেশ থাকায়। আমি তোমাকে নিশ্চয়তা দিয়ে বলতে পারি, এই বাংকারটা ছোঁয়নি কেউ।'

'চতুর!' ব্যঙ্গ নয়, বোরম্যানের কণ্ঠে ঈর্ষা। 'আমি তোমার প্রশংসা করি, মুলার।'

'এটা পিঠ চুলকানোর সময় নয়, রাইখসলাইটার। আজ পথটা আমাদের দখলে আছে, কিন্তু কাল···।'

'আমি বুঝতে পারছি।'

'আমার পরামর্শ হলো, বেরোবার পথ হিসেবে আণ্ডারগ্রাউণ্ড গ্যারেজগুলোই ভালো। গোয়েরিং স্ট্রাসে আর টিয়েরগার্টেন হয়ে। ওদিকের এভিনিউটা যদি বন্ধ দেখো, তাহলে তুমি সাবওয়ে প্যাসেজ ধরে উত্তর দিকে যেতে পারো, ফেডরিখস্ট্রাসে ধরে খানিকদূর গেলেই তো নদী।'

'শুনেছি এরইমধ্যে নাকি রেড আর্মি সাবওয়েতে ঢুকতে শুরু করেছে,' গম্ভীর মুখে বললেন বোরম্যান। 'অ্যানহল্টার স্টেশন দখল করে নিয়েছে ওরা।'

'মাঝে মধ্যে এমনকি মানবেতর প্রাণীরাও সামনে থেকে বা সরা-সরি হামলা চালাতে উৎসাহ বোধ করে না।' মুলারের চেহারা নির্লিপ্ত। 'পালাবার যে-কোনো সুযোগ দেখামাত্র তাড়াতাড়ি কাজে লাগাতে হবে তোমার।'

থমথমে চেহারা নিয়ে মাথা ঝাঁকালেন বোরম্যান। খানিকটা অন্যমনস্ক দেখালো তাঁকে। আগেভাগে রওনা হতে না পারলে পালাবার পথগুলো নিষ্কণ্টক পাওয়ার সম্ভাবনা নেই, আবার নির্দিষ্ট কিছু ঘটনা না ঘটলে তাঁর রওনা হবারও উপায় নেই। 'আমি বুঝতে পারছি, এটাই আমাদের শেষ দেখা, মুলার।'

'এখানে, হ্যাঁ।'

বুকশেলফের দিকে হাত বাড়ালেন রাইখসলাইটার, তাঁর কোড বুকগুলো এখানেই থাকে। কয়েকটা বই মেঝেতে ফেলে দিলেন তিনি, শেলফের পিছন থেকে বের করে আনলেন ব্র্যাণ্ডির একটা বোতল। আরেক শেলফ থেকে দুটো অপরিষ্কার গ্লাস নিলেন তিনি। সেক্রেটারির টেবিলে গ্লাস দুটো রাখলেন, বোতল থেকে ব্র্যাণ্ডি ঢাললেন। মুলারকে একটা গ্লাস ধরিয়ে দিয়ে বললেন, 'নরক কিংবা সুইটজারল্যাণ্ড, যেটা আগে আসে।'

'আমাকেও কিছু যোগ করতে দাও,' বললেন মুলার, গ্লাস দুটো মৃদু ধাক্কা খেলো। 'টু দ্য ফোর্থ রাইখ!'

দুই

৬ই অক্টোবর, ১৯৮৬। মেডিলিন, কলম্বিয়া।

প্রাণটা অ্যাভিয়ানকা পাইলটদের হাতে সঁপে দিয়ে নিজের ওপর খুশি হয়ে উঠলো মাসুদ রানা, পশ্চিম গোলার্ধে এটাই সবচেয়ে পুরনো এয়ারলাইন। ঝুঁকিবহুল বিমানপথে দক্ষ পাইলটদের অভিজ্ঞতাই এক-মাত্র ভরসা। আন্দেজের বিশাল তিনটে শৈলশির পঁচিশ হাজার ফুট ওপর থেকেও পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে, তারপর হঠাৎ ওগুলোর একটাকে লক্ষ্য করে ঘুড়ির মতো খাড়া গোঁত্তা দিয়ে নামতে শুরু করলো প্লেন। মাঝখানের ওই পাথুরে মেরুদণ্ডটাকে সেন্ট্রাল কর্ডেলেরা বলা হয়, দেখে মনে হবে অকস্মাৎ পাক খেয়ে নামতে শুরু করেছে পাহাড়ী উপত্যকার ওপর সাজানো একটা শহরের দিকে। বোগোটাতেও এই একই দৃশ্য দেখেছে রানা। গোটা দেশটাই খাড়া পাহাড়ের সমষ্টি, কলম্বিয়াকে সম্ভবত বিমান পথই এক করে রেখেছে।

এয়ারলাইন টার্মিন্যালের সামনে একটা ট্যাক্সি দেখলো রানা, আরোহীরা নামছে, সেটাও মান্ধাতা আমলের বলে মনে হলো। উনিশশো চৌষট্টি সালের শেভ্রোলে বেল এয়ার, ভেতরে একটা ক্যাডি-

লাকের চেয়ে বেশি জায়গা। যদিও রানা নিশ্চিত যে এখানে ওর উপস্থিতি সম্পর্কে প্রায় কেউই কিছু জানে না, তবু অপেক্ষারত কোনো ট্যাক্সিতে চড়ে সতর্কতা অবলম্বনের নিয়ম ভাঙতে রাজি নয় ও। তাছাড়া, পুরনো হলেও শেভ্রোলেটা ওর মনে ধরেছে, অনেকদিন পর এ-ধরনের একটা গাড়িতে চড়ার সুযোগ ছাড়তে ইচ্ছে করছে না।

ড্রাইভারকেও পছন্দ হলো ওর। গায়ের টি-শার্টে ইংরেজিতে লেখা রয়েছে, 'পে অর ডাই'। পঁচিশ কি ছাব্বিশ বছর বয়স হবে, নাকের নিচে ওটা গোঁফ নয়, যেন জ্যান্ত একটা প্রজাপতি, হাত বাড়ালেই উড়ে যাবে। পেশীবহুল হাত দুটো হুইল নয়, যেন জাহাজের হেল্‌ম্ ঘোরাচ্ছে। ধাতব ড্যাশবোর্ডের একদিকে যিশুর একটা মূর্তি, অপর দিকে দাঁড়িয়ে আছে চে গুয়েভারা। দুটো মূর্তি একই আকারের, দেখতেও প্রায় একইরকম, তবে যিশুর মাথায় একটা মুকুট পরানো হয়েছে। এ এমন একজন ট্যাক্সি ড্রাইভার, গোটা টেবিলের সমস্ত টাকা পাবার জন্যে বাজি ধরে।

'আপনি কি আরবের একজন শেখ, সিনর?'

'ক্যানাডিয়ান,' বললো রানা, মিথ্যেটা সত্যি বলে চালাবার জন্যে সাথে একটা পাসপোর্ট ওর আছে।

রিয়ারভিউ মিররে চোখ রেখে আগ্রহী হবার ভান করলো ড্রাইভার। 'আমার এক মামাতো ভাই আছে, মন্ট্রিলে থাকে।'

'দুঃখিত, আমার কোনো ভাই-বেরাদার কোথাও নেই। আমি একা।'

লোকটা বুঝতে পারলো তাকে বলা হচ্ছে নিজের চরকায় তেল দাও, তবে গ্রাহ্য না করার মতো অভিজ্ঞ খেলোয়াড় সে। 'আত্মীয়-স্বজন না থাকলেও, বন্ধু-বান্ধব তো থাকতেই পারে,' বললো ড্রাইভার।

'মেডিলিনে তেমন কেউ আছে আপনার ?'

'শহরের কাউকে আমি চিনি না।'

'তাহলে বলতে হয়, ব্যাপারটা অদ্ভুত, সিনর। ভারি অদ্ভুত।'

রানা জানে এরপর লোকটা কি প্রশ্ন আশা করছে। 'কেন ?'

'কারণ, আমি ভয় করছি, কেউ আপনাকে চেনে।'

ভাবতে পছন্দ করে রানা, ও কখনো বিস্মিত হয় না। মাঝে মধ্যে বিভ্রান্ত হয় বটে, যতোক্ষণ না প্রকৃত ঘটনা প্রকাশ পায়। বর্তমান অ্যাসাইনমেন্টে ওকে কেউ সাহায্য করছে না, এমন কোনো সূত্র নেই যা অনুসরণ করা যেতে পারে, আর দুনিয়ার মাত্র তিনজন মানুষ জানে কোথায় যাচ্ছে ও। বিস্তারিত জানে মাত্র একজন। 'কি ধরনের গাড়ি ?' জানতে চাইলো ও।

'জাপানী,' জবাব দিলো ড্রাইভার।

'ক'টা মাথা ?'

'দুটো দেখতে পাচ্ছি,' বললো সে, একটা আঙুলের পুরোটা খাড়া করলো, ভাঁজ করা অর্ধেক দ্বিতীয়টার।

শিকারী শিকারে পরিণত হলে উত্তেজনা বাড়েই। যে শিকারকে খুঁজে বের করার নির্দেশ ও অনুরোধ পেয়েছে রানা, তাঁর দ্বারা ক্ষতি-গ্রস্ত দু'একজনের স্মৃতি বাদে, গত চল্লিশ বছরে তাঁকে কোথাও দেখা যায়নি। সম্ভব হলে জীবিত আটক করতে হবে তাঁকে। এক সময় তিনি ইন্টেলিজেন্স অফিসার ছিলেন, তাঁর যুগের সেরা প্রতিভাদের একজন, অর্থাৎ যেমন নিষ্ঠুর তেমনি দক্ষ। তাঁর সন্ধান পাওয়া খুব সহজ হবে বলে আশা করে না রানা।

চওড়া অটোপিসটা-য় ষাট ডিগ্রী বাঁক ঘুরছে ট্যাক্সি, পিছনের গাড়ি-টার দিকে তাকাবার জন্যে এই মুহূর্তটাই বেছে নিলো রানা। একটা

হোণ্ডা প্রিলিউড। দক্ষ হাতে পড়েছে গাড়িটা, রাস্তার এক পাশ ঘেঁষে সাবলীল গতিতে আসছে। দুটোই মাথা, তবে সহজে চোখে পড়ে না। দুটোর কোনোটাই গাড়ির হেডরেস্টের চুড়ো ছুঁতে পারেনি। ব্যাপারটা মোটেও স্বস্তিকর নয়। শরীর-স্বাস্থ্য ও বুদ্ধির অভাব সাধারণত স্বয়ংক্রিয় আগ্নেয়াস্ত্র দিয়ে পূরণ করা হয়। রানা যাঁর খোঁজে এসেছে, আজকাল তিনি নিজের পরিচয় দেন রলফ মুয়েলার বলে। নিজেকে ডাচ বলে দাবি করেন, কলম্বিয়ায় স্থায়ী আসন গেড়েছেন, সফল একজন ব্যবসায়ী। হোণ্ডার আরোহীরা যদি তাঁর লোক হয়, অবশ্যই পেশাদার হবে ওরা, মোটা টাকার বিনিময়ে কাজ করছে।

'আমরা কি করবো, সিনর?' জানতে চাইলো ড্রাইভার। 'আপনি আমাকে নির্দেশ দেবেন না?'

'কিছুই করো না,' বললো রানা। 'হোটেল শেরাটনের দিকে যেতে থাকো।'

আবার রিয়ারভিউ মিররে চোখ রাখলো ড্রাইভার। নতুন করে আরোহীর মাপজোক নিলো সে। প্রথমবারও সে তার আরোহীকে ট্যুরিস্ট বা হাবাগোবা বলে ধরে নেয়নি, তবে এবার তার শান্ত নির্লিপ্ত চেহারা দেখে আন্দাজ করলো, মাছটা গভীর জলেরই হবে। চরিত্র ও প্রকৃতি বোঝার চেষ্টা বাদ দিয়ে দু'বার চোখ মিটমিট করলো সে। তারপর মুখ খুললো, 'সিনর, আপনার মতো ঠাণ্ডা মানুষকে অপমান করার স্পর্ধা আমার নেই। তবে, আপনাকে জানানো কর্তব্য বলে মনে করছি যে চলতি বছর আমাদের মেডিলিন শহরে পনেরো শোর বেশি হত্যাকাণ্ড ঘটেছে। এই তথ্য আমি আমার দুলাভাইয়ের কাছ থেকে পেয়েছি, পুলিশ বিভাগে আছেন তিনি। জোর দিয়ে বলতে পারি, হিসেবটায় কোনো ভুল নেই।'

'পারিবারিক অঘটনের কথা বলছো তুমি ?'

'দু'একটা, সিনর। বাকি সব ককেরসদের কাজ।'

'ককেরস ?'

'আপনার ডিকশনারিয়োতে শব্দটা পাবেন না, সিনর। শব্দটার একাধিক অর্থের একটা হলো, যারা কোকেন ব্যবহার করে। তবে আজকাল সবকিছুর মতো শব্দটার মানেও বদলে গেছে। ককেরস বলতে মানুষ এখন বোঝায়, সম্ভবত, একজন কাউবয়। কোকেন কাউ-বয়।'

'তুমি কি বলতে চাইছো যে বন্দুকে এঁরা খুব ওস্তাদ ?'

'সিনর, আমি আপনাকে বলছি, ককেরসরা খুন করার ব্যাপারে বাছবিচার করে না। আমাদের দেশে আপনি একজন মেহমান, অবশ্যই শ্রদ্ধেয়, কিন্তু ওরা বিচারকদেরও খুন করেছে, এমন কি সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি বা সরকারের উচ্চপদস্থ অফিসারকেও বাদ দেয়নি। চলতি বছর শুধু পুলিশই খুন হয়েছে কয়েক শো। এ-সব তথ্যও আমি আমার দুলাভাইয়ের কাছ থেকে পেয়েছি।'

লোকটার দেয়া পরিসংখ্যান অবিশ্বাস করলো না রানা। দুনিয়া-দারির খবর রাখা যাদের অভ্যেস, কলম্বিয়ার অবস্থা সম্পর্কে তাদেরকে নতুন করে কিছু বলার দরকার নেই। দেশটার পরিস্থিতি সম্পর্কে ড্রাগ এনফোর্সমেণ্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন-এর তথ্য ভাণ্ডারও পরিষ্কার একটা ছবি পেতে সাহায্য করেছে ওকে। ন্যাশনাল সিকিউরিটি এজেন্সির বিশে-ষজ্ঞরাও ওকে ব্রিফিং করেছে। দুটোই মার্কিন সংগঠন। মেডিলিন হলো কলম্বিয়ান ড্রাগ কার্টেল-এর হেডকোয়ার্টার, কোকেন সম্রাটদের স্বর্গরাজ্য। বিশের দশকে শিকাগোয় যে ভয়ংকর পরিস্থিতি ছিলো, আজকের কলম্বিয়ার অবস্থা ঠিক সেরকম, পার্থক্য এইটুকু যে ধরার

জন্যে আরো কয়েক লক্ষ গুণ বেশি টাকা উড়ছে এখানে, অস্ত্রগুলোও সেই হারে মারাত্মক।

'তোমার নাম কি বললে না যে?'

'পিটার পিনেল, সিনর।'

ড্যাশবোর্ডের একটা মূর্তির ব্যাখ্যা পাওয়া গেল—নামের খাতিরে যিশুর উপস্থিতি। রানা অনুভব করলো, চে-র উপস্থিতি সম্পর্কে ব্যাখ্যা চাওয়ার কোনো ইচ্ছে ওর মনে জাগছে না। 'পিনেল, আমি তোমাকে নিশ্চয়তা দিচ্ছি, ড্রাগ ব্যবসার সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই।'

'এভাবে যখন বলছেন, আপনার কথা আমি বিশ্বাস করবো।'

'তবে জাপানী গাড়িটা যদি সরাসরি পাশে চলে আসার চেষ্টা করে, নিরাপত্তার খাতিরে যে-কোনো কৌশল খাটাবার অধিকার তোমার আছে।'

আয়নায় এক মুহূর্ত চোখ রেখে কৃতজ্ঞতার সাথে হাসলো পিনেল। নির্দেশ, নির্দেশের ভাষা, দুটোই তার ভারি পছন্দ হলো। এ-ধরনের পরিস্থিতিতে পড়লে তার দুলাভাই ঠিক এই ভাষাই ব্যবহার করতো। রানার বিশ্বাস, গাড়ি দুটোর মাঝখানের ব্যবধান অবশ্যই বাড়াতে পারবে পিনেল, হোণ্ডাকে যদি খসাতে না-ও পারে। চেহারা দেখে ওর মনে হয়েছে, নিজের পেশায় লোকটা দক্ষ।

কিন্তু নৈপুণ্য দেখাবার সুযোগ পিনেলকে দেয়া হলো না। ওদের বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপই নিলো না হোণ্ডা, আগের মতোই বরাবর দুশো গজ পিছনে থাকলো। অটোপিসটা ছেড়ে মেডিলিন শহরের মাঝখানে ঢোকার খানিক আগে থেকেই ট্রাফিকের সংখ্যা বেড়ে গেল, সেই সাথে সতর্ক হয়ে উঠলো পিনেল। এই প্রথম দূরত্ব কমিয়ে আনার

চেষ্টা করলো হোণ্ডার ড্রাইভার। খানিকটা কাছে এলো বটে, কিন্তু এতো কাছে নয় যে আরোহীদের চেহারা পরিষ্কার দেখা যায়। শেরাটনের সামনে ট্যাক্সি থামালো পিনেল, ক্যারেরা ফিফটি-ওয়ানে খালি একটা জায়গা দেখে ঢুকে পড়লো হোণ্ডা।

পরিস্থিতি যতোই বিরূপ হোক না কেন, সুবিধেজনক দু'একটা দিক সবসময় থাকে। যার ওপর নজর রাখা হয়েছে সে-ও কিছু সুবিধে ভোগ করে। পিনেলের সাথে কথা বলে ঠিক করে নিলো রানা আবার কখন কোথায় দেখা হবে ওদের, তারপর হোটেলে নাম লেখালো, এলিভেটরে চড়ে উঠে এলো পাঁচতলায়। এখানে লাগেজগুলো রাখলো ও। রুমসার্ভিসকে ডেকে কিছু পেসো সাধলো, বিনিময়ে জেনে নিলো সার্ভিস এলিভেটরটা কোন্‌দিকে। শেরাটন ভবন থেকে চুপিসারে বেরিয়ে এলো পিছনের রাস্তায়। হোণ্ডার লোকগুলো যদি রুমসার্ভিসকে প্রশ্ন করে, জানতে পারবে তাদের সাবজেক্ট ফাঁকি দিয়েছে। আর যদি প্রশ্ন না করে, খালি একটা স্যুইট পাহারা দেবে তারা। দ্বিতীয়টা হলে ভালো হয়, ভাবলো রানা, কারণ ফেরার পর কিছু প্রশ্ন করার ইচ্ছে রাখে ও।

প্লাজা দে বলিভার পর্যন্ত হেঁটে এলো রানা, সময় লাগলো পনেরো মিনিট। প্রতিপক্ষদের ব্যাক-আপ টিম থাকতেও পারে, এই আশংকায় সতর্কতা অবলম্বন না করলে সাত মিনিটে পৌঁছুতে পারতো ও। রেল-ওয়ের একটা কাউন্টার থেকে রানঅ্যাওয়ে ট্রেন-এর টিকেট কিনলো, পাশের দোকান থেকে কিনলো বাদামি রঙের একটা হ্যাট—প্রথমটা থেকে বেরোবার সময় ইমার্জেন্সী এগজিট ব্যবহার করলো, দ্বিতীয়টা থেকে বেরোলো পিছনের দরজা দিয়ে। এরপর প্রায় সরল একটা পথ ধরে প্লাজা দে বলিভারে চলে এলো, যেখানে ওর জন্যে ট্যাক্সি নিয়ে

অপেক্ষা করছে পিনেল। রানা নিশ্চিত, কেউ ওকে ফলো করেনি।

প্লাজা খানিকটা দূরে থাকতেই হাঁটার গতি কমে গেল রানার, মুগ্ধ দৃষ্টি বোলালো চারদিকে। শিল্প শহর হিসেবে মেডিলিনের খ্যাতি আছে। শহরটা বিশেষ করে টেক্সটাইল, কেমিক্যাল আর ইস্পাতের জন্যে বিখ্যাত, অথচ চারদিকে কোথাও আবর্জনা বা নোংরামির চিহ্নমাত্র নেই। প্রধান রাস্তাগুলোর দু'ধারে ফুলের সরু বাগান। বাগানে কাগজের টুকরো তো দূরের কথা, ঝরা পাতা বা ফুলের পাপড়ি পর্যন্ত পড়ে নেই। ফুটপাতের মেঝে এতো মসৃণ যে একটু অসাবধান হলে আছাড় খেতে হবে। রাস্তার দু'পাশে দালান-কোঠা আধুনিক স্থাপত্যরীতির উদাহরণ। রানা অনুভব করলো, ওর পায়ে যেন স্প্রিঙ লাগানো আছে, কৃতিত্বটা প্রকৃতির—সাগর সমতল থেকে পাঁচ হাজার ফুট ওপরে রয়েছে ও। মেডিলিনে কেউ বাস করতে চাইলে তাকে হয় কানে তুলো দিতে হবে, নয়তো বিরতিহীন গান-বাজনার ভক্ত হতে হবে। প্রায় প্রতিটি বাস বা মোটরের ভেতর জোরালো শব্দে রেডিও অথবা ক্যাসেট রেকর্ডার বাজছে। ঠাণ্ডা, নির্মল বাতাস। বছরের যে-কোনো সময় বসন্তের আমেজ পাওয়া যাবে। মেডিলিনকে সাধে কি আর 'সিটি অভ ইটারন্যাল স্প্রিঙ' বলা হয়।

সার সার পাম গাছ দিয়ে সাজানো প্লাজার পুবদিকে অপেক্ষা করছিল পিটার পিনেল। রানাকে দেখে কর্ন প্যানকেকের শেষ টুকরোটা মুখে পুরে দিলো সে, একরাশ ধোঁয়া উড়িয়ে স্টার্ট নিলো অ্যান্টিক গাড়িটা। রানা চড়ে বসতেই বেল এয়ার নিয়ে দক্ষিণ দিকে রওনা হলো সে, এল পাবলাডো জেলার দিকে যাচ্ছে।

'শহরটা তুমি ভালো চেনো তো?'

রানার প্রশ্নের উত্তরে নিজেও হাসলো পিনেল, রানারও হাসির

খোরাক যোগালো, 'আমার স্ত্রীর মসৃণ নিতম্বে কোথায় তিল আছে যেমন জানি, তেমনি জানি শহরটার কোথায় ক'টা গলি আছে।' এর-পর শহরের দর্শনীয় জায়গাগুলো সম্পর্কে ঝানু গাইডের মতো বর্ণনা দিতে শুরু করলো সে। নিজের শহর মেডিলিনকে নিয়ে গর্বিত পিনেল, প্রতিটি স্কাইস্ক্র্যাপারের সাথে রানার পরিচয় করিয়ে দেয়ার জন্যে ব্যাকুল, বহুতল অ্যাপার্টমেন্ট ভবনগুলোর নেপথ্যকাহিনী তার মুখস্থ, বিশাল প্রাঙ্গণ নিয়ে রাজপ্রাসাদতুল্য দালানগুলোয় কারা বস-বাস করে তা-ও তার জানা। সবশেষে আসল কথাটা বলতে ভুল হলো না তার, এ-সবই তৈরি হয়েছে নারকো-ডলারের বদৌলতে।

যেমন ধরা যাক সসার স্টেডিয়াম। এখানে যে-ক'টা টিম ফুটবল খেলে প্রায় সবগুলোই পরিচালনা করে কোকেন সম্রাটরা। মাঝে মধ্যে, আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায়, মেডিলিনের ড্রাগ কাপুদের টিম বোগোটা বা কালির ড্রাগ কাপুদের টিমের সাথে খেলে। বাজি ধরা হয় কোটি কোটি ডলার। খেলোয়াড়রা বোনাস হিসেবে ডলার বা সোনা পায় না, পায় কোকেন—পরিশোধিত কোকেন, আউন্স হিসেবে। রেফারিরা প্রায়ই আততায়ীদের হাতে খুন হয়ে যায়।

তবে মেডিলিনের আরেকটা পরিচয় 'সিটি অভ অর্কিডস'-ও বটে। দুর্লভ ফুলগুলো আবরা উপত্যকায় ঘাসের মতো বিপুল জন্মায়। শহর-তলীতে ঢোকার সময় রঙিন অর্কিড, বোগেনভিলিয়া আর জেসমিনের বিরতিহীন সৌন্দর্যের বিস্ফোরণ চোখ ধাঁধিয়ে দিলো—ওগুলো কোনো ঋতু মানে না, মাঝে মধ্যে বৃষ্টি হলেই ফুটতে শুরু করে। দূরে, সার সার উঁচু বিল্ডিঙের পিছনে, আন্দেজের খাড়া প্রাচীর অকস্মাৎ, গভীর নীল ও এবড়োখেবড়ো, মাথাচাড়া দিয়ে উঠে গেছে আকাশের দিকে।

সুরক্ষিত একটা বাড়ির গেট পেরিয়ে গাড়ি-পথে ঢুকলো ট্যাক্সি।

বাড়ির চারদিকে পাঁচিলটা দশ ফুট উঁচু, তার ওপর কাঁটাতার। গাড়ি-পথের শেষ মাথায় লাল টালির ছাদ নিয়ে বিশাল বাড়িটা যে কোনো সৌখিন ও ধনী ব্যক্তির তাতে কোনো সন্দেহ নেই। পান্না সবুজ লন। ম্লান গোলাপি মাটি। কৃত্রিম ঝর্ণার পানিতে সোনালি মাছ। গ্যারেজের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা সুইডিশ গাড়িটা ঠিক যেন স্থির অগ্নিশিখা।

যদিও বিশেষ গুরুত্ব দিলো না রানা, কারণ আট হাজার ফুটের নিচে যে-কোনো উচ্চতায় কখনোই নিজের ভেতর কোনো পরিবর্তন লক্ষ্য করে না ও, তবু অনুভূতিটা থাকলো—কেমন যেন স্থানচ্যুত লাগছে নিজেকে, গোড়ালিতে হালকা একটা অলস ভাব, নার্ভে যেন আঘাত পেয়েছে। কয়েক বছর আগে বিভিন্ন ধরনের ড্রাগ খাইয়ে আকাশে তুলে দেয়া হয়েছিল ওকে—বুদ্ধিহীন, বাচাল আর আতংকিত করার জন্যে। ককটেল পেটে পড়ার পর প্রথম দিকে ঠিক এরকম অনুভূতি হয়েছিল ওর—ভয়ের মৃদু অনুভূতি, যেন খুলি ভেদ করে ভেতরে ঢুকে পড়েছে রঙগুলো, চোখের সামনে যা কিছু দেখছে কোনোটারই অর্থ পুরোপুরি পরিষ্কার নয়।

তবে দরজা খুলে ওর সামনে যিনি দাঁড়ালেন তাঁকে দেখে শান্তি ও স্বস্তিবোধ করলো রানা। ভদ্রলোক অশীতিপর বৃদ্ধ হলেও কাঠামোটা পাঁচিলের মতো চওড়া। তাঁর নাম আলিজান আকরাম, প্রায় সত্তর বছর ধরে ভাগ্যের পরিহাসকে তুচ্ছ জ্ঞান করে আপন মর্যাদায় আসীন আছেন। এককালে জার্মান নাগরিক ছিলেন, ছিলেন জার্মান ইহুদি, কিন্তু তাঁকে দেখে মনে হবে স্প্যানিশ। নাৎসীদের ভয়ে নয়, তাঁর ভাষায় 'চোখ খুলে যাওয়ায়', ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন—বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবার কয়েক বছর পর। গায়ের চামড়ায় ভাঁজ পড়লেও, চামড়ার

রঙ এখনো উজ্জ্বল আর গাঢ়। সতর্কতার সাথে বাছাই করা মূল্যবান পোশাক পরেন ভদ্রলোক। মুখ ভর্তি সুন্দর করে ছাঁটা পাকা দাড়ি। সব মিলিয়ে অভিজাত ও পবিত্র একটা ভাব ফুটে আছে চেহারায়, দুটোর সম্মিলন প্রায় অসম্ভব বলে মনে হলেও। মুখ খোলার পর বোঝা গেল, তাঁর ভরাট গলায় এখনো যথেষ্ট জোর থাকলেও, সবিনয় কোমল সুরে কথা বলতেই অভ্যস্ত তিনি। 'মিঃ ওয়ারেন?'

রেলওয়ে কাউন্টার থেকে টিকেট কেনার সময় ফোনে এই নামটাই বলেছে রানা; ওর পাসপোর্টেও তাই লেখা আছে। 'জ্বী,' বললো ও। 'পল ওয়ারেন।'

'প্লিজ, কাম্ ইন।'

অনায়াস পদক্ষেপে বৃদ্ধ ভদ্রলোকের পিছু পিছু একটা অ্যানটিরুম হয়ে এগোলো রানা, ভেতরে কলম্বিয়া-পূর্ব যুগের মৃৎ আর ভাস্কর্য শিল্পের ছড়াছড়ি। লিভিংরুমে ঢোকার পর থমকে দাঁড়াতে হলো ওকে, হালফ্যাশনের ফার্নিচার আর বিভিন্ন জাতের শিল্পকর্ম দিয়ে এমনভাবে সাজানো যে এরকম একটা জায়গায় উপস্থিত হতে পারার জন্যে প্রসন্ন বোধ না করে পারা যায় না। তৈলচিত্রগুলো আধুনিক, সম্ভবত দেশীয়, আর সোনালি মূর্তি ও অন্যান্য শিল্পকর্মগুলো নিঃসন্দেহে প্রাচীন যুগের প্রতিনিধিত্ব করছে। একদিকের গোটা দেয়াল জুড়ে শোভা পাচ্ছে ব্রোঞ্জ আর সোনা দিয়ে তৈরি কাবা শরীফ। আরেকদিকে একটা চওড়া বেদী, তার ওপর সোনালি একটা নৌকো, নৌকায় বসে আছে সোনালি এক লোক।

'এল ডোরাডো,' বললেন আলিজান আকরাম, রানার দৃষ্টি অনুসরণ করে সোনালি বেদীর দিকে তাকালেন। 'বুঝতে পারছি, ওটা তোমার মনোযোগ কেড়েছে।'

'জ্বী।'

'এল ডোরাডো বলতে আজকাল অনেক কিছু বোঝায়,' বললেন তিনি। 'অফুরন্ত গুপ্তধন নিয়ে কিংবদন্তীর এক শহর। অঢেল ঐশ্বর্যের একটা প্রতীক। কলম্বিয়া আর এল ডোরাডো এখন সমার্থক। তবে আসলে শব্দটার মানে করা হতো, সোনার মানুষ। মুইসকা ইণ্ডিয়ানরা তাদের সর্দারকে প্রথমে গাছের রস দিয়ে ভিজিয়ে নিতো, তারপর তাকে ঢেকে দিতো সোনার গুঁড়ো দিয়ে। একটা ভেলায় তুলে তাকে নিয়ে যাওয়া হতো লেকের মাঝখানে, ওখানেই ডুবে যেতো সে। তার শরীর থেকে ধুয়ে বেরিয়ে যেতো যে-টুকু সোনা, ওইটুকুই ছিলো দেবতাদের উদ্দেশ্যে তাদের নিবেদন।'

'অনেকের কাছেই ব্যাপারটা অপচয় বলে মনে হবে, স্যার,' বললো রানা, তারপর নিজেই অবাক হলো—মেজর জেনারেল রাহাত খান ছাড়া আর কাউকে কখনো স্যার বলে সম্বোধন করেছে বলে মনে পড়ে না ওর।

'স্প্যানিশদের তাই মনে হয়েছিল,' নরম সুরে বললেন তিনি। 'আধুনিক যুগে যারা গুপ্তধনের সন্ধানে লেক গুয়াটাভিটা-র তলায় ডুব দিয়েছে, তাদেরও তাই ধারণা। তবে, সংস্কৃতি ও রীতির প্রতি সংবেদনশীল কোনো মানুষ তাদের সাথে একমত হবে না।'

'অবশ্যই।'

আলিজান আকরামের ঠোঁটে মৃদু হাসি দেখে মনে হলো তিনি জানেন তাঁর সাথে কৌতুক করা হয়েছে। ধীর ভঙ্গিতে এক পাশে সরে দাঁড়ালেন তিনি, ট্রে হাতে উদয় হলো এক তরুণী। ট্রেতে দুটো কাপ আর একটা প্লেট দেখা গেল। কাপে সম্ভবত কফি, প্লেটটায় চাটনি ধরনের কিছু হবে। একটা টেবিলের ওপর ট্রে নামিয়ে রেখে যেমন

নিঃশব্দে ঢুকেছে তেমনি নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল মেয়েটা।

'এ-ও আরেকটা রীতি,' বৃদ্ধ বললেন। 'টিনটো। কোনো কাজই শুরু হবে না, সূচনা হবে না কোনো সম্পর্কের, যদি না এই কফি পরিবেশন করা হয়।'

শুরু করার অনুরোধটা রক্ষা করলো রানা। অত্যন্ত গাঢ় কফি, এতো ভালো ব্লেণ্ড-এর স্বাদ আগে কখনো পেয়েছে বলে মনে পড়লো না। প্রতিক্রিয়া হলো সাথে সাথে; ড্রাগ-এর চেয়ে কোনো অংশে কম নয়। 'লিলি, লিলিয়ানের মুখে আপনার নাম শুনে এসেছি আমি,' বললো ও। 'তার ধারণা, আপনি আমাকে সাহায্য করতে পারবেন।'

হাত দুটো প্রসারিত করলেন বৃদ্ধ, রানা লক্ষ্য করলো হাড়গুলো অত্যন্ত চওড়া হলেও মাংস ও চর্বি খুব কম। 'আমিও যে তাকে খুঁজছি, এটা সে জানতে পারে আমার এক ছাত্রের মুখে,' অন্যমনস্কভাবে বললেন তিনি, তাঁর চোখ দেখে রানার মনে হলো অতীতে ফিরে গেছেন ভদ্রলোক। 'লিলির বন্ধু, কাজেই তুমি আমার কাছে সাহায্য পাবে বলে আশা করতে পারো। কেমন আছে সে?'

সাথে সাথে কিছু বললো না রানা, কারণ প্রশ্নটার সন্তোষজনক উত্তর দেয়া কঠিন। স্বদেশেই আছে সে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, কিন্তু বিদেশী একটা দূতাবাসে আত্মগোপন করতে হয়েছে তাকে। এমন কিছু তথ্য জানা আছে তার, প্রকাশ পেলে মার্কিন সরকারের ভিত নাড়িয়ে দিতে পারে, সেই সাথে বেরিয়ে পড়বে সি. আই. এ.-র কুৎসিত উলঙ্গ চেহারা।

'সে ভালো আছে, মিঃ আকরাম।'

'তুমি ঠিক জানো?'

'আমি জানি সে নিরাপদে আছে,' বললো রানা। 'এর বেশি কিছু

বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। দুঃখিত, মিঃ আকরাম।'

রানা বুঝতে পারলো উত্তরটা পছন্দ হলো না ভদ্রলোকের, তবু হলদেটে দাঁত বের করে হাসলেন তিনি। 'জানতে চাইছি এজন্যে যে মেয়েটাকে সত্যি খুব ভালোবাসি আমি। তুমি কি জানো, লিলির বাবা আমার বন্ধু ছিলো? যুদ্ধের আগে আমরা একসাথে লেখাপড়া করেছি।'

রানা যেমন চায়, সেদিকেই এগোচ্ছে আলোচনাটা। ভদ্রলোককে উৎসাহিত করার জন্যে বললো, 'জার্মেনীতে।'

'ম্যাথামেটিক্যাল ইনস্টিটিউট, গোটেনজেন-এ। আমরা একসাথে বেরিয়ে আসি, মার্টিন আর আমি। নাকি বলা উচিত, সে বেরিয়ে আসে? আমি তখন ইহুদি ছিলাম, পালিয়ে আসি।'

'তারমানে আগেই আপনি বুঝতে পেরেছিলেন যে…।'

'না, তা নয়,' গম্ভীর সুরে বললেন আলিজান আকরাম। 'নাৎসীরা ক্ষমতা পাবার প্রায় সাথে সাথেই ইউনিভার্সিটিতে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা দেখা দিয়েছিল। সবাই বুঝতে পেরেছিল কি তাদের উদ্দেশ্য। যুদ্ধের আগেই হাজার হাজার ইহুদি জার্মেনী ছেড়ে পালিয়ে আসে। কিন্তু সবার পক্ষে চলে আসা কি সম্ভব?' অনেকেই বিশ্বাস করতো না যে ফ্যাসিস্টরা তাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করবে। তাদের মধ্যে আমিও একজন ছিলাম। কিন্তু মার্টিন আমাকে বোঝায়। আমার প্রাণ বাঁচানোর জন্যে তার কাছে আমি ঋণী।'

সেই ঋণ পরিশোধ করেছেন আলিজান আকরাম। কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটিতে শিক্ষকতা করতেন দুই বন্ধু। আলিজান আকরাম অংকশাস্ত্রে মহাপণ্ডিত, কিন্তু প্রচারবিমুখ। বন্ধু মার্টিন শুধু তাঁর বন্ধু নন, ভক্তও বটেন। আলিজান আকরাম স্বধর্ম ত্যাগ করে মুসলমান হলেন, তবু ইহুদি মার্টিন বেকার বন্ধুর প্রিয় সঙ্গ ত্যাগ করতে রাজি হলেন

না। যুক্তরাষ্ট্র থেকে স্ত্রীর চিঠি এলো, তিনি যদি কলম্বিয়া ছেড়ে নিউ-ইয়র্কে না আসেন, তাঁদের দাম্পত্য জীবনের ইতি ঘটাই সবদিক থেকে ভালো। চিঠির উত্তরে পাল্টা প্রস্তাব দিলেন মার্টিন বেকার, মেয়েকে নিয়ে তুমিই বরং মেডিলিনে চলে এসো। কিন্তু স্ত্রী এলেন না। বছর কয়েক পর হঠাৎ হার্ট অ্যাটাকে মারা গেলেন ভদ্রলোক। খবর নিতে গিয়ে আলিজান আকরাম জানলেন, বন্ধুপত্নীরও মৃত্যু ঘটেছে কিছুদিন আগে। অনেক খোঁজ-খবর করেও বন্ধুকন্যার কোনো হদিশ বের করতে পারলেন না তিনি। অথচ বন্ধুর রেখে যাওয়া বেশ কিছু টাকা তাঁর কাছে রয়েছে। কথা প্রসঙ্গে ব্যাপারটা তিনি জানিয়ে ছিলেন রাহাত খানকে।

এ-প্রসঙ্গে আলাপের সূত্র ধরে মেজর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) রাহাত খানের একটা দুর্লভ গুণের কথা জানতে পেরেছে রানা। ইনি না বললে কোনোদিনই ওর জানা হতো না যে অঙ্কশাস্ত্র নিয়ে মাথা ঘামানোর প্রবল একটা শখ আছে তাঁর। অঙ্কশাস্ত্রে দুনিয়ার সেরা পণ্ডিতদের একজন আলিজান আকরাম, এ-কথা জানতে পেরে সুদূর বাংলাদেশ থেকে তাঁর সাথে দেখা করতে আসেন তিনি। এরপরের ঘটনা রানা শুধু এইটুকু জানে যে ছাত্র হিসেবে আলিজান আকরাম রাহাত খানকে অত্যন্ত স্নেহ করেন—আজও।

তারপর, রাহাত খানের সাথে লিলিয়ানের যোগাযোগ হলো কিভাবে, সে অন্য গল্প। তবে তাঁর পরামর্শেই আলিজান আকরামের কাছে সাহায্যপ্রার্থী হয়ে আসে লিলিয়ান। তখনই মার্টিন বেকারের গচ্ছিত টাকাগুলো লিলিয়ানের হাতে তুলে দেন ভদ্রলোক।

মেডিলিনের সবাইকে চেনেন আলিজান আকরাম, সেই সূত্রে শহর-টার সাথে লিলিয়ানের পরিচয় করিয়ে দেন তিনি। সেই ঘটনারই

ফলশ্রুতি হলো ববি মুয়েলার-এর সাথে লিলিয়ানের বিয়ে, ববি মুয়েলারের মৃত্যু, মেক্সিকান দূতাবাসে লিলিয়ানের আশ্রয় প্রার্থনা।

'এখানে এসেই কি ববি মুয়েলারের খোঁজ-খবর করে লিলিয়ান?' জানতে চাইলো রানা। 'আপনাকে বলেছিল, ববি মুয়েলারের সাথে তার পরিচয় করিয়ে দিতে হবে?'

'না,' মাথা নাড়লেন বৃদ্ধ। 'এলো তো একটা উন্মাদিনী। সব সময় ভয়ে ভয়ে থাকতো। বিড় বিড় করে প্রলাপ বকতো। জিজ্ঞেস করলে কিছু বলতো না। অনেক কষ্টে তাকে আমি সুস্থ করি। কয়েক হপ্তা পর বাইরে বেরোতে শুরু করে সে। তারপর একদিন বললো, ববি মুয়েলারের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়া যায় কিনা। শুনে আমি অবাকই হয়েছিলাম।'

'কেন?'

'কারণ তার দুর্নাম সম্পর্কে কে না জানতো।' ক্ষমা প্রার্থনাসূচক হাসি দেখা গেল বৃদ্ধের ঠোঁটে। 'কলম্বিয়ার প্রমোদ শহর মেডিলিন, মিঃ ওয়ারেন। সমস্ত বেলেল্লাপনায় হাত পাকানো ছিলো ববি মুয়েলারের। এরকম একটা নষ্ট পুরুষের সাথে কেন লিলিয়ান পরিচিত হতে চায় বুঝতে পারলাম না। পরে আমি অনুমান করি, একটা প্ল্যান ধরে কাজ করছিল সে। প্ল্যানটা যে কি, আজও আমি তা জানতে পারিনি। তবে লিলিয়ান মুয়েলারকে বিয়ে করে ফেলায় সত্যি আমি আঘাত পাই। বিয়েটায় মুয়েলারের রাজি হওয়া আমার কাছে বিস্ময়কর লাগেনি। সে রাজি হলো, আমার ধারণা, একটিমাত্র কারণে—কলম্বিয়ার কোনো মেয়ে তাকে বিয়ে করতো না, অথচ তারও তো একটা পরিবার থাকা চাই।'

লিলিয়ানের প্ল্যানটা কি ছিলো, এখুনি তা বৃদ্ধকে জানানো উচিত

হবে না বলে সিদ্ধান্ত নিলো রানা। তাঁর ছাত্র রাহাত খানের সাক্ষাৎ শিষ্য ও, এ-কথাটাও জানানোর কোনো প্রয়োজন দেখলো না। ববি মুয়েলারের কাছ থেকে অনেক কিছু পাবার আশা নিয়ে নিজেকে এক রকম বলি দিয়েছিল লিলিয়ান, বিয়েটা ছিলো স্রেফ অভিনয়। তার অতি গোপনীয় প্ল্যান-এ আলিজান আকরাম ছিলেন একটা ধাপ বিশেষ। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তাঁর জানারই সুযোগ হয়নি কি নিয়ে নাড়াচাড়া করছেন তিনি।

'আপনি কি ববি মুয়েলারের বাবাকেও চিনতেন?'

'তাঁর সাথে আমার একবার মাত্র দেখা হয়েছে,' বৃদ্ধ বললেন। 'ছেলের বিয়েতে এসেছিলেন তিনি। ছেলেকে তো নয়ই, বিয়েটাও তিনি পছন্দ করতে পেরেছেন বলে মনে হয়নি। তবে পরে আমি জানতে পারি, অবিশ্বাস আর সংশয় তাঁর স্বভাবেরই একটা অংশ। নিঃসঙ্গ, একাকী থাকতে পছন্দ করেন।'

'কাউকা উপত্যকায় তাঁর নাকি একটা জায়গা আছে।'

'শুনেছি সেটা নাকি এক বিশাল ব্যাপার। রক্ষণশীল, প্রচণ্ড প্রতাপশালী হাসিনদাদো, মানে জমিদার, বলে মনে করা হয় তাঁকে। নিজের জমিতে তিনি কিছু কিছু কফি, ফল-ফলাদি, আখ ফলান; তবে আধুনিক অর্থে চাষবাস করেন না। তাঁকে আপনি ভদ্রলোক কৃষক বলতে পারেন। শুধু ইণ্ডিয়ানরা তাঁর কাজ করে। দেখে শুনে মনে হয়, স্থানীয় গোত্রগুলোর সাথে তাঁর বিশেষ একটা সম্পর্ক আছে। সব মিলিয়ে, আগেকার দিনের জমিদারদের বৈশিষ্ট্য পুরোমাত্রায় বজায় রাখার চেষ্টা করেন।'

'একটা ডিসটিলারির মালিক, শুনেছি,' বললো রানা।

ধীরে ধীরে মাথা ঝাঁকালেন আলিজান আকরাম। 'রমরমা ব্যবসা

করে ওটা। পঞ্চাশের দশকের শুরুতে শুধু ওটা নয়, আরো বেশ কয়েকটা ডিসটিলারি চালু করা হয়। তার আগে কলম্বিয়ার সব জায়গায় ছোটো ছোটো মদ চোলাই করার কারখানা ছিলো। স্থানীয় মদ 'চিচা' তৈরি সাধারণ মানুষের জন্যে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। আইনটা পাস হবার পর বড় কমার্শিয়াল ফার্মগুলো বাজারে ঢোকার পথ পেয়ে গেল।'

রানা জানে, প্রায় ওই সময়েই কলম্বিয়ায় পৌঁচেছেন রলফ মুয়েলার। সময় আর সুযোগ, দুটোর সংযোগ লক্ষ্য করে মনে মনে উৎসাহিত বোধ করলো ও। 'তিনি কি ডাচ?'

'নামটা ডাচ,' বললেন আলিজান আকরাম।

'তারমানে কি আপনি বলতে চান রলফ মুয়েলার ডাচ নন?'

'আমি বলতে চাই তিনি স্প্যানিশ বলেন জার্মান সুরে,' জোর দিয়ে বললেন বৃদ্ধ। 'ঠিক জার্মান নয়, বাভারিয়ান সুরে।'

'ধরে নেয়া চলে কি যে তিনি মিউনিক থেকে এসেছেন?' জিজ্ঞেস করলো রানা, জানে শতাব্দীর সূচনালগ্নে ওর শিকার ওই শহরেই জন্মেছে।

'সম্ভাবনা আছে,' আলিজান আকরাম বললেন। 'ভালো সম্ভাবনা আছে।'

'একজন জার্মান কেন নিজেকে ডাচ বলে পরিচয় দেবে, যদি না তার লুকোবার কিছু থাকে?'

'ভাষা ও জাতিগত মিল আছে, এটা একটা কারণ হতে পারে। আরেকটা কারণ হতে পারে, ডাচ কলোনি সুরিনাম কাছেই।'

'কাভার হিসেবে ভালো,' বললো রানা। 'সুরিনাম থেকে পাসপোর্ট সংগ্রহ করা, ধরে নেয়া যায় কঠিন হয়নি।'

'সম্ভব। পরিচয় গোপন করা দরকার, সাথে টাকা থাকলে অসুবিধে কি!'

'তাহলে তিনি নিজের যে পরিচয় দিচ্ছেন সেটা সত্যি নয়,' বললো রানা। 'যথেষ্ট টাকা নিয়ে পৌঁছুলেন, ভদ্র কৃষক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করলেন নিজেকে, ভাগ্যগুণে তাঁর আখ থেকে বেরিয়ে আসা রস গোটা কলম্বিয়ায় বাজার পেয়ে গেল। নিঃসঙ্গ জীবন বেছে নিলেন, নিজের পরিচয় দিলেন রলফ মুয়েলার বলে। আমি যেন একটা ফেরারী আসামীর আদল দেখতে পাচ্ছি।'

কিন্তু রানার সিদ্ধান্ত মেনে নিতে এখুনি প্রস্তুত নন আলিজান আকরাম। 'অচেনা একটা দেশে এসে সেখানকার কালচারকে গ্রহণ করতে না পারাটা নতুন কিছু নয়। তাঁর কথায় জার্মান টান, এটারও অনেক কারণ থাকতে পারে। আসলেই তিনি হয়তো একজন ডাচম্যান, জন্মেছেন জার্মেনীতে। এমনও হতে পারে যে জার্মানভাষী কোনো পরিবারে মানুষ হয়েছেন। মুয়েলার এমন একটা সাধারণ নাম যা নানাভাবেই সীমান্ত পেরোতে পারে। ইংরেজিতে ওটা মিলার, জানো তো।'

'আর জার্মেনীতে—মুলার।'

চেহারায় কৌতূহল নিয়ে রানার দিকে তাকালেন বৃদ্ধ, যেন সাড়া দিতে চান, তবে তার আগে খানিক চিন্তা করবেন। শার্টের পকেটে চাপড় দিলেন তিনি, একটা ডানহিল বের করে ধরালেন। 'ব্যাপারটা অদ্ভুত, বুঝলে। মনে পড়ছে এ-বিষয়ে লিলির সাথেও কথা হয়েছে আমার। তুমি যেন ঠিক তার ভাষায় কথা বলছো।'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে রানা বললো, 'হতে পারে আমাদের চিন্তাধারা এক।'

আলিজান আকরামের ঠোঁটের চারপাশে এক মুহূর্ত স্থির হয়ে

থাকলো খানিকটা ধোঁয়া। 'কিংবা হয়তো তোমরা একই ধরনের ট্রেনিং পেয়েছো।'

রানা কিছু বললো না।

'ভুল বুঝো না, মিঃ ওয়ারেন। যা আমার জানার প্রয়োজন নেই তা আমি জানতে চাইছি না। তবে এ-কথা ভুলতে পারি না যে মার্টিন বেকার কলম্বিয়ায় স্থায়ীভাবে বাস করলেও, একটা মার্কিন সংস্থার হয়ে মাঝে-মধ্যে কাজ করতো। পরে জানতে পেরেছি, তার মেয়ে লিলিও সেই একই সংস্থায় নাম লিখিয়েছে। তুমিও সেই একই সংস্থার কর্মী হলে আমি একটুও অবাক হবো না।'

'এখানে আপনার ভুল হচ্ছে,' বললো রানা। 'আমি আমেরিকান কোনো সংস্থার কেউ নই। তবে, লিলির মতো আমিও ইন্টেলিজেন্স সার্ভিসে আছি। লিলি যে সংস্থায় আছে···ছিলো, আমি সেটার বিরুদ্ধে কাজ করছি—অন্য একটা মার্কিন সংস্থার অনুরোধে। ব্যাপারটা বেশ জটিল, তাছাড়া প্রকাশ করার মতোও নয়। আপনাকে শুধু এটুকু বলা যেতে পারে, আপনার একজন ছাত্রের কাছ থেকে বুদ্ধি-পরামর্শ পাচ্ছি আমরা দু'জনেই—আমি ও লিলি।'

'আমার ছাত্র? কার কথা বলছো তুমি?'

'রাহাত খান।'

অবাক হয়ে রানার দিকে তাকিয়ে থাকলেন আলিজান আকরাম। খানিক পর তিনি শুধু বললেন, 'তার সাথে আমার তাহলে কথা বলতে হবে।'

'তিনিও সম্ভবত তাই আশা করছেন।'

আরো খানিক চিন্তা করে বৃদ্ধ জানতে চাইলেন, 'লিলির নিরাপত্তার কথা ভেবে আমার জানতে ইচ্ছে করছে, সে কি পালিয়ে আছে? যদি

থাকে, কার কাছ থেকে ?'

সরাসরি জবাব দেয়া সম্ভব নয় বুঝতে পেরে রানা বললো, 'শুধু এটুকু বলতে পারি, আমার কাছ থেকে নয়।'

'তার সাথে তোমার দেখা হবার সম্ভাবনা আছে ? যদি থাকে, কবে ?'

'আপাততঃ আমি কোনো সম্ভাবনা দেখছি না।'

'হুম।' তারমানে সন্তুষ্ট হতে পারছেন না আলিজান আকরাম।

'ঠিক আছে,' বললো রানা। 'লিলিয়ান তার সংস্থার হয়ে কাজ করতে গিয়ে এমন কিছু তথ্য পেয়ে যায়, সে বুঝতে পারে সংস্থাটা তার নিজ দেশের মারাত্মক ক্ষতি করছে। দেশকে ভালোবাসে সে, কাজেই সংস্থাটির এই হঠকারী আচরণ মেনে নিতে পারে না। মরিয়া হয়ে কলম্বিয়ায়, আপনার কাছে চলে আসে লিলি—নিজের সংস্থার বিরুদ্ধে আরো অকাট্য তথ্য প্রমাণ সংগ্রহের জন্যে। আপনার কাছে আসার পিছনে আরো একটা কারণ ছিলো তার। রলফ মুয়েলারের আসল পরিচয় জানা। যখন তার বিশ্বাস হয় যে লোকটার আসল পরিচয় জানতে পেরেছে, দেরি না করে তার ছেলে ববি মুয়েলারকে বিয়ে করে ফেলে সে, তাকে নিজের সংস্থার সদস্য করে নেয়, তারপর ওই সংস্থার কিছু বিপথগামী অফিসারের ষড়যন্ত্র প্রকাশ করার জন্যে তাকে একটা অপারেশনে ব্যবহার করে,' থামলো রানা, ভাবলো প্রয়োজনের চেয়ে বেশি কিছু বলা হয়ে গেল কিনা।

আধ খাওয়া সিগারেটটা অ্যাশট্রেতে গুঁজে দিলেন আলিজান আকরাম। 'রলফ মুয়েলার সম্পর্কে কৌতূহল প্রকাশ করা কি আমার জন্যে নিষেধ ?'

'বিপজ্জনক হতে পারে,' বললো রানা।

'বিপদ,' বললেন বৃদ্ধ। 'এই বয়সে। মিঃ ওয়ারেন, তুমি কি জানো না, যুদ্ধের সময় কি ভয়ংকর অভিজ্ঞতার ভেতর টিকে থাকতে হয়েছে আমাকে? আমার তো যুদ্ধের সময়ই মরে যাওয়ার কথা ছিলো। বেঁচে আছি ধার করা সময় নিয়ে।'

'সময়টা আপনি কার কাছে ধার করেছেন, মনে করুন তো,' শান্ত সুরে আহ্বান জানালো রানা।

দাড়িতে হাত বোলালেন আলিজান আকরাম। 'ঠিক কি বলতে চাইছো বুঝতে পারছি না।'

'শুনুন তাহলে,' বললো রানা। 'আমাদের ধারণা, রলফ মুয়েলার আসলে একজন নাৎসী ফেরারী। তাঁর আসল নাম হেনেরিক মুলার। জার্মান গেস্টাপোর প্রধান ছিলেন তিনি।'

তিন

'হেনেরিক,' বললেন আলিজান আকরাম, জানালা দিয়ে তাকিয়ে আছেন ফুলফোটা বাগানে। 'তার প্রথম নামটা জার্মেনীতে খুব কম লোকই জানতো। গেস্টাপো মুলার হিসেবেই তাকে চিনতো সবাই। দুনিয়ার আর কোনো ব্যক্তির নাম তার প্রতিষ্ঠানের সমার্থক হয়ে উঠতে

পারেছে কিনা আমার জানা নেই।'

'পণ্ডিতদের সংস্পর্শে থাকার সৌভাগ্য হয়েছে তাঁর,' বললো রানা। 'প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর তাঁকে রাশিয়ায় পাঠানো হয় সোভিয়েত সিক্রেট পুলিশের সাথে কাজ করার জন্যে। আপনি তো জানেনই, বিশের দশকে জার্মান আর রাশিয়ানদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা ছিলো। নিষেধাজ্ঞা থাকায় জার্মেনী তার নিজের সেনাবাহিনী গড়ে তুলতে পারেনি, তাই গোপনে তারা প্লেন, যুদ্ধজাহাজ, পয়জন গ্যাস ইত্যাদি তৈরি করার জন্যে রাশিয়ানদের সাথে যোগাযোগ করে। বিনিময়ে জার্মেনী টাকা আর অফিসার পাঠাতো রাশিয়ায়। বলা হতো, অফিসাররা শিক্ষাদান করতে গেছে, কিন্তু কিছু লোক, যেমন মুলার, গিয়েছিল শিখতে।'

'অথচ জার্মেনীতে কমিউনিস্টদের বারোটা বাজিয়ে দেয় লোকটা,' বললেন আলিজান আকরাম।

'পরিস্থিতির সাথে নিজেকে খাপ খাওয়ানোয় তাঁর জুড়ি নেই,' বললো রানা। 'কমিউনিস্টদের সাংগঠনিক বৈশিষ্ট্য, যোগাযোগ আর ইন্টেলিজেন্স সম্পর্কে যে ব্যক্তি সব জানেন, তাঁর পক্ষেই তো তাদেরকে ধ্বংস করা সবচেয়ে সহজ।'

'চরম সুযোগ সন্ধানী,' বললেন বৃদ্ধ। 'আ সারভাইভার।'

তাঁর সাথে সম্পূর্ণ একমত হলো রানা। হেনেরিক মুলার বেঁচে আছেন, আছেন এই কলম্বিয়াতেই, শোনার পর রাগ নয়, কৌতুহল প্রকাশ করলেন আলিজান আকরাম। তথ্যগুলো কোত্থেকে পেয়েছে রানা?

আসলে মুলারের বেঁচে থাকার গল্পটা বিশ্বাস করতে পারছেন না বৃদ্ধ। নাৎসী ফেরারীদের সম্পর্কে হাজারো সস্তা গল্প শোনা যায়

দক্ষিণ আমেরিকায়। তবে, মার্টিন বেকার আর তাঁর মেয়ে লিলিয়ান বেকারের প্রতি আস্থা আছে ভদ্রলোকের।

মার্টিন বেকার একজন ইন্টেলিজেন্স অফিসার ছিলেন, বার্লিন থেকে মুলার পালিয়েছেন এই খবরটা প্রথম তাঁর কাছেই পৌঁছায়। যুদ্ধের পর অন্য এক চেহারা নিয়ে মুলার আর্জেন্টিনায় এসেছেন, এ-ধরনের একটা রিপোর্ট এফ. বি. আই.-ও তৈরি করেছিল। সেখান থেকে কলম্বিয়ায় কিভাবে এলেন তিনি, সে-সম্পর্কে কিছুই জানা যায়নি। তবে, আলিজান আকরামকে একটা ফটোর কথা বললো রানা, সম্প্রতি তোলা হয়েছে। সেই ফটোর সাথে জার্মেনীতে তোলা মুলারের ফটো মিলিয়ে দেখা হয়েছে, বিশেষজ্ঞরা বলেছেন দুটো ফটো একই লোকের হতে পারে, না-ও হতে পারে। কেউ যদি তার চেহারা সার্জিক্যাল অপারেশনের সাহায্যে বদলাতে চায়, চেহারার সবটুকু বদলানো তার পক্ষে সম্ভব নয়। যে-অংশগুলো বদলানো সম্ভব নয়, দুটো ফটোতে সেগুলো একইরকম লেগেছে।

'আমার ধারণা,' বললো রানা, 'রলফ মুয়েলারই হেনেরিক মুলার। লিলিরও তাই ধারণা। তবে, তথ্য-প্রমাণ অকাট্য নয়। তাঁর বিরুদ্ধে লাগার আগে আমাকে নিশ্চিত হতে হবে।'

'সম্ভাব্য সবরকম সাহায্য তুমি আমার কাছ থেকে পাবে,' কথা দিলেন আলিজান আকরাম, তবে শর্তহীন নয়। 'কিন্তু আমাকে জানতে হবে, তুমি একজন বিদেশী হয়ে মার্কিন একটা সংস্থাকে সাহায্য করছো কেন? তুমি বললে, অন্য একটা মার্কিন সংস্থার বিরুদ্ধে কাজ করছো। তাছাড়া, গেস্টাপো মুলারকে ধরার জন্যে তোমার গরজের পেছনে আসল কারণটাই বা কি?'

উত্তর দিতে না চাইলেও, রানা বুঝতে পারলো এখন আর মুখ না

খুলে উপায় নেই। 'ববি মুয়েলারকে আমি খুন করেছি, স্যার। ব্যাপারটা পূর্ব-পরিকল্পিত ছিলো, তা নয়। ববি মুয়েলারের বাবা যদি হেনেরিক মুলার হন, পুত্রহত্যার প্রতিশোধ না নিয়ে ছাড়বেন না তিনি। কাজেই রলফ মুয়েলারকে—মুলারকে—অবশ্যই খুঁজে বের করতে হবে আমার। তাঁকে অকেজো করা না গেলে আমি বা লিলি নিরাপদ নই।' আলিজান আকরামকে কতোটুকু কি বলা যায় ভাবতে গিয়ে অতীতে ফিরে গেল রানা।

সমস্যাটা অকস্মাৎ দেখা দেয়। চোরাপথে হেরোইন আসছিল বাংলাদেশে, কিন্তু কোকেন আসার কোনো খবর ইন্টেলিজেন্স মহলে ছিলো না। তারপর এক মাস আগে হঠাৎ করে কোকেনের তিনটে চালান ধরা পড়লো জিয়া আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে। তদন্ত করতে গিয়ে জানা গেল, গোল্ডেন ট্রায়াঙ্গল আর পাকিস্তান হয়ে বাংলাদেশে হু হু করে ঢুকছে কলম্বিয়ার পরিশোধিত কোকেন।

প্রায় একই সময়ে রবিন নামে এক রুশ এজেন্টের সাহায্য চেয়ে সি. আই. এ. এজেন্ট লিলিয়ানের একটা বার্তা পৌঁছুলো কে. জি. বি. হেডকোয়ার্টার মস্কোয়। কে. জি. বি.-র হয়ে একবার একটা অ্যাসাইনমেন্ট নিয়ে আমেরিকায় গিয়েছিল রানা, তখনই লিলির সাথে ওর পরিচয়। রবিন ওরফে রানাকে ভালোবেসে ফেললেও, ওকে রুশ এজেন্ট মনে করে বিষণ্ণ মনে বিদায় দেয় লিলি।

বিপদে দিশেহারা হয়ে রানার খোঁজে মস্কোর সাথে যোগাযোগ করলেও, কে. জি. বি. কর্তৃপক্ষের কোনো প্রশ্নেরই উত্তর দেয়নি সে। অগত্যা বাধ্য হয়ে রানার আসল পরিচয় ও ঠিকানা লিলিকে জানিয়ে দেয় ওরা। রানা তখন ঢাকায় ছিলো না, লিলিয়ানের সাথে টেলিফোনে কথা বললেন বি. সি. আই. চীফ মেজর জেনারেল (অবসর-

প্রাপ্ত) রাহাত খান।

লিলির মুখ থেকে রাহাত খান জানতে পারলেন, সি. আই. এ. এমন কিছু রাষ্ট্রবিরোধী কাজ করছে যা প্রকাশ পেলে দুনিয়া জুড়ে হৈ-চৈ পড়ে যাবে, নিন্দায় মুখর হয়ে উঠবে আমেরিকাবাসীরা। লিলি তাঁকে আরো জানালো, গেস্টাপো চীফ হেনেরিক মুলার বহাল তবিয়তে কলম্বিয়ায় বেঁচে আছেন। তাঁকে ধরার জন্যে, সেই সাথে সি. আই. এ.-র ষড়যন্ত্র সম্পর্কে আরো প্রমাণ সংগ্রহের জন্যে রানার সাহায্য তার দরকার।

ঢাকা থেকে সব কথা জানানো হলো রানাকে। রানা তখন ওয়াশিংটন ডি. সি.-তে বসে একই সমস্যা নিয়ে আলোচনা করছে যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল সিকিউরিটি এজেন্সির চীফ হুবার্ট লজের সাথে। সি. আই. এ. ও এন. এস. এ.-র মধ্যে দ্বন্দ্ব ও রেষারেষি নতুন নয়, সি. আই. এ.-র কুকীর্তি সম্পর্কে গোপন রিপোর্ট পেয়ে অকাট্য তথ্য-প্রমাণ সংগ্রহের জন্যে কি করা যায় ভাবছিলেন হুবার্ট লজ। রানাকে ডেকে ওর সাহায্য চাইলেন তিনি, কারণ সি. আই. এ.-র পিছনে লাগা আরেকটা মার্কিন ইন্টেলিজেন্সের পক্ষে নানা কারণেই সম্ভব নয়।

পুরোটা নয়, কাহিনীর অংশবিশেষ সংক্ষেপে আলিজান আকরামকে জানালো রানা। তবে স্বীকার করতে হলো, বি. সি. আই.-এর একজন এজেন্ট ও, রাহাত খানের সাক্ষাৎ শিষ্য। তাঁর নির্দেশেই কলম্বিয়ার কোকেন সম্রাটদের বিরুদ্ধে একটা কিছু করার প্রতিজ্ঞা নিয়ে এখানে এসেছে। সেই সাথে রলফ মুয়েলারের ছদ্ম পরিচয় উন্মোচনের দায়িত্বও রয়েছে ওর কাঁধে। লিলিয়ানের সাথে কোথায়, কিভাবে ওর পরিচয় হয়েছিল সে-প্রসঙ্গটা এড়িয়ে গেল *। এড়িয়ে গেল ববি মুয়েলারের

* শান্তিদূত, ১/২ দ্রষ্টব্য।

খুন হওয়ার ঘটনাটা। এই মুহূর্তে লিলি কোথায় আছে তাও বললো না।

'আমি কি তাহলে ধরে নেবো, তুমি মার্কিন সরকারের আনুষ্ঠানিক অনুমতি ছাড়াই অ্যাসাইনমেন্টটায় কাজ করছো?' জানতে চাইলেন আলিজান আকরাম।

এন. এস. এ.-র চীফ হুবার্ট লজ বলেছেন, তাঁর ব্যক্তিগত অনুরোধে কাজটা করে দেবে রানা, অফিশিয়াল কোনো ব্যাপার নয়। রানা বিপদে বা ধরা পড়লে, এন. এস. এ. ওর সাথে সম্পর্কের কথা সম্পূর্ণ অস্বীকার করবে। 'জ্বী,' সংক্ষেপে বললো রানা।

'এটা তাহলে, আমাকে বুঝতে হবে, বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স-এর একটা কাজ।'

মাথা ঝাঁকালো রানা। 'জ্বী।'

'তবে, লিলিকে তুমি সাহায্য করছো।'

মাথা ঝাঁকালো রানা।

'ভেরি গুড,' বললেন আলিজান আকরাম। 'কি দরকার তোমার? বলে ফেলো, আমার কাছে কি চাও তুমি। তবে সাবধানে চাইবে, কারণ যা চাইবে তাই পাবে তুমি।'

ওর চাহিদার একটা তালিকা পেশ করলো রানা। মুলার সম্পর্কে নিরেট তথ্য পাবার আশা নিয়ে এসেছে ও, ওর আশা পূরণ না হলেও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে যা জানতে পেরেছে তার গুরুত্ব কম নয়; বড় কথা হলো আরো ব্যাপক সাহায্য পাবার প্রতিশ্রুতি নিয়ে ফিরে যাচ্ছে ও। যোগাযোগ ও জরুরী মেডিকেল সহায়তা পাবার ব্যাপারে আলিজান আকরামের ওপর ভরসা করা যায়, মুলারের অতীত ও বর্তমান নিয়ে ওর গবেষণাতে আরো অবদান রাখতে পারবেন তিনি।

এমন একটা অবস্থানে রয়েছেন ভদ্রলোক, রানার চাহিদা পূরণ করা তাঁর জন্যে কঠিন হবে না। তিনি শুধু মার্টিন বেকারের সাবেক বন্ধুই নন, বা তাঁর একমাত্র পরিচয় এটা নয় যে তিনি কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটির অবসরপ্রাপ্ত প্রফেসর, সেই সাথে বিরাট একটা ইলেকট্রনিক কোম্পানীর মালিকও বটেন, বিভিন্ন সরকারী ডিপার্টমেন্টের উপদেষ্টা ছিলেন, সেগুলোর মধ্যে ডি. এ. এস.-ও ছিলো—জাতীয় পুলিশ বিভাগের সমমান সম্পন্ন একটা সংস্থা।

মনে মনে একটা আশংকা ছিলো রানার, সেটা অমূলক প্রমাণিত হয়েছে। ইহুদি ধর্মের নিন্দা বা ইসলাম ধর্মের প্রশংসা, কোনোটাই করেননি আলিজান আকরাম। সেজন্যে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা বোধ করলো ও। তাঁকে যে বিশ্বাস করা যায়, এ-ব্যাপারেও ওর মনে কোনো সন্দেহ নেই। হেনেরিক মুলার বা নাৎসী অফিসাররা যে অপরাধী, তাদের যে বিচার হওয়া দরকার, এ-ব্যাপারে তিনি দ্বিমত পোষণ করেন না।

হেনেরিক মুলার অপরাধী, এটা ছাড়াও অন্য একটা কারণে তাঁকে ধরার ব্যাপারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ রানা। কারণটার সাথে স্বদেশের স্বার্থ জড়িত। ন্যাশনাল সিকিউরিটি এজেন্সির হুবার্ট লজ কথা দিয়েছেন, হেনেরিক মুলারকে রানা ধরে দিতে পারলে বাংলাদেশে কলম্বিয়ার কোকেন চালান দেয়ার পথগুলো বন্ধ করার জন্যে সম্ভাব্য সব সাহায্য করবেন তিনি। কলম্বিয়ায় এন. এস. এ.-র তেমন কোনো ভূমিকা নেই, মার্কিন সরকারের যে বাহুটি এখানে খানিকটা সচল তার নাম ডি. ই. এ. ---ড্রাগ এনফোর্সমেন্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন—হুবার্ট লজ তাগাদা দিলে পথগুলো বন্ধ করার কার্যকরী ব্যবস্থা হতে পারে। এ-ব্যাপারে বন্ধু টমাস কালভিনের সাথেও কথা হয়েছে রানার। কালভিন ডি. ই. এ.-র একজন এজেন্ট।

হুবার্ট লজ ওকে জানিয়েছেন, শেষ পর্যায়ে তাঁর সংস্থা ওকে সাহায্য করবে, যদি দরকার হয়। হেনেরিক মুলারকে আটক করে খবর পাঠালে দু'ঘণ্টার মধ্যে রানার নির্দেশিত জায়গায় একটা হেলিকপ্টার সহ পাঁচ-জন সশস্ত্র লোক পৌঁছে যাবে।

সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে কালভিনও। যুক্তরাষ্ট্রে গোছানো একটা ফিল্ড কিট ডিপ্লোম্যাটিক কুরিয়ার হয়ে কলম্বিয়ায় পৌঁছে যাবে।

আলিজান আকরামের বাড়ি থেকে বেরিয়ে পিটার পিনেলকে নির্দেশ দিলো রানা, 'ক্যারেরা বাহান্নতে চলো, তোমাদের চিড়িয়াখানাটা দেখে আসি।'

বৈচিত্র্য ও সংখ্যার দিক থেকে দক্ষিণ আমেরিকার প্রাণীকুল নগণ্য নয়। সান্তা ফে চিড়িয়াখানায় উপমহাদেশের প্রায় সব প্রাণীরই ঠাঁই মিলেছে, এমন কি প্রায় অবলুপ্ত কিছু নমুনাও চোখে পড়লো। শুনে রোমাঞ্চিত হলো রানা, একটা পাহাড়ের পাথুরে ঢালে, ছোট্ট এক পেন-এ, স্থানীয় খয়েরি ভালুকের গোটা একটা পরিবার বাস করে। খাঁচাগুলোর সামনে নোটিশ টাঙানো আছে, প্রাণীদের খাবার দেয়া বা আদর করা নিষেধ, ওগুলোর পিছনে খোস-পাঁচড়ার দাগগুলোকে মারাত্মক রোগ মনে করার কোনো কারণ নেই।

ঘুরে ফিরে দেখছে রানা, বড় একটা ব্যাগ হাতে ওর পিছু নিলো এক মার্কিন যুবক। রানার সমান লম্বা সে, তবে একটু বেশি রোগা, পরনের বিজনেস স্যুটটা বেশ দামী, তবে স্থানীয় দোকান থেকে কেনা। স্প্যানিশ ভাষায় রানার সাথে আলাপ জমাবার চেষ্টা করলো সে। ভাষাটার ওপর তার তেমন দখল নেই, অন্তত রানার চেয়ে ভালো নয়।

'ইংরেজি বলো,' বললো রানা, পরিচিতিমূলক সংকেত বিনিময়ের পর। 'তা না হলে লোকের নজর কাড়া হবে।'

বয়স হবে পঁচিশ, রানার কথায় রীতিমতো অপমান বোধ করলো লোকটা। 'এই কেয়ার প্যাকেটটা নিয়ে এখানে আমাকে আসতে বলা হয়েছে,' ঝাঁঝের সাথে বললো সে। 'আমার ওপর আর কোনো নির্দেশ নেই।'

কেয়ার শব্দটা উচ্চারণ করায় লোকটার ওপর অসন্তুষ্ট হলো রানা, ভাবটা যেন ব্যাগের ভেতর কি আছে সে জানে। আরো একটা জিনিস খারাপ লাগলো ওর, সে তার নাম বলেনি। এমনকি একটা ছদ্মনামও তো থাকবে। 'কি বলে ডাকা হয় তোমাকে, বাছা?'

'জ্যাক—জ্যাক মরিস। আর প্রমাণ করতে না পারলে দয়া করে আমাকে বাছা বলবেন না, আমি আপনার সন্তান নই।'

'শোনো, মরিস, তোমাকে কি নির্দেশ দেয়া হয়েছে সেটা আমি জানতে চাই না। আমার দরকার কিছু তথ্য। এয়ারপোর্ট থেকে বেরোতেই আমার পিছু নিলো একটা হোণ্ডা। ওরা কি ড্রাগ এনফোর্সমেণ্ট এজেন্সির লোক?'

ছোটো হলেও, শব্দ করে হাসলো জ্যাক মরিস, কিন্তু রানার কানে কৃত্রিম লাগলো। শুধু হাসিটা নয়, মাথার চুলে তার হাত বোলানোর ভঙ্গিটাতেও নার্ভাস একটা ভাব রয়েছে। 'আরে সাহেব, আপনি জানেন না এখানে কি ঘটছে? ড্রাগ ব্যবসায়ীদের বিচার করার জন্যে যুক্তরাষ্ট্রে নিয়ে যাওয়া হবে, কলম্বিয়া সরকারকে এই প্রস্তাব দেয়ার পর থেকে আক্ষরিক অর্থেই আমাদেরকে অবরোধ করে রাখা হয়েছে। বুঝতে পারছেন না, যুদ্ধক্ষেত্রে রয়েছি আমরা? মার খাচ্ছি সংখ্যাতে, ওদের এক হাজার লোককে ঠেকাতে আমরা একজনের বেশি লোক

দিতে পারছি না। বোগোটায় কি হচ্ছে শুনেছেন? দূতাবাসের লোকেরা অফিসে আসা-যাওয়া করছে আর্মারড্ কনভয় নিয়ে। আমেরিকানদের পোষ্যরা সবাই দেশে ফিরে গেছে, কিংবা ফিরে যাবার পথে রয়েছে। আরো শুনতে চান? খোদ অ্যামব্যাসাডর গত বছর ক্রিস্টমাসের ছুটিতে দেশে গিয়ে আর ফিরে আসেননি। তিনি এখানে নেই, তাঁর দেশের সবচেয়ে বুদ্ধিমান ব্যক্তি বলে মনে করা হচ্ছে তাঁকে। মেডিলিনে ডি. ই. এ.-র এখন আর কোনো অফিস পর্যন্ত নেই, কারণ পরিচয় প্রকাশ করাটা ভয়ানক বিপজ্জনক। আপনাকে অনুসরণ করা আমাদের জন্যে বিলাসিতা, বুঝলেন? এখানে আসার পথে সম্ভাব্য ফেউ খসাবার জন্যে দেড়টি ঘণ্টা ব্যয় করেছি আমি।'

ড্রাগ এনফোর্সমেণ্ট এজেন্সির শক্তি কমে গেছে, সেজন্যে উদ্বিগ্ন নয় রানা, অস্বস্তিবোধ করলো বিনা চ্যালেঞ্জে একদল ড্রাগ ব্যবসায়ী গোটা একটা দেশকে আতংকিত করে রেখেছে বুঝতে পেরে। 'লোকগুলোকে ধরে জেলে ভরা হচ্ছে না কেন?'

হঠাৎ বিহ্বল দেখালো মরিসকে, ধারণাটা যেন আনকোরা নতুন বা বৈপ্লবিক। বেবি-সিটারে বাচ্চাকে নিয়ে এক মহিলা এগিয়ে আসছে দেখে জবাব দিতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিলো মরিস, রানা বুঝলো তার প্রতিক্রিয়ার অর্থ করতে ভুল হয়েছে ওর। লোকটা সতর্ক থাকতে চাইছে। শুধু সতর্ক নয়, সন্ত্রস্ত বলেও মনে হলো তাকে। ভালুকগুলোর দিকে পিছন ফিরে হাঁটতে শুরু করলো সে, তার পিছু নিলো রানা।

'কলম্বিয়ার একজন বিচারক আমাকে একবার কি বলেছিলেন জানেন?' চাপাস্বরে, নিঃশ্বাসের সাথে বললো মরিস। 'ওরা টাকা সাধলে সেটা তোমাকে নিতে হবে, তা না হলে মরতে হবে।

কাউকে যদি জেলে পাঠাও, টাকা দিয়ে ঠিকই বেরিয়ে আসবে সে। হোসে ম্যাটা বালেসটেরোসকে বোগোটায় জেলে ভরলো সরকার। ঠিক হলো, বিচারের জন্যে তাকে যুক্তরাষ্ট্রে পাঠানো হবে। এরপর কি ঘটলো? প্রথমে ওরা খুন করলো লা পিকোটা জেলের প্রিজন ওয়ার্ডেনকে, কারণ ঘুষ খেতে রাজি হননি তিনি। মোটরসাইকেলে চড়ে একদল আততায়ী এসে কাজটা করে গেল। যাবার আগে কারারক্ষীদের মধ্যে বিলি করলো টাকা—এখানে আমরা মিলিয়ন মিলিয়ন টাকার কথা বলছি—তালা দেয়া সাতটা গেট খুলে গেল, হাঁটতে হাঁটতে রাস্তায় বেরিয়ে এলো হোসে। গত মার্চের ঘটনা।'

প্রভাবিত হলো রানা। কলম্বিয়ার অপরাধীরা ক্ষমতা রাখে। তবে ক্ষমতাধরদের ঘায়েল করার মতো শক্তিও সব সময় থাকে। 'পাল্টা ওদেরকে খুন করার কোনো চেষ্টা সরকারের তরফ থেকে হয়নি?'

'অতো সহজ ভাববেন না,' বললো মরিস। 'আপনি উদ্যোগ নিলে নিজের মরণ ডেকে আনবেন। একশো ডলার ভাড়ায় খুনি পাওয়া যায় মেডিলিনে। চাইলে আপনাকে রসিদও দেয়া হবে। কাজ না হলে টাকা ফেরত পাবেন। ব্যর্থ হলে, আবার চেষ্টা করবে ওরা, যতোক্ষণ আলোচ্য ব্যক্তি খুন না হয়। আপনার যদি টাকার অভাব না হয়, আপনার শত্রুর তালিকা যতো লম্বাই হোক, সব ক'টাকে পরপারে পাঠাতে পারবেন।'

'এতোই সস্তা এখানে মানুষের জীবন?'

আড়ষ্ট, ব্যঙ্গাত্মক হাসি দেখা গেল মরিসের ঠোঁটে। 'কলম্বিয়ানদের কাগজের কাপ বলে ওরা। একবার ব্যবহার করে ফেলে দাও।'

'গলদটা তাহলে এখানেই,' বললো রানা, আরো ভীতিকর দুর্নীতি

ও সন্ত্রাস প্রত্যক্ষ করার অভিজ্ঞতা আছে ওর। 'সাধারণ মানুষ যথেষ্ট সচেতন নয়। তারা রুখে দাঁড়ালে পরিস্থিতি এতোটা খারাপ হতে পারতো না।'

'আপনার উপদেশ একটা কাগজে লিখে ফেলুন, তারপর সেটা ছুঁড়ে দিন সরকারের নাক লক্ষ্য করে। আপনার মতো উপদেষ্টা দরকার ওদের।'

কেন যেন হাসি পেলো রানার, বয়স বেশি না হলেও মানব চরিত্র সম্পর্কে সবজান্তা একটা ভাব নিয়ে দিব্যি সুখে আছে ছোকরা। এই মুহূর্তে ওরা যদি সাপের ঘরে উপস্থিত না থাকতো, তাহলে হয়তো তার জীবনের গুরুত্বপূর্ণ একটা দিক সম্পর্কে জানার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হতো রানা। চারদিকে কাঁচের বাক্স। ভেতরে সাপ। সাপগুলোকে দেখে মরিসের চোখ উত্তেজনায় চকচক করে উঠলো। একটা বাক্সের সামনে থামলো সে, লেবেল দেখে জানা গেল ভেতরের সাপগুলো বুশমাস্টার।

'দেখুন-দেখুন,' একটা সাপের দিকে হাত তুলে, মুগ্ধ-বিস্ময় গোপন না করেই বললো মরিস। 'দশ থেকে বারো ফুট লম্বা হতে পারে ওগুলো। বিষটা তো মারাত্মকই, যতো বড় হবে আকারে ততোই বিপজ্জনক হবে কামড়গুলো। ভীতিকর ব্যাপারটা কি জানেন? ওগুলো আপনাকে ধাওয়া করবে।'

রানার মনে হলো, তার কথা বা ভাবের মধ্যে না থাকলেও অন্য কি যেন একটা বলতে চাইছে সে। মেসেজটা যা-ই হোক, সেটা দেয়ার জন্যে অস্থির, ব্যাকুল হয়ে আছে। 'ফিল্ডে খুব বেশি দিন ধরে রয়েছো তুমি, মরিস,' শান্ত গলায় মন্তব্য করলো ও।

'আছি এক বছর হলো,' বললো মরিস। 'আমার বয়স সাতাশ, পা

দিতে যাচ্ছি অষ্টাশিতে। তবে নিজেকে সান্ত্বনা দিই এই বলে যে কপালটা আরো খারাপ হতে পারতো। আমাকে বোগোটায় পাঠানো হলে কি করার ছিলো? ওখানে চব্বিশ ঘণ্টা বৃষ্টি হয়।'

'আমার কথা তুমি ঠিক বুঝতে পারোনি, মরিস। আমি বলতে চাইছি, এই পেশা ছেড়ে দেয়া উচিত তোমার। যারা ভালোবাসে শুধু তাদেরকেই মানায় এটা। অল্প কিছু লোক ভালোবাসে এটাকে, সাধারণত তারা এক ধরনের পাগলাটে স্বভাবের হয়।'

দ্রুত, কণ্ঠে বিদ্রূপ নিয়ে জবাব দিলো মরিস, 'কথাটা বলায় আপনার প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। আজ রাতে বিছানায় উঠে ওটা নিয়েই ভাববো। আমাদের কাজ শেষ হয়েছে?'

'হবে, যদি বলো ববি মুয়েলার সম্পর্কে কি জানো তুমি।'

নিরেট তথ্য দেয়ার অনুরোধ পেয়ে বিস্মিত ও শান্ত হলো মরিস। 'মুয়েলার,' বললো সে। 'শুধু নাম শুনে চিনবো বলে মনে হয় না।'

কথা বলার ফাঁকে ব্যাগটার কমবিনেশন লক খুলে ফেলেছে রানা, ভেতরের একটা পাউচ থেকে ববি মুয়েলারের একটা ফটো বের করলো ও। মরিসের হাতে ধরিয়ে দিলো সেটা। 'টাকা, লেনদেন, এ-সব ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ ছিলো লোকটা,' বললো ও। 'অস্ত্র চোরাচালানের সাথেও জড়িত ছিলো। আমার সন্দেহ, ড্রাগ ব্যবসাও বাদ দেয়নি। ঠিক জানা নেই।'

ফটোটার দিকে খুব একটা মন দিয়ে তাকালো না মরিস। খানিক পর নাক দিয়ে ঘোঁৎ করে একটা আওয়াজ ছাড়লো। 'আমার যদি ভুল না হয়, ফটোটায় যে মুয়েলারকে আমি দেখছি, তার তলপেটে আর বুকে তিনটে বুলেট ঢুকেছিল। আমি বলবো, নিদেনপক্ষে নাইন মিলিমিটার।'

রানা কিছু বললো না।

'আপনি তাকে খুন করেছেন?'

এবারও চুপ করে থাকলো রানা।

'মনে হচ্ছে আপনি তাকে খুন করেছেন।'

'আমাকে তোমার কতোটুকু জানাবার আছে, মরিস?'

'একটুও না,' বললো মরিস। 'এই লাশ আমি চিনি না। কেন আপনার মনে হলো লোকটা ড্রাগ ব্যবসা করতো?'

'সত্তর দশকে ববি মুয়েলার নিকারাগুয়েতে বাস করতো,' বললো রানা। 'আইলাজ দ্য মেইজ-এ একটা জায়গা ছিলো তার, সন্দেহ হওয়ায় পুলিশ হানা দেয় সেখানে, বাড়িটায় একটা কোকেন-প্রসেসিং ল্যাব পাওয়া যায়। কিন্তু লাভ হয়নি কিছু, ড্রাগের সাথে তাকে জড়ানো যায়নি।'

'তাহলে?'

'ববি মুয়েলারের ফাইলটা টমাস কালভিনকে আমি দেখাই, ওয়াশিংটনে। সে কিছু মন্তব্য করে। মুয়েলারদের পারিবারিক ডিসটিলারিটা ড্রাগ কনভারশন-এ লাগে এমন ধরনের কেমিক্যাল কেনার জন্যে ভালো একটা কাভার হতে পারে। ওরা একটা পরিবহণ সংস্থারও মালিক, সেটার সাহায্যে কলম্বিয়ার ভেতর ড্রাগ সাপ্লাই দেয়া সম্ভব। তবে সবচেয়ে যেটা বিচলিত করে কালভিনকে, তা হলো, ববির বাবার বিয়েটা। রলফ মুয়েলার বিয়ে করেন ডেল নামে এক মেয়েকে। তার একটা বোন আছে। সেই বোন বিয়ে করে সাঁতেলা লজেন নামে আরেক লোককে। ওদের ভিক্টর নামে এক ছেলে আছে। তাকে তুমি চেনো?'

সাপের ঘরে ঢোকার পর এই প্রথম বুশমাস্টারের ওপর আগ্রহ

হারিয়ে ফেললো মরিস। 'আপনি তো সাহেব আশ্চর্য মানুষ। যখন কোনো নাম উচ্চারণ করেন, চুনোপুঁটিরা বাদ যায়। সব রুই-কাতলা। ভিক্টর লজেন আরো বড়—বোয়াল।'

'এমন কিছু বলো যা আমি জানি না।'

'এটা দেখুন,' চেহারায় আক্রমণাত্মক ভাব নিয়ে মরিস বললো। 'মাস পনেরো আগে কিছু তরুণ ফুলবাবু, ড্রাগ ব্যবসার সাথেই জড়িত, ভিক্টর লজেনের বুড়ো বাপ সাঁতেলাকে কিডন্যাপ করে। ওরা তাকে আটকে রাখে বিশ লক্ষ ডলার মুক্তিপণ পাবার আশায়। কিন্তু ভিক্টর তল্লাশী চালাবার জন্যে তার সৈনিকদের মাঠে নামাচ্ছে দেখে সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে তারা। আমাদের হিসেবে, অল্প কয়েক ঘণ্টার নোটিসে এলাকার রাস্তাগুলোয় তিন হাজারের মতো সশস্ত্র লোক নেমে আসে। সঠিক কেউ জানে না। সংখ্যাটা পাঁচ হাজারও হতে পারে। ভিক্টর এক ঝাঁক হেলিকপ্টারও পাঠিয়েছিল। আর পাহাড়ে বড় একটা দল নিয়ে ক্যাম্প ফেলে সে নিজে, যে-কোনো আধুনিক সেনাবাহিনীর মতো রণ-প্রস্তুতি নিতে দেখা গেছে তাদের।'

'সে কি তার বাবাকে ফেরত পেয়েছিল?'

'পায়নি মানে!' চোখ বড় বড় করলো মরিস। 'বুড়োর গায়ে আঁচড়-টিও লাগেনি। এতো সব আয়োজন কার জন্যে শুনবেন? সম্পূর্ণ বাতিল এক লোকের জন্যে। প্রায় দশ বছর আগে স্ট্রোক হয়েছিল সাঁতেলা লজেনের। সেই থেকে বিছানায় কাত হয়ে আছে। সম্ভবত তরল খাবার খায়—মুখ দিয়ে খায়, নাকি নাকে ঢেলে দিতে হয় জানি না। তবে, ভিক্টর ভারি আবেগপ্রবণ। ব্যবসার কলা-কৌশল বাপই তো তাকে শিখিয়েছে—যেমন, চোখে দেখা যায় না এমন বুলেট দিয়ে কিভাবে মানুষকে খুন করতে হয়। কি নাম বুলেটটার? সন্ত্রাস, ওরফে

আতংক। সিলেকটিভ মার্ডার।'

'বাপকে ফিরে পেলো, তারপর?' জানতে চাইলো রানা। 'ভিক্টর লজেন প্রতিশোধ নেয়নি?'

'নিজের পত্রিকায় বিশেষ সংখ্যা বের করলো ভিক্টর লজেন,' বললো মরিস। 'তাতে কিছু লোকের তালিকা ছাপা হলো, লোকগুলো চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে কলম্বিয়া ছেড়ে চলে যাবে। হয় চলে যাবে, নয়তো মারা পড়বে। সে এমনকি তার নিজের রেডিও স্টেশন থেকেও ঘোষণাটা প্রচার করে।'

'লোকগুলো কি করলো? নিশ্চয়ই পুলিশে খবর দিলো?'

'একজনও না। বেশিরভাগ কলম্বিয়া ছেড়ে পালালো। বাকি লোক-গুলো এখন কোথায় আপনি আন্দাজ করে নিন।'

'হুম।'

চেহারায় নগ্ন চ্যালেঞ্জ নিয়ে রানার দিকে তাকালো মরিস। 'তার ক'টা বাড়ি আর অ্যাপার্টমেন্ট আছে শুনবেন? জানতে চান, কতো একর জমির মালিক সে? আপনি তার এয়ারলাইন্সের প্লেনে চড়ে বেড়াতে চান? যোগ দিতে চান তার রাজনৈতিক দলে? তার ফুটবল ক্লাবের সদস্য হবেন? কি চান আপনি?'

'আমি তার ব্যক্তিগত বিষয়গুলো জানতে চাই,' বললো রানা। 'মানুষটা সম্পর্কে।'

অনুরোধটা যেন পছন্দ হলো মরিসের। আজ এই প্রথম নির্ভেজাল হাসলো সে, সম্ভবত চলতি হপ্তায় এই একবারই। 'ভালো কথা বলে-ছেন। সত্যি কথা বলতে কি, ভিক্টরের ব্যক্তিত্ব আছে। কার্টেল-এর অন্য সব মহারথীরা—এসকোবার, হোসে গাচা, ওকোয়াস—স্রেফ মাফিয়া গড ফাদারদের সাথে বদলে নেয়া যায়। ভালো পরিবার থেকে

এসেছে সবাই। স্ত্রী, বাচ্চাকাচ্চা আছে। মর্যাদা রক্ষা করে চলাফেরা করে। নিজেদের তৈরি ড্রাগ ছুঁয়েও দেখে না। ব্যবসার স্বার্থে না হলে খুনখারাবির মধ্যে নেই।

'কিন্তু ভিক্টর লজেন অন্য জিনিস। তাকে রক-অ্যাণ্ড-রোলার বলা হয়। কড়া ডোজ চাই তার, মাঝে মধ্যে মাসের পর মাস নেশায় বুঁদ হয়ে থাকে। মেয়েমানুষ তার বিশেষ প্রিয়, একসাথে পাঁচ-সাতটা না হলে মন ভরে না। শোনা যায় পুরুষমানুষেও নাকি তার অরুচি নেই। হয়তো গুজব, কিন্তু সূত্রটা নির্ভরযোগ্য, সে নাকি সাপের সাথেও সহবাস করে। স্রেফ হাস্যকৌতুকের জন্যে অনেক কাজ করে সে, তার মধ্যে একটা হলো পোষা জাগুয়ারকে জ্যান্ত ঘোড়া খেতে দেয়া। মার্কিন-বিরোধী একজন ফ্যাসিস্ট হিসেবে সিনেট নির্বাচনে দাঁড়াতে চায় সে, কিন্তু পারছে না রোনাল্ড রিগ্যানের সাথে বনিবনা হচ্ছে না বলে।' বিরতি নিলো মরিস, তারপর বললো, 'ও, হ্যাঁ, আরেকটা ব্যাপার।'

'কি ব্যাপার?'

'দুধসাদা একটা ঘোড়ায় চড়ে সে।'

চার

মরিসকে চিড়িয়াখানায় রেখে গাড়িতে ফিরে এলো রানা। পিনেলকে বললো, 'শহরের মাঝখানে নয়, ট্যুরিস্টরা যেদিকে যেতে চায় না, এমন কোথাও একটা রেস্তোরাঁয় বসতে চাই।' যাবার পথে ব্যাগের জিনিসগুলো পরীক্ষা করলো ও। দু'প্রস্থ নাইলন রশি, মিনিয়েচার ট্র্যান্সমিটার, ছুরি অ্যামপুল ও সিরিঞ্জ, নাইট স্কোপ, তালা খোলার সরঞ্জামসহ আরো দু'চারটে দরকারী জিনিস।

ব্যাগে একটা এস. আই. জি. ২১০ সিঙ্গেল অ্যাকশন পিস্তলও রয়েছে। মরিসের অনুমান নির্ভুল দেখে অস্বস্তিবোধ করেছে রানা। তবে ববি মুয়েলার যে পিস্তলের গুলিতে খুন হয়েছে, সিগটাকে সেই একই অস্ত্র বলা যাবে না। ওটার রাইফ্লিং কাউন্টার ক্লক-ওয়াইজ করে নিয়েছে রানা, তাতে সিঙ্গেল-শটের বেলায় লক্ষ্যভেদে কোনো অসুবিধে হবে না, লাভ হবে র‍্যাপিড ফায়ারের সময়—কাঁধের ওপর দিয়ে ছিটকে বেরিয়ে যেতে না চেয়ে অস্ত্রটা ওর শরীরে ধাক্কা দেবে। সামান্য এইটুকু পার্থক্য জীবন আর মৃত্যুর মাঝখানে সীমারেখা টেনে দিতে পারে। মরিসের কথাবার্তা থেকে বোঝা গেছে, এই পরিবর্তনের উপ-

কারিতা পরখ করার সুযোগ পাওয়া যেতে পারে।

পিনেলের পছন্দ করা রেস্তোরাঁটা এমন এক এলাকায় যে নার-কোটিকজনিত সমৃদ্ধির ছোঁয়া পায়নি এখনো। দোতলার চেয়ে উঁচু কোনো বাড়ি নেই, একটা ছাদেও নেই টালি। রাস্তার ধারেই বাজার বসেছে, এমনকি খোলা ফুটপাতে ভেড়ার আস্ত বাচ্চা গনগনে আগুনে ঝলসানো হচ্ছে। প্রায় সবগুলো পাঁচিলের মাথায় একটা করে লাউড-স্পীকার। কান ফাটানো আওয়াজে গান শুনতে ভালোবাসে মেডি-লিনের লোকজন।

খাওয়া শেষ করে একটা কিউবান চুরুট ধরালো রানা, এই সময় কাজ সেরে ফিরে এলো পিনেল।

'এই কাগজটাই তো চেয়েছিলেন, সিনর?'

দৈনিক পত্রিকাটা হাতে নিলো রানা, দেখলো ভিক্টর লজেনের লা জোডিয়াকা-ই বটে। সিগারে টান দেয়ার ফাঁকে হেডিংগুলোর ওপর চোখ বোলালো ও। খবর আর সম্পাদকীয়তে মার্কিন বিরোধী মনোভাব স্পষ্ট, খেলা সংক্রান্ত প্রতিবেদনের জন্যে ছাড়া হয়েছে বিরাট জায়গা। প্রতিটি লেখাতেই ফ্যাসিস্ট আদর্শের আভাস পাওয়া যায়। লোগো হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে সাদা একটা ভেড়া।

রানার কৌতূহল সম্পর্কে নিজের কৌতূহল চেপে রাখতে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে পিনেল। বিল মিটিয়ে আরোহীকে নিয়ে গাড়িতে ওঠা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে আধমরা হয়ে গেল সে। তারপর শুরু হলো তার বকবকানি। 'আপনি কি, সিনর, হোয়াইট গামা সম্পর্কে আগ্রহী?'

'কি সম্পর্কে?'

'ভিক্টর লজেনের পার্টি সম্পর্কে,' বললো মরিস। 'পার্টির পত্রিকার নাম জোডিয়াক, লোগো মেষ, আর মেষের প্রতীক হলো গামা।

গোটা ব্যাপারটা ভারি রহস্যময়।'

'সাধারণ একটা ব্যাপার রহস্যময় করে তোলা হয় সাধারণত কিছু লুকোবার জন্যে, পিনেল।'

'আপনি কলম্বিয়ায় রয়েছেন, সিনর। এখানে যা কিছু সাধারণ সব গোপন করা হয়। আর সমস্ত গোপন জিনিস সরাসরি লোকের চোখের সামনে রাখা হয়।'

রানা ভাবলো, পিনেলের চিন্তা-ভাবনা ঠিক যেন একজন স্পাইয়ের মতো। 'এ-সব বিশ্বাস না করাই ভালো, পিনেল,' বললো ও। 'পাগল হয়ে যাবে।'

বিড়বিড় করে স্প্যানিশ ভাষায় যা বললো পিনেল, তার মানে দাঁড়ায়, কলম্বিয়ায় পাগলামিও একটা সাধারণ রোগ। তারপর সে তার নিজের আয়-রোজগার সম্পর্কে সচেতন হলো। 'আপনি সম্ভবত কালও শহর দেখতে বেরোবেন, সিনর। আসল কলম্বিয়াকে দেখতে চাইলে অবশ্যই শহর থেকে দূরে যেতে হবে আপনাকে। আমি আপনাকে পাহাড়ে নিয়ে যেতে পারি। সান্তা ফে চিড়িয়াখানা আপনার যদি পছন্দ হয়ে থাকে, আমি হলপ করে বলতে পারি, কোপাকাবানার চিড়িয়াখানাটা আপনার আরো ভালো লাগবে। ওটা হাসিয়ানদা ভিসি-তে, ভিক্টর লজেনের মালিকানাধীন একটা থিম পার্ক।'

'থিম পার্ক?' বললো রানা।

'কলম্বিয়াবাসীদের জন্যে তার একটা উপহার,' এক গাল হাসি নিয়ে বললো পিনেল। 'তবে, ঢুকতে চাইলে টিকেট কাটতে হয়।'

অপরাধীদের নিয়ে সবাইকে হাসি ঠাট্টা করতে দেখে রেগে আছে রানা, এবার সেটা প্রকাশ পেলো। 'সবজান্তার ভান বাদ দিয়ে, এ-ব্যাপারে তোমরা কিছু করো না কেন?'

'এ-ব্যাপারে, সিনর ?'

'ড্রাগ ব্যবসার বিরুদ্ধে।'

'আমি, সিনর ?'

'হ্যাঁ, তুমি,' বললো রানা। 'কুকুরগুলোর বিরুদ্ধে যারা লড়তে চায় তাদেরকে ভোট দিতে পারো।'

মাথা নেড়ে রিয়ার ভিউ মিররে তাকালো পিনেল। 'একটা কথা নিঃসংশয়ে জানি আমি, সিনর। পলিটিক্স আর ড্রাগস—দুটোর মধ্যে কম বিপজ্জনক হলো ড্রাগস। ককেরসরা খুন করে শুধু লাভের জন্যে। কেউ যদি ইনফরমার হয় তাহলে ককেরসরা তাকে, বড়জোর তার পরিবারকে খুন করবে। কিন্তু পলিটিক্স লা ভায়োলেনশিয়া খুন করবে হাজার হাজার মানুষকে।'

লা ভায়োলেনশিয়া। ভায়োলেন্স। হিংস্রতা। শুরু হয়েছিল উনিশশো আটচল্লিশে বোগোটার লিবারেল মেয়রকে খুন করার মধ্যে দিয়ে, পরবর্তী প্রায় পনেরো বছর ধরে তার রেশ চলতে থাকে। লা ভায়োলেনশিয়া অঘোষিত গৃহযুদ্ধ ছাড়া কিছু নয়।

'তবু আরেকবার ঝুঁকি নেয়ার এটাই সময়, পিনেল। এই ড্রাগ শুধু কলম্বিয়া বা তোমাদের নয়, গোটা দুনিয়ার সর্বনাশ ডেকে আনছে।'

'আপনার পক্ষে বলা সহজ, কারণ আমার জায়গায় আপনি বসবাস করেন না। কাল ডাস-এর কাছাকাছি একটা গ্রাম থেকে এসেছি আমি। উপত্যকার একদিকে একটা শহর আছে, শহরটার সব কিছু নীল রঙের, রক্ষণশীলদের আস্তানা। উপত্যকার অপর দিকটা লাল শহর, লিবারেলদের ঘাঁটি। নীল শহরে আপনি যদি একটা লাল টাই পরেন, সিনর, আপনাকে ওরা কোনো প্রশ্ন না করে গুলি করবে। গাঁজাখুরী গপ্পো নয়, সিনর।'

'তোমাদের ওদিকে সরকার নেই ?'

'বড় শহরগুলোর বাইরে সরকারের কোনো অস্তিত্ব আপনি খুঁজে পাবেন না। আপনি যদি লাল হন, আপনার প্রথম ও প্রধান কাজ নীলদের মেরে নির্বংশ করা। মাঝে মধ্যে ঘটেও তাই। একটা পাড়ায় গিয়ে সবাইকে খুন করে আসে। গরু-ছাগলও মারছে ওরা, কারণ ওগুলোর গলায় নীল বা লাল ফিতে থাকে। কলম্বিয়ার মানুষ শুধু অস্ত্রের ভক্ত নয়, তারা খুন করতে ভালোও বাসে। ড্রাগ ব্যবসায় কিন্তু এটা দেখা যায় না। কোকেন সম্রাটরা লাভ না দেখলে রক্ত ঝরাতে রাজি নয়।'

আলোচনাটা লম্বা করতে মন চাইলো না রানার। হোটেলে ফেরার পথে আর কোনো কথা হলো না। আগের সেই অদ্ভুত অনুভূতিটা আবার ফিরে এলো শরীরে, যেন একটা মায়া বা স্বপ্নজগতের ভেতর রয়েছে ও। শহরে রাত নেমেছে রক্তবর্ণ আর নীল গাঢ় ছায়া নিয়ে, উঁচু ভবনগুলোর আলো কোথাও জ্যামিতিক কোথাও নিরাকার নকশা তৈরি করেছে, চওড়া এভিনিউগুলোকে বেড় দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা পাম গাছগুলোকে দৈত্যাকৃতি অশুভ ফুলের মতো লাগলো। শহরে কোথাও বিশৃঙ্খলার চিহ্নমাত্র নেই, সব কিছু সাজানো-গোছানো ও রুচিসম্মত। উদ্বেগ আর অস্বস্তি শুধু ওর মনে। শহরটাকে দেখে বিশ্বাস করা কঠিন শোনা কথাগুলো সত্যি হতে পারে।

ক্যারেরা ফিফটি-ওয়ানে ঢুকলো গাড়ি। পিনেলের সাথে কথা বলে হোটেল খানিকটা দূরে থাকতেই নেমে পড়লো রানা। চারদিকে চোখ বুলিয়ে কোথাও দেখতে পেলো না হোণ্ডাটাকে। হোটেল বিল্ডিঙের আশপাশেও এমন কাউকে দেখা গেল না যাকে সন্দেহ করা যায়। এর মানে হতে পারে রানা হোটেলে নেই জানতে পেরে লোকগুলোও

চলে গেছে। উল্টোটাও হতে পারে, রানা ফাঁকি দেয়ায় তাদের কৌতূহল বেড়ে গেছে আরো, অপেক্ষা করছে হোটেলের ভেতর, সম্ভবত ওর স্যুইটে।

লবিতে তাদের দেখা গেল না। অল্প কিছু লোক রয়েছে, পরিবেশটা শান্ত। ব্যাগটা হোটেলের সেফে রাখলো রানা, শুধু পিস্তল আর ছুরিটা পকেটে রয়েছে। এলিভেটরে চড়ে ছ'তলায় উঠে এলো, তারপর সিঁড়ি বেয়ে পাঁচতলায় নামলো। হলে পৌঁছে চারদিকে তাকালো, ধীর পায়ে এগোলো, ছাড়িয়ে এলো নিজের স্যুইট-সামনে আরেকটা সিঁড়ি দেখতে পেলো। চারশো ষোলো নম্বরে কেউ আছে বলে মনে হলো না। ফিরে এসে দরজাটা পরীক্ষা করলো ও। কবাট আর চৌকাঠের মাঝখানে সরু কাগজের টুকরোটা জায়গামতোই পেলো। তালা খুলে ভেতরে ঢুকলো।

দরজার কবাট পুরোপুরি খোলা রেখে নিচু হয়ে ভেতরে ঢুকলো রানা, কারণ দরজা ছাড়াও একটা হোটেল-স্যুইটে ঢোকার আরো অনেক উপায় আছে। দ্রুত ভেতরে ঢুকে ডান দিকে সরে গেল ও। ওখান থেকে সিটিংরুমের সবটুকু আর বাথরুমের দরজা পুরোপুরি দেখতে পাবে। পরবর্তী পাঁচ মিনিট অন্ধকারে নিঃশ্বাসের শব্দ চেপে রাখা ছাড়া আর কিছু করলো না রানা। অন্য কোনো উৎস থেকে অসহিষ্ণুতার আভাস পাবার জন্যে অপেক্ষা করছে। কিছুই পেলো না দেখে শম্বুকগতিতে কামরাটা ঘুরে এলো একবার। বন্ধ করলো দরজা। দু'মিনিট পর, কিছু না পেয়ে, আলো জ্বাললো।

খুঁতটা সাথে সাথে চোখে পড়লো। স্যুইট ত্যাগ করার আগে বড়সড় একটা তারকাচিহ্ন তৈরি করেছিল রানা। উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করেছিল টেলিফোন, অ্যাশট্রে, নাইটস্ট্যাণ্ডে রাখা ল্যাম্প,

কফি টেবিলের কোণ, আর দরজার পিছনে সাঁটা হোটেল কর্তৃপক্ষের নোটিস। বিছানার পায়ের দিকে দাঁড়ালে রানার থাকার কথা তারকা-চিহ্নের ঠিক মাঝখানে। কিন্তু নিজেকে একপাশে দেখতে পাচ্ছে ও।

কেউ একজন স্যুইটে ঢুকেছিল। রুমসার্ভিসকে বারণ করে গেছে ও, কেউ যেন না ঢোকে। সিটিংরুমটা নিখুঁতভাবে সাজানো দেখে গেছে ও, টেবিলের ওপর ঝুড়িভর্তি ফল সহ। ফলগুলো তখনই ওর দৃষ্টি কেড়েছিল, কোনো কোনোটা আগে কখনো খায়নি বা দেখেনি। তবে সংখ্যায় ক'টা ছিলো বলতে পারবে না, আর সাদা রঙের কোনো ফলও ছিলো না।

কিন্তু ঝুড়িতে এখন সাদা একটা ফল রয়েছে। অন্তত একটা।

উপযুক্ত ইকুইপমেণ্ট থাকলে রানা হয়তো অন্য কোনো উপায় বেছে নিতো। তার বদলে যা করলো, ওটাই একমাত্র বিকল্প। কামরা থেকে বেরিয়ে আসছে ও।

জলদি! জলদি!

সিদ্ধান্তটা ঠিকই ছিলো, কিন্তু সামান্য দেরিতে নেয়া হয়েছে। দরজার দিকে লাফ দিলো রানা, হ্যাঁচকা টানে খুলে ফেললো কবাট, করিডরে বেরিয়ে এসে নিজের পিছনে বন্ধ করছে ওটা, এই সময় বেজে উঠলো টেলিফোনটা।

কাঁধের ওপর দিয়ে পিছন দিকে তাকাতে যাচ্ছে রানা, চোখ-ধাঁধানো উজ্জ্বল আলোর সাথে বিস্ফোরিত হলো সিটিংরুমের ভেতরের দেয়াল-গুলো, তারপর সামনের দেয়াল আর দরজা প্রচণ্ড ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিলো ওকে, কেড়ে নিলো ওর দু'হপ্তা সময়।

পাঁচ

রোম, ২২শে জুলাই, ১৯৪৫।

পিয়াজা নোভোনা থেকে ভায়া ডেল'আনিমা-য় তিন দিক থেকে পৌঁছুনো যায়, কারো চোখে না পড়ে সান্তা মারিয়া ইনস্টিটিউটে যাবার জন্যে সর্ব উত্তরের পথটা বেছে নিলেন মুলার। বার্লিনের ধ্বংসস্তূপ ত্যাগ করার পর খানিকটা খুঁড়িয়ে হাঁটেন তিনি—রেড আর্মির কোনো উপহার নয়, এর জন্যে দায়ী ইটালিয়ান পাহাড়ে একটা দুর্ঘটনা। গোড়ালির ব্যথাটা ছাড়া, রোম পর্যন্ত অস্তিত্ব রক্ষার যাত্রায় শরীরটা তাঁর ভালোই ছিলো, নিয়মিত কায়িক পরিশ্রম করায় প্রাণশক্তি আগের চেয়ে বরং বেড়েছে। বয়স হয়েছে, তাঁকে ঠিক যুবক বলা যাবে না, কিন্তু আগে কখনো নিজেকে এতোটা সুস্থ আর সবল মনে হয়নি। অনুভব করছেন, দ্বিতীয়, সম্পূর্ণ নতুন একটা জীবনে প্রবেশ করছেন তিনি।

কাল তাঁর ভাগ্য পরীক্ষা হবে। সান্তা মারিয়া ইনস্টিটিউট দীর্ঘদিন জার্মেনীর আর্থিক আনুকূল্য পেয়ে এসেছে, ইনস্টিটিউটের রেক্টর, বিশপ অ্যালোইস হুডাল, অত্যন্ত সজ্জন ব্যক্তি। আইখম্যান, কানটেনব্রুনার

ও হিটলারের মতো হুডালও একজন অস্ট্রিয়ান, ওঁদের তিনজনের মতো হুডালও আদর্শ জার্মান হবার জন্যে চেষ্টার কোনো ত্রুটি করেননি। হেনেরিক মুলারের জন্যে এটা একটা সুসংবাদ।

যুদ্ধের আগে থেকেই, হুডাল 'দি ফাউণ্ডেশন অভ ন্যাশনাল সোশিয়ালিজম' নামে বইটা লেখার পর থেকে, দু'জনের মধ্যে যোগাযোগ ছিলো। শোনা যায় হিটলার নাকি বইটার ভূমিকাটুকু পড়েছেন। প্রভাবশালী সব ক'জন পার্টি সদস্য বইটার প্রশংসা করেছেন। ভালোমানুষ বিশপ শুধু নাৎসী আদর্শ প্রচার করেননি, সেই সাথে ভ্যাটিকানে তিনি মার্কসবাদ বিরোধী একটা আন্দোলনেরও সূচনা করেন—ক্যাথলিক আদর্শের জন্যে মার্কসবাদই তাঁর দৃষ্টিতে সবচেয়ে বড় হুমকি। তাঁর কমিউনিস্ট বিরোধী প্রোগ্রাম 'আখ্যা লাভ করে 'অ্যাকশন হুডাল' নামে।

কিন্তু রোমে পৌঁছুবার পর কিভাবে তাঁর সাথে যোগাযোগ করবেন, দেখা করে কি বলবেন, এ-সব নিয়ে অনিশ্চিত ছিলেন মুলার। বার্লিন ভস্ম হওয়ার সাথে সাথে অনেক মানুষের ভেতরকার অন্ধ আবেগ বা উন্মাদনাও নিঃশেষ হয়ে গেছে। কাজেই, হুডাল সাথে সাথে তাঁর চিরকূটের প্রাপ্তিস্বীকার করে জবাব দেয়ায় একাধারে বিস্মিত ও খুশি হলেন গেস্টাপো প্রধান। যুদ্ধের সময় কেলার-এর মাধ্যমে যোগাযোগ হতো, তখন একাধিক ছদ্মনাম ব্যবহার করেছেন তিনি, তারই একটা ব্যবহার করেছেন এবারকার চিরকূটে। উত্তরে হুডাল জানিয়েছেন, মুলার—হের মুয়েলার—তাঁর সাথে নির্দ্বিধায় দেখা করতে আসতে পারেন। নির্দিষ্ট দিন-ক্ষণও জানিয়ে দিয়েছেন তিনি।

কলেজে সময়মতোই পৌঁছুলেন মুলার, এই মুহূর্তে যিশুর একটা পেইন্টিঙের নিচে চুপচাপ বসে আছেন। পথ দেখিয়ে এই অফিস

কামরায় আনা হয়েছে তাঁকে, অপেক্ষা করতে বলা হয়েছে।

অনেকক্ষণ হলো অপেক্ষা করছেন মুলার। ধৈর্য হারিয়ে ফেললেন তিনি, বিপদের গন্ধ পাচ্ছেন, এই সময় ভেতর দিকের একটা দরজা খুলে কামরায় ঢুকলেন বিশপ হুডাল।

লম্বা, কুৎসিত বিশপ দীর্ঘ পদক্ষেপে এগিয়ে আসার সময় হাত দুটো বাড়িয়ে দিলেন সামনে। 'হেনেরিক, আমার ধারণাই ছিলো না অবরোধ ডিঙিয়ে পালিয়ে এসেছো তুমি!'

বিশপের সাথে কিভাবে খেলতে হবে, ঠিক বুঝতে না পেরে প্রায় সত্যি কথাটাই বললেন মুলার, 'যতোক্ষণ সম্ভব হয়েছে, ছিলাম, ফাদার। সিটাডেলে আর যদি পঁয়তাল্লিশ মিনিট থাকতাম, আমাকে আর খুঁজে পাওয়া যেতো না।'

'ব্যাপারটা পাগলামি ছিলো—বার্লিনের প্রতিরক্ষা,' বললেন বিশপ। 'শেষের দিকে হিটলার নিশ্চয়ই পুরোপুরি উন্মাদ হয়ে গিয়েছিল।'

'মরার জন্যে প্রতিজ্ঞা নিয়েছিলেন তিনি,' বললেন মুলার। 'রাশিয়ানদের হাতে ধরা পড়তে চাননি। আপনি নিশ্চয়ই ব্যাপারটা বুঝবেন।'

'বুঝি এবং প্রশংসা করি,' হুডাল বললেন। মুলারের হাত দুটো ছেড়ে দিলেন তিনি, এক পা পিছিয়ে তাঁর আপাদমস্তকে চোখ বোলালেন। 'কিন্তু তোমাকে দারুণ লাগছে, হেনেরিক। পরাজয় মনে হচ্ছে তোমার কাছে অর্থহীন। আগের চেয়ে যেন উন্নতি ঘটেছে তোমার··· চেহারার।'

'বার্লিনে আহত হই আমি,' দ্রুত বললেন মুলার, সার্জিক্যাল অপারেশনটার কথা এড়িয়ে গেলেন, যার দরুন নতুন একটা চেহারা পেয়েছেন তিনি। 'কাজেই চিকিৎসা করাতে হয়েছে।'

মুলারের দিকে পিছন ফিরলেন হুডাল, তাঁর কথা মুহূর্তের জন্যেও বিশ্বাস করেননি। নিজের ডেস্কের পিছনে গিয়ে দাঁড়ালেন। 'পাশের কামরা থেকে লক্ষ্য করছিলাম তোমাকে। নিশ্চিত হতে চাইছিলাম সত্যি তুমি হেনেরিক কিনা। শেষবার আমরা মিলিত হয়েছিলাম তেতাল্লিশ সালের গরমে—তোমার চেহারা সম্পূর্ণ অন্যরকম ছিলো। পরিস্থিতিটাও ছিলো আলাদা।'

'সত্যি তাই।' তেতাল্লিশের গ্রীষ্মে ফ্যাসিজম ইউরোপ শাসন করতো, রাশিয়ায় কি ঘটতে যাচ্ছে তখনও তা পরিষ্কার বোঝা যায়নি, হিটলারের নির্দেশে মুলার তখন ইটালিয়ানদের বুদ্ধি দিচ্ছে কিভাবে ইহুদিদের সামলাতে হবে। সেই অ্যাসাইনমেন্টে বিশপ হুডাল তাঁকে নানাভাবে সাহায্য করেছিলেন। 'কিন্তু, ফাদার, আজ আমি আপনার কাছ থেকে সেই পরিমাণ দয়া পাবো বলে আশা করি না।'

'কেন নয়?' গম্ভীর স্বরে জানতে চাইলেন হুডাল।

'কারণ আমি একজন ফেরারী।'

'কিন্তু তুমি একজন ক্যাথলিক।'

ইতস্তত করলেন মুলার। তাঁর পরিবার ক্যাথলিক। 'ইয়েস, ফাদার।'

'কাজেই ঈশ্বরের কাছে তুমি ফেরারী হতে পারো না। ঈশ্বরের দয়া থেকে কেউ তোমাকে বঞ্চিত করতে পারবে না।'

'কথাটা হয়তো ঠিক, ফাদার, কিন্তু ইহুদিদের ব্যাপারটার জন্যেই সন্দেহ।'

'সত্যিই কি অতোটা খারাপ ছিলো?' কৌতূহল প্রকাশ করলেন হুডাল। 'যতোটা শোনা গেছে?'

'আমি জানি না,' মুলার বললেন। 'আমার ধারণা কেউই জানে না। আইখম্যান একবার আমাকে বলেছিল, সাফল্যে আর নেশায়

বুঁদ হয়ে, আমরা নাকি শুধু ক্যাম্পেই পঞ্চাশ লাখ মানুষকে খতম করেছি। আমার ধারণা, বাড়িয়ে বলেছিল।'

'পঞ্চাশ লাখ!' সংখ্যাটা উচ্চারণ করার পর ঝুলে পড়লো বিশপের চোয়াল। 'তা কি করে সম্ভব!'

'থার্ড রাইখ কোনো কাজকেই অসম্ভব বলে গণ্য করতো না, ফাদার। বিশ্বাস করুন, ব্যাপারটা ইতিহাস থেকে বাদ দেয়া যাবে না। ইহুদি-দের আরেকটা কিংবদন্তী হয়ে থাকবে।'

'ঠিক এভাবেই দাবি উঠবে, কমিউনিস্টরাও শহীদ হয়েছে।'

'হ্যাঁ, ফাদার।'

ধীরে ধীরে নিজের চেয়ারে বসলেন বিশপ হুডাল। যা শুনলেন তাতে করে তাঁর অসুস্থতা যেন আরো বেড়ে গেছে। 'এ-সব গুজবের বিরুদ্ধে লড়ার জন্যে কিছুই কি করার নেই?'

গুজব। মুলারের জানা নেই শব্দ চয়নে কে বেশি দক্ষ, ভ্যাটিকান নাকি এসএস। দুটোর মধ্যে অদ্ভুত এক মিল আছে, গূঢ় রহস্যে বিশ্বাসী। 'সময়ে ব্যাপারটার প্রভাব আমরা কমিয়ে আনতে পারবো,' বললেন তিনি। 'তবে এই মুহূর্তে আদর্শের অস্তিত্ব রক্ষা ছাড়া তেমন কিছু করার নেই আমাদের। আবার কাজ শুরু করার জন্যে বেঁচে থাকতে হবে আমাদের।'

মাথা ঝাঁকালেন হুডাল। তিনিও বোঝেন যে আজকের এই সাক্ষাৎ-কারের পিছনে কারণ আছে। তাঁর চার্চের উপকার হয়েছে এমন দু'-পাঁচটা কাজের কথা তিনি ভুলে যাননি। তার একটা উদাহরণ হলো, তিনি জানেন, এই মুলারই, বোরম্যানের সাহায্য নিয়ে, পোপকে কিড-ন্যাপ করার হিটলারের উদ্ভট প্ল্যানটা বাতিল করেছিলেন। আজ যদি বোরম্যানও এই অফিসে পা রাখতেন, বিশপ হুডালের কাছ থেকে

এই একই ধরনের সাহায্য পেতেন। কিন্তু মার্টিন বোরম্যান দুনিয়ার কোথাও আর পদার্পণ করবেন না। এ-ব্যাপারে মুলার পুরোপুরি নিশ্চিত।

'আপাতত, হেনেরিক, এই কলেজে তোমার আমি থাকার ব্যবস্থা করে দিতে পারি। তোমার পছন্দ হবে কি?'

'পছন্দ কি বলছেন, আমি ভীষণ খুশি হবো। আপনার এই উদারতা কোনো দিন ভুলবো না, ফাদার। কিন্তু আপনার আশ্রয়ে বেশিদিন আমার থাকা হবে না। আমাদের দু'জনের জন্যেই সেটা বিপদ ডেকে আনবে।'

'একমত।'

'আরো স্থায়ী ধরনের পবিত্র আশ্রয় দরকার হবে আমার,' বললেন মুলার। 'আমার জন্যে, জার্মেনী থেকে যারা বেরিয়ে আসবে তাদের জন্যেও।'

'কি ধরনের পবিত্র আশ্রয়?'

'যা শুধু ভ্যাটিকানের পাসপোর্টধারীরা পেতে পারে,' বললেন মুলার। 'আইডেনটিটি সার্টিফিকেট নয়, রেগুলার ভ্যাটিকান পাস-পোর্ট।'

টেবিলের দিকে মাথা নিচু করলেন হুডাল। এই টেবিলে বসে একের পর এক অনেকগুলো বই লিখেছেন তিনি। এই চেয়ারে বসে তিনি তাঁর প্রভাব সেণ্ট পিটারের সিংহাসন পর্যন্ত বিস্তার করেছেন, তাঁর ভক্তে পরিণত করেছেন সিংহাসনের বর্তমান মালিক বারোতম পাইয়াসকে। তাঁদের বন্ধুত্ব অনেক দিনের পুরনো, সেই হুডাল যখন অর্ডার অভ জার্মান নাইট-এর প্রকিউরেটর জেনারেল ছিলেন, আর ইউজেনিয়ো পাসিলি ছিলেন জার্মানীতে পোপের দূত। এই ব্যক্তিগত

সম্পর্কের জন্যেই হুডাল এমন একটা ক্ষমতা পেয়ে যান, যা সামান্য একজন বিশপের পাবার কথা নয়। 'তোমাকে নিশ্চয়ই বলার দরকার নেই যে অনুরোধটা রক্ষা করা সহজ নয়।'

'খরচার জন্যে টাকার ব্যবস্থা আছে,' সাথে সাথে জবাব দিলেন মুলার। 'দশ লাখ মার্কিন ডলার জমা দেবো আমি, আপনার ইচ্ছে-মতো খরচ হবে। যদি কিছু বাঁচে, অবশ্যই তা চার্চের কাজে লাগানো যাবে।'

বিশপ বললেন, 'আচ্ছা।' বুঝতে পারছেন তিনি।

'এই ফাণ্ড একটা মাত্র শর্তে পাওয়া যেতে পারে, দাতার নাম প্রকাশ পাওয়া চলবে না।'

'এতো টাকার বিনিময়ে সামান্যই চাইছো তুমি।'

মাথা ঝোঁকালেন মুলার। 'সামান্য উপকারও কখনো কখনো গুরুত্ব-পূর্ণ ও দরকারী হয়ে ওঠে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে চোখ বুজলেন হুডাল। আবার যখন চোখ মেললেন, তাঁর মুখে রঙ ফিরে এসেছে। 'আমার এক তরুণ বন্ধু আছে, সেক্রে-টারিয়েটে বসে, সেকশন টু-র হেড, অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে মাথা ঘামায়। এ-ব্যাপারে সাহায্য করার জন্যে তাকে রাজি করানো যেতে পারে।'

'পাসপোর্টের ব্যাপারে?'

'কাজটা তার দ্বারা সম্ভব,' বললেন বিশপ।

আবার মাথা ঝাঁকালেন মুলার। 'আমি আপনার প্রতিশ্রুতি পাবার অপেক্ষায় থাকবো, ফাদার।'

'তা তুমি এরইমধ্যে পেয়েছো, হেনেরিক। খুঁটিনাটি কাজগুলো শুধু বাকি আছে।' চেয়ার ছেড়ে মুলারের দিকে একটা হাত বাড়িয়ে দিলেন হুডাল। 'চলো, তোমাকে তোমার ঘরটা দেখিয়ে দিই। খুব বেশি কিছু

তোমার জন্যে করতে পারছি না, ঘরটা একজনের সাথে শেয়ার করতে হবে তোমার। আশা করি তুমি অস্বস্তিবোধ করবে না। তোমার রুমমেটও একজন ফেরারী, পলাতক—ফ্রেঞ্চ, নাকি বলা উচিত করসিকান? আমাদের একজন ভাই, ঈশ্বরহীন বলশেভিক সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছে।'

কিছু বললেন না মুলার। ঘটনার সাথে ভেসে যাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি।

ছয়

সোমা হাসপাতাল, মেডিলিন, কলম্বিয়া। ২৩শে অক্টোবর, ১৯৮৬।

হাঁটাচলা করতে পারার পুরো দু'দিন আগে জ্ঞান ফিরে পেয়েছে রানা। শেরাটনে ওর হোটেল স্যুইট বিস্ফোরিত হবার এক হপ্তা আগে ওয়াশিংটন ডি. সি.-র এক দেয়ালে ঠুকে গিয়ে প্রচণ্ড ঝাঁকি খেয়েছিল ওর মাথা, তারপর দ্বিতীয় আঘাতটা খুলির গভীরে এমন ব্যথা সৃষ্টি করলো যে সেটা কমাবার জন্যে বিছানায় সম্পূর্ণ স্থির হয়ে আত্মসম্মোহনের সাহায্য নিতে হয়েছে ওকে। ব্যথাটা কমানো গেছে, তবে একটা হাত প্রায় অকেজো হয়ে আছে।

রানা ধরেই নিয়েছিল স্থানীয় পুলিশ আর ডি. এ. এস.-এর লোক-জন বিরক্ত করবে। কিন্তু ওকে অবাক করে দিয়ে কেউ তারা এলো না। তারপর, তিন দিনের দিন, ব্যথাটা যখন সহনীয় হয়ে এসেছে, চোখের সামনে উদ্ভাসিত হলো হাসিখুশি এক বন্ধুর মুখ। বন্ধু মানে, টমাস কালভিন, এলো ড্রাগ এনফোর্সমেণ্ট এজেন্সির ওয়াশিংটন অফিস থেকে।

নীল চোখ, বিশাল শরীর, অত্যন্ত সাহসী এবং নিষ্ঠুর, এই হলো টমাস কালভিন। জাতিসংঘের অ্যান্টি-টেরোরিস্ট অর্গানাইজেশন-এ একসাথে কাজ করেছে ওরা।

'ওরা ভাবছে তোমার ব্রেন ড্যামেজ হয়ে থাকতে পারে,' ঠোঁটে ক্ষীণ হাসি নিয়ে বললো সে। 'আমি ওদেরকে বলেছি, ড্যামেজ হলেও কোনো ক্ষতি নেই, তুমি একটা কমপিউটার বসিয়ে নেবে ওখানে।'

'সুবিধেই হয়েছে, কেউ আমাকে বিরক্ত করেনি,' বললো রানা।

'মানে পুলিশ?'

'এবং অন্যান্যরা।'

'রানা, কি যেন একটা বলতে চাইছো তুমি, সম্ভবত স্রেফ আবর্জনা। এখন সন্দেহ হচ্ছে, কলম্বিয়ান ডাক্তাররা বোধহয় ঠিকই সন্দেহ করেছে।'

'জ্যাক মরিস,' বললো রানা। 'অন্তত লোকটা যে অযোগ্য তাতে কোনো সন্দেহ নেই। নোংরাও হতে পারে।'

ভুরু কোঁচকালো কালভিন, কেবিনের চেয়ার দুটোর দিকে তাকালো, তারপর সিদ্ধান্ত নিয়ে বসে পড়লো বিছানার কিনারায়। বিছানার তোশক ডেবে যাওয়ার সাথে তিন-চার জায়গায় তীব্র ব্যথা অনুভব করলো রানা। মাথায়, ভাঙা বাঁ কব্জি আর দুটো আঙুলে।

'কেন তুমি মরিস সম্পর্কে এ-ধরনের একটা কথা বললে?' চ্যালেঞ্জের সুরে জানতে চাইলো কালভিন। চেহারায় উদ্বেগ।

'এয়ারপোর্ট থেকে দু'জন লোক ফলো করে আমাকে,' বললো রানা। 'আমি মেডিলিনে আসছি, অল্প দু'একজন জানে ব্যাপারটা, তাদের মধ্যে তুমি একজন—কিন্তু যে আমাকে এয়ারপোর্টে নামিয়ে দিয়ে গেছে সে ছাড়া আর কেউ জানতো না কখন আমার আসার কথা।'

'সে-ও জানতো না, রানা।'

'কাঁটায় কাঁটায় নয়, কাছাকাছি সময়টা জানতো।'

'অথচ মেডিলিনে তোমার শত্রু থাকার কথা নয়?' জিজ্ঞেস করলো কালভিন।

মাথা নাড়লো রানা। 'সম্ভব নয়।'

'সি. আই. এ. হয়তো তোমাকে স্থায়ীভাবে দেয়ালে ঝুলিয়ে রাখতে চাইতে পারে। কিন্তু তারাও জানে না?'

মাথা নাড়লো রানা আবার।

'আর ন্যাশনাল সিকিউরিটি এজেন্সিতে তোমার বন্ধু আছে।'

'তুমি জানলে কিভাবে?'

'এখানে আসার আগে হুবার্ট লজের সাথে দেখা করেছি আমি। তোমার তৎপরতা সম্পর্কে তিনি আমাকে ব্রিফ করেছেন।'

'আর কি বললেন তিনি?'

'তেমন কিছু না,' বললো কালভিন। 'তোমাকে জানাতে বলেছেন, লিলি ভালো আছে। তার বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ এখনো নেয়া হয়নি। এলাকার সিকিউরিটি জোরদার করা হয়েছে।'

কিন্তু রানা জানে, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও ট্রেনিং পাওয়া প্রফেশনালদের কাছে সিকিউরিটি কোনো বাধাই নয়। 'ব্যস, আর কিছু বলেননি?'

'তোমাকে জানাতে বললেন, তেহরান থেকে আভাস পেয়েছেন তিনি। গোটা ব্যাপারটা শিগগিরই ফাঁস হতে যাচ্ছে। মাত্র কয়েক দিনের মধ্যে। খুব বেশি হলে একমাস। তুমি জানো, তাঁর এ-সব কথার কি অর্থ?'

জানে রানা। ইরানে যা ঘটতে যাচ্ছে তার সাথে ওর তেমন কোনো সম্পর্ক নেই, তবু গুরুত্বপূর্ণ এই জন্যে যে ঘটনাটার সাথে ওকে বরাদ্দ করা সময়ের প্রশ্ন জড়িত। ঘটনাটা ঘটার পর, এন. এস. এ. বা ডি. ই. এ. ওকে আর লিলিকে যে সামান্য প্রোটেকশন ও সাহায্য দিতে পারছে তা আর দিতে পারবে না। তার আগে পর্যন্ত সি. আই. এ. ওকে ছোঁয়ার সাহস দেখাবে বলে মনে হয় না। 'তোমার লোকটার সাথে এক ঘণ্টা বসতে চাই আমি, কালভিন,' বললো রানা। 'কি ঘটেছে জানতে হবে আমাকে।'

'হাসপাতালের বিছানা থেকে কাজটা করতে চাও?'

'কাল আমি চলাফেরা করতে পারবো,' বললো রানা। 'শুয়োরটার অপারেটিং প্রোগ্রাম না জানা পর্যন্ত আমার স্বস্তি নেই। তার আমি হাড়গোড় সব ভেঙে দেবো।'

মাথা নাড়লো কালভিন। 'আমাদের একজন লোককে মারার জন্যে তোমার হাতে তুলে দিতে পারি না, রানা। তবে, ডি. ই. এ. কলম্বিয়ার লোক মরিস। আমার অধীন নয়। আমি এখানে এসেছি নেহায়েতই কাজ সেরে ফিরে যাবার জন্যে।'

ব্যাপারটা কেমন যেন ঘোলাটে লাগলো রানার। টমাস কালভিন ডি. ই. এ.-র রিজিওনাল ডিরেক্টর, স্রেফ রানার কুশলাদি জানার জন্যে কলম্বিয়ায় এসেছে, এ বিশ্বাস্য নয়। 'কেন এসেছো বললে না তো?'

রানা সরাসরি প্রশ্ন করায় খুশি হলো কালভিন। রানাকে আরেক দফা ব্যথায় নীল করে দিয়ে বিছানা ছাড়লো সে, ছোট্ট মেঝেতে পায়চারি শুরু করলো, শেষবার জানালার কাছে পৌঁছে হঠাৎ ঘুরে দাঁড়ালো, কি যেন মনে পড়ে গেছে। 'কার্টেল সবচেয়ে যেটা ভয় করে, কি সেটা, তুমি জানো?'

'বিচারের জন্যে ধরে আমেরিকায় পাঠানো হবে। এক্সট্রাডিশন।'

সঠিক উত্তর পেয়ে খানিকটা হতাশ হলো কালভিন, যদিও পরিস্থিতির বর্ণনা দিতে দেরি করলো না। 'গত নভেম্বরে দক্ষিণপন্থী জাতীয়তাবাদীদের একটা গ্রুপ কলম্বিয়ার সুপ্রীম কোর্টকে নিশ্চিহ্ন করার সিদ্ধান্ত নেয়। সিদ্ধান্ত কার্যকরী করে তারা। সামনের গেট দিয়ে বুক ফুলিয়ে ভেতরে ঢুকলো, চব্বিশ ঘণ্টার বেশি জিম্মি করে রাখলো বিচারকদের, তাঁদের দশজনকে সহ খুন করলো প্রধান বিচারপতিকে। সব মিলিয়ে একশোজনেরও বেশি লোক মারা যায়। গ্রুপটার নাম এম-নাইনটিন। কেউ কিন্তু বুঝতে পারলো না এ-ধরনের একটা হত্যাযজ্ঞ কেন তারা ঘটালো। পাবলিসিটি চেয়েছিল তারা? কিন্তু এমনিতেই তো যথেষ্ট প্রচার পায় গ্রুপটা। মুক্তিপণ? কিন্তু ওদের তো টাকার কোনো অভাব নেই। আক্রমণটা ছিলো সুইসাইডাল, এমনকি কোনো বৈপ্লবিক গ্রুপের জন্যেও। কারণটা পরিষ্কার হলো আরো পরে, আগুন থেকে ছাই সরাবার আগে নয়। ইনভেস্টিগেটররা দেখলো, বেশ কিছু এক্সট্রাডিশন ফাইল পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। উপসংহার: ফাইলগুলো ধ্বংস করার জন্যে এম-নাইনটিনকে বিপুল টাকা দেয় কার্টেল। নিহত বিচারকরা ওদের জন্যে বোনাস হিসেবে বিবেচিত হলেন, তাঁরা এক্সট্রাডিশন চুক্তির পক্ষে বক্তব্য রাখতেন। আইনসম্মতভাবে বিদেশে পাঠানোটাকে কার্টেল কি রকম ভয় পায়, বুঝতে পারছো তো?'

'সে-কথা মরিস আমাকে বলেছে। এর সাথে ডি. ই. এ.-র সম্পর্ক কি? তুমি তো শুধু শুধু বকবক করছো।'

'তুমি যখন একটা বিদেশী রাষ্ট্রে থাকো, কথা বলা ছাড়া আর কি করার থাকে তোমার? আমরা ওদেরকে বলেছি, কোকেন সম্রাটদের খেদিয়ে দেশ থেকে বের করে দাও, বা এমন কোথাও ঠেলে দাও যেখান থেকে ধরে তাদেরকে আমরা যুক্তরাষ্ট্রে নিয়ে যেতে পারি। তারপর, তাদের বিরুদ্ধে যদি প্রমাণ সহ অভিযোগ থাকে, বিচার করা হবে। সেই কাজেই এখানে এসেছি আমি। সীল করা চারটে অভিযোগ রয়েছে টামপা, ফ্লোরিডায়, ভিক্টর লজেনের বিরুদ্ধে।'

সময়োচিত খবরটায় তথ্যও আছে, উপলব্ধি করলো রানা, তবে এ-ও বুঝলো যে গল্পের এটা মাত্র অর্ধাংশ। 'কলম্বিয়া সরকার কি তাকে তুলে নিতে দিতে রাজি হয়েছে?'

'এখনো হয়নি,' কালভিন বললো। 'কারণ এক্সট্রাডিশন রিকোয়েস্ট সুপ্রীম কোর্টের সব ক'জন অর্থাৎ চব্বিশ জনের দ্বারাই অনুমোদিত হতে হবে। হামলাটা হবার পর বিচারকদের পদ খালি হয়ে গেছে না। পুরণ করা হচ্ছে।'

'তাহলে তো কথা বলার বেশি কিছু নেই আমাদের, তাই না?'

আবার পায়চারি শুরু করতে গিয়ে থমকে দাঁড়ালো কালভিন। 'তোমার সত্যি কিছু হয়েছে নাকি, রানা? লোকগুলো তোমার সাথে সি-ফোর ভূমিকা পালন করেছে, তারপরও তুমি খেপছো না কেন?'

'ওটা কি সি-ফোর ছিলো?'

'হ্যাঁ।' মাথা ঝাঁকালো কালভিন।

'একাধিক চার্জ হওয়ার কথা।'

'আমাদের ধারণা, তিনটে ছিলো।'

তিনটের একটা ফলের ঝুড়িতে দেখেছে রানা। ওর কোনো সন্দেহ নেই, আরো ছিলো। 'আর কি জানো তুমি?'

'ছাদ থেকে ঝুল-বারান্দা হয়ে ভেতরে ঢোকে ওরা।'

'স্যুইটটায় কোনো ঝুল-বারান্দা ছিলো না, টমাস। আমাকে তুমি অ্যামেচার ভাবছো নাকি?'

'তোমার পাশের স্যুইটের ঝুল-বারান্দায় নেমেছিল ওরা। দুটো স্যুইটের দুই জানালার মধ্যে বারো ফুট ব্যবধান, পাথুরে দেয়ালে আমরা সাকশন মার্ক পেয়েছি।'

'তারমানে সস্তা ভাড়াটে খুনি নয়।'

'না। প্রফেশনাল।'

কাজটা করার মতো লোক সারা দুনিয়ায় একশোর বেশি নেই, ভালোভাবে করতে পারবে আরো কম লোক। তবে এক্সপ্লোসিভগুলো যে বা যারা রোপণ করেছে তাদের পরিচয় জানতে পারলেই যে সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে তা হয়তো ঠিক নয়। তারা তো ভাড়া করা প্রফেশনাল। হেনেরিক মুলার বা ভিক্টর লজেনের মতো লোক টার্গেট আর নিজেদের মাঝখানে অনেকগুলো ধাপ তৈরি করে রাখে। নিজেদের রক্ষার জন্যে সুইচ অফ করে দেয়ার যন্ত্র ব্যবহার করে তারা, যে-কোনো আদর্শ ইন্টেলিজেন্সের মতোই। রানাকে যেটা বিরক্ত করছে, কলম্বিয়ার ড্রাগ-ব্যবসায়ীরা প্রতিটি স্তরে ইন্টেলিজেন্স ব্যবহারে দক্ষ। যথেষ্ট টাকা থাকলে সবচেয়ে ভালো জিনিসটা কেনা যায়, এভাবে ব্যাখ্যা করা যায় ব্যাপারটা।

কিংবা হয়তো অন্য আরেকটা ব্যাখ্যা আছে। মার্টিন বেকারের ইন্টেলিজেন্স রিপোর্ট অনুসারে, বার্লিন থেকে পালিয়ে ভ্যাটিকানে চলে আসেন হেনেরিক মুলার, সেখানে অন্যান্য নাৎসী পলাতকদের

মতো তাঁকেও সাহায্য করেন প্রো-ফ্যাসিস্ট একজন বিশপ। কর্সিকা দ্বীপে আত্মগোপন করে ছিলেন মুলার, তারপর একটা জাহাজে চড়ে আর্জেন্টিনায় চলে আসেন। ওখানে তাঁর উপস্থিতির প্রমাণ পায় এফ. বি. আই., নিশ্চিতভাবে জানতে পারে বুয়েনস আয়ার্সে তিনি আসেন বিরাট অঙ্কের টাকা নিয়ে। তার কিছুদিন পরই অদৃশ্য হয়ে যান তিনি।

অদ্ভুত ব্যাপার হলো, সাঁতেলা লজেন নামে আরেক লোক, ওই একই সময়ে একই পথ পাড়ি দেয়। মার্সেইলেস আণ্ডারগ্রাউণ্ডের লিডার, একজন কর্সিকান, যুদ্ধের শেষ দিকে পালিয়ে এলো আর্জেন্টিনায়, ওখানে একটা দোকান খুলে বসে মার্সেইলেস থেকে আমদানী করা হেরোইন ছড়িয়ে দিলো দক্ষিণ আমেরিকায়। পরে, ইতিমধ্যে ডেল পরিবারে বিয়ে করেছে সে, চলে এলো কলম্বিয়ায়, নিজেদের কালচার আর নগদ টাকা ধরে রেখে বনে গেল একজন ডন।

ওই একই সময়ে হেনেরিক মুলারও উপস্থিত হলেন কলম্বিয়ায়। তিনিও ডেল পরিবারে বিয়ে করলেন, এবং টাকার জোরে নিজের ব্যবসা ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করলেন। তবে সাঁতেলা লজেন যখন ড্রাগ ব্যবসাতে কিংবদন্তী হয়ে উঠলেন, মার্সেইলেস আণ্ডারগ্রাউণ্ডের লোকজন তাঁকে পুজো করতে শুরু করেছে, হেনেরিক মুলার তখন নীরব অবসর জীবন বেছে নিলেন। নিজের জমিতে চাষবাস করেন তিনি ডিসটিলারি কারখানা চালু করেছেন, তারপর একটা পরিবহন কোম্পানীও কিনলেন। মানুষটা যেন আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে উঠলেন।

'তুমি জানো, টমাস, দি কোয়ার্টারলি-র আর্টিকেলটা আমি পড়েছি —ওরা ওটাকে দি ভার্টিক্যাল ইন্টিগ্রেশন বলে।'

'আমরা বলি, ফার্ম টু আর্ম। উৎপাদন থেকে শুরু করে পরিশোধিত

হবার পর বাজারজাতকরণ পর্যন্ত ব্যবসার প্রতিটি স্তর কোম্পানী নিজেই সব নিয়ন্ত্রণ করবে। মধ্যসত্ত্বভোগী কেউ নেই। লাভের টাকা থেকে ভাগ পাবে না কেউ। পদ্ধতিটা কাজ করে, সেজন্যেই ওটাকে বলা হয় কার্টেল।'

'আর সেজন্যেই তোমরা চক্রান্তের অভিযোগ তুলতে পারো।'

'কারেক্ট।'

'কিন্তু ভিক্টর লজেনের বিরুদ্ধে নয়।'

'না,' বললো কালভিন। 'বাহামায় তার একটা দ্বীপ আছে। সেখান থেকে সাত টন—সা-আ-ত টন—কোকেন চালান দেয়ার অভিযোগ আছে তার বিরুদ্ধে।'

কালভিন দ্বীপ বলতেও রানার চোখের পাতা কাঁপলো না। সব কিছুর মধ্যে বিরাটত্ব দেখতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে ও। 'তোমরা যদি চক্রান্তের অভিযোগ প্রমাণ করতে পারো, কলম্বিয়ান সরকার কি এক্স-ট্রাডিশন রিকোয়েস্ট তাড়াতাড়ি মেনে নেবে?'

'নির্ভর করে আবহাওয়ার ওপর, তুমুল বৃষ্টির মতো টাকা পড়ে কিনা তার ওপর। তবে, মনে হয়, মেনে নেবে।'

'আমার তাহলে একটা আইডিয়া আছে।'

'শোনা যাক।'

'প্রথমে আমি চাই আমার ফিল্ড কিট-টা আবার ভরে দেয়া হোক।'

'কোনো সমস্যা নয়,' জানালো কালভিন। 'ব্যাগটা হোটেলের সেফেই ছিলো। ওটা এখন আমাদের কাছে।'

'ষাট পাউণ্ড সি-ফোর দরকার আমার।'

'পাউণ্ড?' বিস্ফারিত হলো কালভিনের চোখ। 'রানা, এরইমধ্যে অনেকদিন হলো এখানে তুমি বেঁচে আছো।'

'ওগুলো কাল চাই আমার।'

প্রতিবাদ করলো কালভিন। 'এখানকার দোকানে ও-সব বিক্রি হয় না, রানা।'

'টমাস, চাইলে আমি ক্রেমলিনেও সি-ফোর পাচার করতে পারি। ডিটোনেটর ফিট করা না থাকলে মেটাল ডিটেকটরে ধরা পড়বে না। সি. আই. এ.-র সেই লোকটার কথা মনে নেই, গাদ্দাফির কাছে লিবিয়ায় কয়েক টন পাচার করেছিল?'

'আমাকে তোমার এডউইন পি. উইলসন বলে মনে হয়?'

'খানিকটা।'

কোনো রকমে রাগ সামলে মৃদুকণ্ঠে কালভিন বললো, 'পাবে, রানা।'

'প্রোগ্রামেবল ডিটোনেটর, কয়েকটা, কয়েক ধরনের। ব্লাস্টিং ক্যাপস। বিশ ফুট ডেটকর্ড।'

'যিশু!'

'ভালো একটা গাড়ি দরকার হবে আমার।'

'সেটা কোনো সমস্যা নয়।'

'আর দরকার হবে জ্যাক মরিসকে।'

'ওটা আমার দ্বারা সম্ভব নয়, রানা। তোমাকে আমি বলেছি।'

'না পারলে থাক। মুয়েলারের পিছু নেবো কারো সাহায্য ছাড়াই।'

ঝাঁঝের সাথে কালভিন বললো, 'তুমি ঠিক ইরানিয়ানদের মতো দর কষো! দাও, লবণটা দাও, তা না হলে খুন হয়ে যাবে আমার হাতে।'

'কথা দিচ্ছি, ওকে আমি ব্যথা দেবো না।'

'মিথ্যে কথা বলছো, রানা।'

'ঠিক আছে—খুব একটা ব্যথা দেবো না।'

'বেশ,' বললো কালভিন। 'দেখি কি করতে পারি।'

সহৃদয়তার পরিচয় দিয়ে ব্যবস্থা করলো কালভিন, সন্ধ্যায় রানাকে ফোন করলো লিলিয়ান। কালভিনের মনে সম্ভবত একটা আশাও কাজ করছে, রানাকে কোনোভাবে ক্ষান্ত করতে পারলে ওকে দেয়া প্রতিশ্রুতিগুলো তার রক্ষা করতে হবে না। লিলির কথা শোনার সময় এ-ব্যাপারে সচেতন থাকলো রানা।

ওর শরীর সম্পর্কে জানতে চাইলো লিলি। অন্য কোনো বিষয়ে আলাপ করতে অস্বীকার করলো সে। রানা তাকে জানালো, পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠবে ও। তারপর জানতে চাইলো লিলি, 'তুমি ফিরবে কবে?'

'তাড়াতাড়ি,' জবাব দিলো রানা।

'তাড়াতাড়ি মানে তো কাল,' বললো লিলি।

'না। কাল নয়।'

'রানা, এর কি মানে আমি বুঝতে পারি।'

'মানে হলো তোমাকে আমি নির্দিষ্ট কোনো তারিখ দিতে পারছি না।'

'অথচ কাজটা আমার। তোমার একটা কিছু হলে, নিজেকে আমি ক্ষমা করতে পারবো? কথা ছিলো, এন. এস. আই.-কে সব তথ্য জানিয়ে দিয়ে তুমি নিরাপদ দূরে সরে থাকবে। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে নিজেই ওদের পিছনে লাগতে যাচ্ছো তুমি। এ তো আমি চাইনি, রানা। শোনো, আমি দূতাবাস ছেড়ে বেরিয়ে আসছি। যুদ্ধ যদি করতেই হয়, আমি করবো, তুমি আমার পাশে থাকবে।'

'দূতাবাস থেকে তুমি বেরোতে পারবে না, লিলি,' বললো রানা।

'এন. এস. আই. তাদের সেরা অপারেটরদের পাহারায় বসিয়েছে ওখানে। ওখানে তুমি সম্পূর্ণ নিরাপদ।'

'এন. এস. আই.-তে কোনো নোংরা লোক থাকতে পারে না বলতে চাইছো?'

'তুমিও কি ভাবো, তোমার নিরাপত্তার প্রশ্নে আমি শুধু এন. এস. আই.-এর ওপর নির্ভর করছি। রানা এজেন্সির গোটা একটা শাখা অফিস তোমার ওপর নজর রাখছে। আর, কাজটা তোমার তা সত্যি —কিন্তু এ-ও সত্যি যে কাজটা আমারও। সে ব্যাখ্যা তোমাকে আমি আগেই দিয়েছি। তাছাড়া, মুলার আন্তর্জাতিক অপরাধী, তাকে কোর্টে হাজির করা সবার দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। আর, আমি চাই না বাংলা-দেশের তরুণদেরকে খুন করুক কলম্বিয়ার কোকেন।'

ফুঁপিয়ে উঠলো লিলি।

'লিলি!'

'চুপ করো!'

ধমক খেয়ে নির্দেশ পালন করলো রানা। খানিক পর নিজেকে সামলে নিলো লিলি, রাগের সাথে বললো, 'এক্সকিউজ মি। কিন্তু তুমি আমাকে বন্দী করে রাখবে এটা আমি মেনে নিতে পারছি না। এখন বুঝতে পারছি, তোমার সাথে যোগাযোগ করতে যাওয়াটাই আমার ভুল হয়েছিল।'

'কেন?'

'তুমি একটা সুইসাইড মিশন বেছে নিয়েছো। আমার কথা বিশ্বাস করো, রানা। প্লিজ। ফিরে এসো।'

'তা নয়,' বললো রানা। 'এখন অন্তত ব্যাপারটা সুইসাইড মিশন নয়। সে পর্যায় পেরিয়ে এসেছি।'

সাত

ড্রাগ এনফোর্সমেন্ট এজেন্সির তরুণ এজেন্ট অনেকক্ষণ হলো চোখে শর্ষে ফুল দেখছে। গলার ভেতর রক্ত আর ভাঙা দাঁতের টুকরো আটকে যাওয়ায় বিষম খেলো বার কয়েক। রানার বাম কব্জি আর আঙুলে ব্যাণ্ডেজ থাকলেও, বিস্ফোরণে ডান হাতের যে কোনো ক্ষতি হয়নি সেটা হাড়ে হাড়ে টের পেলো জ্যাক মরিস। তার নাকটা বাঁ কানের দিকে ঘুরে গেল। চোয়ালটাতেও বোধহয় ফাটল ধরেছে, অবশ্য কথা বলতে অসুবিধে হলে কাজটা রানা ভালো করেনি। তবে পেন্সিল আর কাগজ সব সময় ওর সাথেই থাকে।

'শুরু করার আগে দুটো জিনিস জানা দরকার তোমার,' বললো রানা। 'ডি. ই. এ.-তে তুমি নেই। আমার সাথে পাঁয়তারা কষলে দুনিয়াতেও থাকবে না।'

খানিকটা রক্ত আর ভাঙা দাঁতের কিছু টুকরো উগরে দিলো মরিস। সুন্দর সাদা শার্টটা নোংরা করে ফেললো। সেদিকে কয়েক সেকেণ্ড এমন দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলো, যেন নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না।

'দ···থ্,' বললো সে, তারপর শুদ্ধ করলো, 'দাঁত।'

'মনোযোগ দাও, মরিস।'

রানার দিকে আক্রোশ আর ঘৃণা নিয়ে তাকালো মরিস, তবে নিজের অবস্থা সম্পর্কেও সচেতন সে। সন্দেহ নেই, টমাস কালভিন-কেও ঘৃণা করছে, শহরের পনেরো কিলোমিটার দূরে এই নির্জন জায়গাটায় তাকে আসতে বলায়। জায়গাটা প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি বললে ভুল হবে না—পাহাড়ের একটা কাঁধের ওপর, নিচের ঢালু উপত্যকায় কফি চাষ হয়, কোথাও কোনো বাড়ি-ঘর চোখে পড়ে না। তার ভাগ্য তাকে এখানে টেনে এনেছে, বুঝতে পারছে সে। 'বলুন, আমি শুনছি।'

'আমার নাম বলো।'

'পল ওয়ারেন।'

'এই শেষবার জিজ্ঞেস করছি। আমার নাম কি?'

'মাসুদ রানা।'

'চিড়িয়াখানায় যখন দেখা হলো, তখনও তুমি আমার নাম জানতে।'

'আপনার নাম সবাই জানে,' বললো মরিস। 'তা না হলে আপ-নাকে দেখিয়ে দিতে পারলে দু'লাখ পঞ্চাশ হাজার ডলার ফী দেয়ার কথা বলা হবে কেন।'

নিজের দাম জানতে পারাটা মন্দ নয়, ভাবলো রানা। তবে, অঙ্কটা আরও বেশি হলে খুশি হতো। প্রশ্ন হলো, মেডিলিনে ওর আসার কথাই যেখানে কারো পক্ষে জানা সম্ভব নয়, সেখানে ওর দাম নির্ধা-রণ করা হয় কি করে? 'ফীর কথা তুমি জানতে পারলে কিভাবে?'

'দূতাবাসের এক লোক আমাকে বলেছে।'

'এক লোক ?'

'ইকোনমিক অ্যাফেয়ার্সের সেকেণ্ড সেক্রেটারি,' বললো মরিস, জানে সত্যি-মিথ্যে যাচাই করার উপায় আছে রানার। 'বোগোটা থেকে এলো ব্যানানা ক্রপ পরীক্ষা করার জন্যে, আপনি আসার এক-দিন আগে।'

সি. আই. এ.। একটা অপরাধ ঢাকার জন্যে নিজেদের লোককে দিয়ে আরেকটা অপরাধ করতে ভয় পাচ্ছে। তবে মুখ খুলতে তো আর অসুবিধে নেই, বিশেষ করে যদি রেকর্ড করা না হয়। মেডিলিনে শুধু একটা কথা ছড়িয়ে দিয়েছে ওরা, ববি মুয়েলারকে যে লোক খুন করেছে, আগামী কাল আসছে সে—এই তার নাম, এই তার চেহারার বর্ণনা। সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলো নিজেদের গরজেই ব্যবস্থা নেবে, ল্যাংলি থেকে যাবে ধোয়া তুলসী পাতা। কিন্তু, সি. আই. এ.-ই বা জানলো কিভাবে, আসছে ও? রানা বুঝলো, এটা নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় নয় এখন। জানার অনেক উপায় আছে, বিশেষ করে এসপিওনাজ জগতে বেঈমানী বা তথ্য কেনাবেচা যখন সাধারণ একটা ব্যাপার। 'তার ভাব দেখে মনে হয়েছে, তুমি আমাকে চিনিয়ে দিতে পারলে কারো একটা উপকার করা হবে?'

'হ্যাঁ,' বললো মরিস। 'সরাসরি কিছু বলেনি।'

সি. আই. এ.-র বেশিরভাগ কাজেই সূক্ষ্ম কৌশল আর চাতুর্য থাকে। কাউকে খুন করার সিদ্ধান্তে যে লোকটা সই করে তার সম্ভবত আধুনিক কাব্যে ডিগ্রী নেয়া আছে। 'টাকাটা কার পকেট থেকে বেরোলো?' জানতে চাইলো ও।

'এমন কেউ হবে যে আপনাকে চেনে,' বললো মরিস। 'তাদের উদ্দেশ্য আছে।'

'নাম আর ঠিকানা দরকার আমার।'

মুখটা আবার পরিষ্কার করলো মরিস, পায়ের কাছটায় এক রাশ থুথু ফেললো। 'আমাকে যে টাকা দিয়েছে তার নাম ডুলি হারমোড।'

নামটা রানার কাছে অর্থহীন। অন্য কিছু আশাও করেনি ও। 'কে সে?'

'একজন সুবিধাভোগী,' বললো মরিস। 'রাস্তায় বাসুকো বিলি করে।'

'বাসুকো?'

'শুকানো কোকেন,' বললো মরিস, 'পরিশোধিত নয়। সস্তা।'

'তার আর কতোটুকু দৌড়।'

কাঁধ ঝাঁকাতে যাচ্ছিলো মরিস, ব্যথা পাবে ভেবে ক্ষান্ত হলো। 'নগণ্য একজন ককেরস সে।'

'টাকাটা তাহলে তার পকেট থেকে আসেনি।

'হয়তো তাই।'

'কার পক্ষে কাজ করে ডুলি হারমোড?'

'কার্টেল, আবার কার!'

'নির্দিষ্ট করে বলো।'

'আমি জানি না,' বললো মরিস। 'এ-ধরনের ডিসট্রিবিউটররা অনেকেই হপ্তা শেষে চেক পায় না। যে-কেউ তাকে ভাড়া করে থাকতে পারে।'

'সাধারণত কার কাজ করে সে?'

কার্টেল ভুক্ত কারো নাম উচ্চারণ করতে রাজি নয় মরিস, আর সবার মতোই। শেষ পর্যন্ত মাথা নাড়লো সে। 'আপনি তাকেই বরং জিজ্ঞেস করুন।'

'করবো,' বললো রানা। 'কোথায় থাকে তোমার কাছ থেকে জানার পর।'

নিশ্চয়ই হাসতে চেষ্টা করলো মরিস, ক্ষতে টান পড়ায় আরো রক্ত ও আবর্জনা বেরোলো মুখ থেকে, চেহারা হলো রক্তচোষক বাদুড়ের মতো। 'চোদ্দ শিঁকে খবর নিন,' বললো সে। 'তিন দিন আগে পুলিশ তাকে জেলে ভরেছে।'

মরিস সত্যি কথা বলেছে বুঝতে পেরে সামান্যই অবাক হলো রানা। কয়েকটা নারকোটিক আইন ভাঙার অভিযোগে ডুলি হারমোডকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। তার পেশায় এটাকে একটা দুর্ঘটনাই বলতে হয়, রানাকে খুন করার চেষ্টার সাথে কোনো সম্পর্ক নেই।

অনেক কাঠ-খড় পুড়িয়ে পরদিন সকালে হারমোডের সাথে দেখা করার ব্যবস্থা করলো কালভিন। একাধিক সরকারী মহলের সাহায্য চাইতে হলো ওকে, কারণ ডি. এ. এস. স্থানীয় পুলিশকে বিশ্বাস করে না, স্থানীয় পুলিশ বিশ্বাস করে না জেলারদের, আর জেলখানায় গুরুত্বপূর্ণ বন্দী থাকলে জেলাররা সব সময় প্রাণভয়ে সন্ত্রস্ত থাকে।

ডুলি হারমোড গুরুত্বপূর্ণ বন্দী না হলেও, তার মানিব্যাগে যথেষ্ট বারুদ আছে, ফলে ওয়ার্ডেন থেকে শুরু করে ব্লক সুপারিনটেনডেন্ট পর্যন্ত সবাই চোখে পড়ার মতো উদ্বিগ্ন। শেষ চরিত্রটি, মোটাসোটা ও বিশালবপু, বাম বাইসেপ-এর সাথে চেইনে আটকানো চাবির গোছা নিয়ে পথ দেখালো রানা আর কালভিনকে। সেলে ঢোকার সময় তার ভাব দেখে মনে হলো, যেন অন্য কোথাও উপস্থিত রয়েছে সে এই মুহূর্তে কি করছে জানে না—অন্যমনস্ক ও নির্লিপ্ত।

বেশ আরামেই রাখা হয়েছে হারমোডকে। তার সেলে দুটো

জানালা, রেডিও, খবরের কাগজ, ট্রে ভর্তি খাবারদাবার, একটা চেয়ার, নরম বিছানা, কি নেই। দরজা খুলে জেলার বললো, 'ওহে, কালভো!'

কালভো অর্থাৎ ন্যাড়া বলেও ডাকা হয় ডুলি হারমোডকে। তার সবচেয়ে ভালো জিনিস সম্ভবত ওই একটাই, মাথার মাঝমধ্যিখানে তেল চকচকে মস্ত টাক। মুখে প্রকৃতির নির্দয় অত্যাচারের চিহ্ন, গুটিবসন্তের দাগ। একটা খয়েরি, একটা সোনালি, এভাবে সাজানো হয়েছে দাঁতগুলো। নাকটা যেন স্থানচ্যুত অস্ত্র, ঠিক যেন একটা শমশের।

সেল থেকে বেরিয়ে গেল জেলার, ওদের পিছনে বন্ধ হয়ে গেল দরজা। ছ'পা এগিয়ে হারমোডের চেয়ারের সামনে পৌঁছুলো রানা, একটা হাত বাড়িয়ে দিলো লোকটার কানের পিছনে, যেন মজার কোনো কৌশল বা জাদু দেখাতে যাচ্ছে, তারপর কানটা শক্ত করে ধরে হ্যাঁচকা টান দিলো। চেয়ার ছেড়ে সটান দাঁড়িয়ে পড়লো হারমোড, ভাঁজ করা হাঁটু দিয়ে তার পেটে প্রচণ্ড গুঁতো মারলো রানা, ছিটকে দেয়ালে গিয়ে পড়লো সে।

ইটে যেন একটা ডিম বাড়ি খেলো। হুস শব্দে বেরিয়ে গেল ফুসফুসের বাতাস, দেয়াল থেকে খসে পড়লো মেঝেতে শরীরটা, বসার ভঙ্গি নিয়ে স্থির হয়ে থাকলো। একটা শব্দও করেনি। তবে চেহারায় ভাবটুকু একটুও বদলালো না, রানার দিকে তাকিয়ে থাকলো তাচ্ছিল্য ও জেদ মেশানো গাম্ভীর্য নিয়ে।

কালভিনও কিছু বললো না। হারমোডের দিকে এমন দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলো সে, লোকটার অস্তিত্ব সম্পর্কেই যেন সচেতন নয়। তিন মিনিট বেধড়ক মার খাবার পর কথাটা চিৎকার করে বললো হারমোড, গলার সুরে ঘৃণাটুকু চাপা থাকলো না, 'গুদ দে, ফরেনার!'

চওড়া হাসি ফুটলো কালভিনের মুখে। 'ভুল, দোস্ত কালভো। তোমার জন্যে দিনটা আজ—ব্যাড। কারণ, আমি এখনো শুরু করিনি।'

একটা চেয়ারে বসে সিগারেট ধরালো রানা।

ওর দিকে ভুলেও তাকালো না হারমোড। খোলা একটা জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে সে বললো, 'রেডিওতে শুনেছি আমরা বৃষ্টি আশা করতে পারি। যদিও সেটা তেমন মন্দ নয়।'

'নির্ভর করে তোমার দৃষ্টিভঙ্গির ওপর,' বললো কালভিন। 'ডানবেরির ফেডারেল জেলখানায় কখনোই বৃষ্টি হয় না। শীতের সময়, তুমি যদি উঠনে থাকো, পাহাড়ের গায়ে বড়জোর তুষার দেখতে পাবে। দীর্ঘদিন ওতেই তোমাকে সন্তুষ্ট থাকতে হবে, কালভো। পাহাড়ে তুষার, কিন্তু অনেক দূরে।'

'ডানবেরি,' বললো হারমোড। 'কোথায় জায়গাটা?'

'মায়ামির উত্তরে।'

'যুক্তরাষ্ট্রে, সত্যি?'

'কানেকটিকাট রাজ্যে, কালভো। বছর কয়েকের জন্যে ওখানেই তোমাকে থাকতে হবে।'

ভয় যদি পেয়েও থাকে, হারমোডের ক্ষতবিক্ষত চেহারায় সেটা প্রকাশ পেলো না। হাত তুলে মুখ ঘষলো সে। 'আমি কলম্বিয়ার নাগরিক,' বললো সে। আমাকে গ্রেফতার করা হয়েছে এখানে—অপরাধ করার জন্যে। এ-ব্যাপারে আপনার নাক গলাবার কোনো অধিকার নেই, মিঃ ড্রাগ এনফোর্সমেন্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন।'

'বিলি করার জন্যে যথেষ্ট পরিমাণ কোকেন সহ ধরা পড়েছো তুমি, কালভো। সেজন্যেই তোমাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। কিন্তু তুমি

গ্রেফতার হবার পর তোমার আরো একটা অপরাধের কথা জানা গেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একজন নাগরিককে খুন করার ব্যর্থ চেষ্টা করেছো তুমি।' ইঙ্গিতে রানাকে দেখালো কালভিন। 'এই সেই ভদ্রলোক যাকে তুমি হত্যা করার ষড়যন্ত্র করে সফল হওনি।'

রানার দিকে তাকালো হারমোড, এতো মার খাবার পরও তার ভাব দেখে মনে হলো ওকে যেন এই প্রথম দেখছে। 'অসম্ভব!' বললো সে। 'প্রথম কারণ, খুন করতে চেয়ে ব্যর্থ হয়েছি, এমন ঘটনা আমার জীবনে কখনো ঘটেনি।'

'তারমানে তোমার সেই আগের যোগ্যতা আর নেই, খ্যাতি নষ্ট হয়ে গেছে। তোমার পৌরুষের বিরুদ্ধে এটাই একমাত্র অপমান নয়। আমার কথা অবিশ্বাস করো না—তোমাকে মার্কিন জেলে রাখা হবে নিগ্রোদের সাথে। সবাই তারা রেপিস্ট। নারী বা পুরুষ, কোনো বাছ বিচার করতে অভ্যস্ত নয় তারা। তখনো যদি তোমার মর্যাদা বলে কিছু থাকে, নিঃসন্দেহে ধরে নিতে পারো ওদের হাতে পড়লে তার কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না।'

কালভিন বেশি সময় নিচ্ছে, ভাবলো রানা। তবে লক্ষ্য করলো, কথাগুলো শুনে অস্থির হয়ে উঠলো হারমোড। 'কি প্রমাণ আছে, এই ভদ্রলোককে খুন করতে চেয়েছি আমি?'

''জ্যাক মরিসকে একটা তথ্যের জন্যে আড়াই লাখ ডলার দিয়েছো তুমি। সেই তথ্য হাতবদলের পরিণতিতে ওর ওপর হামলা চলে।'

সেলটা ঠাণ্ডা হলেও ঘামতে শুরু করলো হারমোড। দু'হাত দিয়ে মুখ মুছলো সে। 'কিন্তু আগে তো এক্সট্রাডিশন চুক্তি সই হতে হবে, তাই না?'

মিথ্যে বললো কালভিন, 'তুমি দেখছি কিছুই জানো না। প্রেসি-

ডেন্ট আজই ওটায় সই করবেন। ঠিক করেছি আজ বিকেলেই তোমাকে পাঠানো হবে বোগোটার জেলখানায়। ওখানে জেলার হিসেবে নতুন একজনকে আনা হয়েছে, শুনেছি তাকে নাকি ঘুষ খাওয়ানো সম্ভব নয়। ওখানে তোমাকে রাখা হবে—দু'দিন, বড়জোর। তারপর যুক্তরাষ্ট্রে, ডানবেরিতে, নিগ্রোদের কাছে…।'

এরপর মিথ্যে বললো হারমোড, 'আমি আমার উকিলের সাথে দেখা করতে চাই।'

'জেলখানার অফিসারদের বলে দেখতে পারো,' বললো কালভিন। 'তোমার অনুরোধ ওরা রাখতেও পারে। কিন্তু ততোক্ষণে এখানে আমি থাকবো না। আপোস প্রস্তাব বাতিল হয়ে যাবে।'

'আপোস! কি আপোস?'

'কথাই এখন সবচেয়ে দামী কারেন্সি, কালভো। খরচ করার আর কিছু নেই তোমার।'

ভাঁজ করা হাঁটু দুটোর মাঝখানে মাথা নিচু করলো হারমোড। খানিক পর মুখ তুলে বললো, 'প্রস্তাবটা কি?'

'তোমাকে যুক্তরাষ্ট্রে পাঠাবার অনুরোধ বাতিল করা হবে।'

'আমি চাই আমার বিরুদ্ধে বাকি সব অভিযোগও তুলে নেয়া হোক।'

'সেটা আমার ব্যাপার নয়, কালভো। ওদিকটা তোমার সামলাতে হবে নিজের লোকদের সাহায্য নিয়ে।'

খানিক পর মাথা ঝাঁকালো হারমোড। 'কি জানতে চান আপনারা?'

'নামটা। খুন করার নির্দেশ দিয়েছিল যে লোক।'

হাসলো হারমোড। 'আপনারা আসলে কোনো পুরুষকে খুঁজছেন

না,' বললো সে। 'তার নাম লুসিয়া সানসেজ। ওরা তাকে লা ব্লাংকা বলে—হোয়াইট লেডি। কিন্তু আসলে সে কালো।'

'কোথায় পাওয়া যাবে তাকে?' জানতে চাইলো রানা, ওর প্রথম প্রশ্ন।

মেঝেতে বসেই কাঁধ ঝাঁকালো হারমোড। 'শহরে তার অ্যাপার্টমেন্ট আছে, সেখানে খোঁজ নিয়ে দেখতে পারেন,' বললো সে। 'তার বাড়ি অবশ্য এনভিগাডোয়। একটা শ্যালে আছে মানিজালেস-এ। কিংবা তার বোগোটার বাড়িতে খবর নিতে পারেন। বোগোটার বা পোর্ট-অ-প্রিন্স-এর বাড়িতে।'

'আন্দাজ করো,' বললো রানা। 'নির্ভুল হওয়া চাই।'

'শুনেছি শহরেই নাকি আছে সে।'

লুসিয়া সানসেজ, দি হোয়াইট লেডি, তার অ্যাপার্টমেন্টে না থাকলেও, কামরাগুলো দেখে আভাস পাওয়া গেল কিছুক্ষণ আগেও এখানে ছিলো সে। বিল্ডিংটা নাটিবারা পাহাড়ের কাছে, সতেরোতলা, প্রতিটি তলা থেকে রিয়ো মেডিলিন দেখা যায়। নিরাপত্তার ব্যবস্থা বলতে একজন মাত্র বুড়ো লোক লবিতে পাহারায় আছে, অ্যাপার্টমেন্টের দরজায় সাধারণ একটা কী অ্যালার্ম। ঠিক বুঝতে পারলো না রানা, কারণটা স্রেফ অবহেলা, নাকি ধরে নেয়া হয়েছে তাকে স্পর্শ করতে পারে এমন বাপের ব্যাটা এখনো কলম্বিয়ায় জন্মায়নি?

এরা কাউকে ভয় করে বলে মনে হয় না, শুধু পরস্পরকে বাদে। প্রত্যেকের সাথে এক বা একাধিক পিস্তোলেরস অর্থাৎ পিস্তলবাজ থাকে, এ থেকেই বোঝা যায় প্রতি মুহূর্তে বিপদের আশংকা আছে। লুসিয়া সানসেজ কার্টেলের দ্বিতীয় সারিতে পড়ে, মর্যাদা অনুসারে

প্রাপ্য লাভ ও সুবিধে পুরোপুরি ভোগ করে সে। সাধারণত সাবেক এক ফুটবল তারকার সাথে চলাফেরা করতে দেখা যায় তাকে, নাম অ্যাভারতি হুয়ারেজ। সাথে দু'জন বডিগার্ড থাকে, পাশ ছেড়ে বড় একটা নড়ে না। তাদের মধ্যে একজন হণ্ডুরান, ভালো হাত পাকিয়েছে খুন-খারাবিতে। অপর লোকটা আদিবাসী ইণ্ডিয়ান, ম্যাচেটি চালনায় তার খ্যাতি আছে।

ম্যাচেটিটা আসলে লোক দেখানো ব্যাপার, বলা হয়েছে রানাকে। কাউকে যদি স্রেফ খুন করার দরকার হয়, আঘাতটা করা হবে আধুনিক কোনো পদ্ধতিতেই, সাধারণত ইয়ামাহা বাইকের পিছন থেকে। আর যদি কাউকে মেসেজ পাঠাবার বা দৃষ্টান্ত স্থাপনের দরকার হয়, ইণ্ডিয়ান লোকটা তখন তার ম্যাচেটি ব্যবহার করবে—একেকবারে একটা করে টুকরো কেটে নেবে সে। নির্দিষ্ট কিছু টুকরো পাঠিয়ে দেয়া হবে লোকটার পরিবারে, বাকিগুলো উপহার দেয়া হবে তার গার্লফ্রেণ্ডকে।

টেবিলে বসে আপোস রফায় ব্যর্থ হলে, প্রতিপক্ষরা যখন হুমকি হয়ে দাঁড়ায়, ডাক পড়ে হণ্ডুরানের। সিক্রেট পুলিশ, ডি. এন. আই.-এ চাকরি করেছে সে, এক্সপ্লোসিভ এক্সপার্ট হিসেবে। হোয়াইট লেডির কাজ করতে এসেছে দ্বিগুণ বেতনে। উপরি পাওনা কোকেন আর নিত্য নতুন মেয়েমানুষ। সাধারণত অবসরকালীন ভাতাদি একজন বিস্ফোরক বিশেষজ্ঞের প্রথম উদ্বেগ নয়।

হণ্ডুরানের প্রথম প্রেম সি-ফোর। কারণটা বুঝতে পারে রানা। যে কোনো সন্ত্রাসী তৎপরতায় সি-ফোর বা প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভ অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য, ব্যবহার করা সহজ, সহজ বহন করাও। জিনিসটা পুটিং-এর মতো, যে-কোনো আকৃতি দেয়া যায়। চ্যাপ্টা করে নাও, একটা খামে ভরতে পারবে, তৈরি হয়ে গেল লেটার বম। যে-কোনো

আবহাওয়ায় দীর্ঘদিন, মাস বা বছর রেখে দিলেও সি-ফোর নষ্ট হয় না, গুণগত মান একইরকম থাকে।

হণ্ডুরানের মতো রানাও সি-ফোর পছন্দ করে। চারটে কামরার সব ক'টাতে জিনিসটা লুকালো রানা, বেশি করে রাখলো লিভিংরুম, পাশের ডাইনিংরুম আর কিচেনে। অ্যাপার্টমেন্টটা অত্যন্ত রুচিকর-ভাবে সাজানো। লিভিংরুমের গোটা একটা দেয়াল জুড়ে শোভা পাচ্ছে ম্যাডোনোর পেইন্টিং। ফার্নিচারগুলো বেশিরভাগই দুধসাদা। বেডরুমে রয়েছে নগ্ন একটা নারীমূর্তি, শ্বেতপাথরের। টেবিল আর শেলফে রাখা মদের বোতল আর গ্লাসগুলো যে-কোনো বিলাসী ধন-কুবেরকেও ঈর্ষান্বিত করবে। বিরাট একটা কাঁচের দরজা দিয়ে টেরেসে যাওয়া যায়, কাঁচটা বুলেটপ্রুফ।

কালভিনের কাছ থেকে রানা জানতে পেরেছে, লুসিয়া সানসেজ প্রায় এক দশক হলো কোকেন ব্যবসার সাথে জড়িত। আর সবার মতোই শুরু করেছিল সে ; খেটে খাওয়া একটা মেয়ে, এমন একজনকে ভালোবাসে যার সাথে পুলিশের সম্পর্ক ভালো নয়। প্রেমিক গ্রেফতার হলো, বিচারের জন্যে তাকে আনা হলো কোর্টে। প্রেমিকা ওয়েটিং-রুমে বসে আছে, এই সময় উদয় হলো রহস্যময় এক লোক। সে জানালো, বিচারকের সাথে তার খাতির আছে, লুসিয়া অনুরোধ করলে তার প্রেমিকের জন্যে চেষ্টা করতে পারে সে, যদি লুসিয়া তার একটা উপকারে আসে।

এভাবেই নতুন পরিচয় পেলো লুসিয়া সানসেজ—বাহক। জানা যায়, কোকেন নিয়ে পঁচিশবার যুক্তরাষ্ট্রে গেছে সে, একবারও ধরা পড়েনি। নতুন নতুন কৌশলে কোকেন বহন করতো সে। একবার নাকি কোকেন ভরা একশোটা কনডোম গিলে ফেলে, তারপরও তার

চেহারায় ভয়ের লেশমাত্র ছিলো না। কনডোমগুলো পেটের ভেতর ছিঁড়ে গেলে মৃত্যু যন্ত্রণাটা কি ভয়াবহ হতো ভাবাই যায় না।

সত্তর দশকের মাঝামাঝি সময়, কলম্বিয়ার ড্রাগ ব্যবসায়ীরা তখনো সুসংগঠিত নয় বলে, লুসিয়ার মতো একটা মেয়ের পক্ষে উন্নতি করা সম্ভব হলো। অন্যের কোকেন বহন করা ছেড়ে দিয়ে নিজেই ব্যবসায় নেমে পড়লো সে। কোর্ট আর ট্যুরিস্ট হোটেল থেকে নিজের জন্যে বাছাই করলো সাহসী কয়েকজন বাহককে।

কিছুদিন পর দেখা গেল, ধর্মীয় শিল্পকর্ম নিয়ে ব্যবসা ফেঁদে বসেছে লুসিয়া সানসেজ। ক্রুশবিদ্ধ যিশু আর ভার্জিন মেরীর মূর্তি বিক্রি করে তার কোম্পানী। ফ্লোরিডায় তার অ্যাসেম্বলি প্ল্যান্টে হানা দিলো পুলিশ, ব্যবসাটা বন্ধ হয়ে গেল। একের পর এক নতুন ব্যবসা ধরলো লুসিয়া —কলম্বিয়া-পূর্ব যুগের মৃৎশিল্পে কোকেন ভরলো, কোকেন ভরলো সাপের পেটে, রফতানীযোগ্য মূল্যবান কাপড়ের চওড়া পাড়ে ব্যবহার করলো কোকেনের জমাট সলিউশন।

আশির দশকের শুরুতে মন্দা দেখা দিলো ব্যবসায়, সেই সাথে মাথা চাড়া দিলো কার্টেল প্রথা। ফ্রি ল্যান্সারদের জন্যে সাপ্লাই কমে গেল, কারণ বড় অপারেটররা যেখানে যতো কোকেন পাওয়া যায় সব কিনে নিতে শুরু করলো। রফতানী বাজার থেকে ধীরে ধীরে সরিয়ে দেয়া হলো লুসিয়াকে, বাধ্য হয়ে স্থানীয় বাজারের জন্যে ব্যবসা শুরু করতে হলো তাকে। কিছু এলাকা তার নিয়ন্ত্রণে ছেড়ে দেয়া হলো, নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখাটা অবশ্য তার দায়িত্ব।

নিজের স্বার্থরক্ষায় পুরোপুরি সফল হলো লুসিয়া। যে-কোনো পুরুষের মতোই নিষ্ঠুর ও কৌশলী হিসেবে নাম কিনলো সে। কোনো প্রতি-দ্বন্দ্বী বা শত্রু যদি তার প্রতি সম্মান না দেখায়, বিরাট ক্ষতি স্বীকার

করে বুঝতে পারবে ভুলটা কোথায় করেছিল সে। ভুল বুঝতে পারার সুযোগ সবাই পায় না, বেশিরভাগই খুন হয়ে যায়।

এ-ধরনের কোনো ভুল করার ইচ্ছে রানার নেই। লুসিয়ার অ্যাপার্টমেন্টে কাজ সেরে রাস্তার উল্টোদিকে, সরাসরি সামনের একটা বিল্ডিঙে চলে এলো ও। দুটো বিল্ডিঙের কাঠামো একই ধরনের, দ্বিতীয়টাও সম্ভবত অ্যাপার্টমেন্ট ভবন হিসেবেই তৈরি করা হচ্ছে, তবে বিশ কি তিরিশ ফুট খাটো। শ্রমিকরা আজকের মতো বিদায় নিয়েছে, খাঁ-খাঁ করছে গোটা বিল্ডিং।

অন্ধকার হতে এখনো এক ঘণ্টা দেরি আছে, সেজন্যে ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিলো রানা। বিল্ডিঙের পাশে এলিভেটর আছে, ব্যবহারের জন্যে জেনারেটর চালু করার ঝুঁকি নিতে হবে। তা না করে, হাতে তৈরি বাঁশের ঢাল বেয়ে উঠলো রানা, কয়েকবারে। হাত আর মাথার ব্যথাটা বাড়লো ওর। ঝুঁকিও কম নয়, কারণ কলম্বিয়ায়, বাংলাদেশের মতোই, নিরাপত্তার মানদণ্ড বলে কিছুর অস্তিত্ব নেই। একটা করে বাদ দিয়ে প্রতি তলায় ডেক বা নেট থাকা উচিত, কিন্তু নেই, যে-কোনো ছাদ থেকে খসে নিচে পড়ার প্রচুর সম্ভাবনা লুকিয়ে আছে।

তেরোতলায় উঠে একটা জায়গা পছন্দ হলো রানার। দেয়াল তোলা হয়েছে, ছাদও আছে, শুধু জানালায় কাঁচ বা কবাট নেই। এই একটা ফ্লোরে সম্প্রতি কোনো কাজ করা হয়নি, অন্তত বর্তমানে করা হচ্ছে না। আবার মই বেয়ে নিচে নামতে হলো ওকে।

কতোক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে ধারণা নেই রানার। নিচে নেমে এসে একটা রেস্তোরাঁয় ঢুকলো ও, রাস্তার দিকে মেঝে থেকে সিলিং পর্যন্ত কাঁচ ঢাকা জানালা ওটার একটা বৈশিষ্ট্য, ভেতরে বসে রাস্তার উল্টোদিকে লুসিয়ার অ্যাপার্টমেন্টটা দেখতে পাওয়া যায়। সন্ধ্যের

আগে পৌঁছুতে পারায় যে-টেবিলটা দরকার সেটাই পেলো ও। জার্মান খাবার পরিবেশন করা হয় এখানে, কলম্বিয়ান কোনো ওয়াইন পাওয়া যায় না।

ফল আর কফি নিয়ে দু'ঘণ্টা পার করে দিলো রানা। কালভিনকে কিছু জানায়নি ও, তবে সে যে কিছু আন্দাজ করতে পারেনি তা নয়। জানায়নি, কারণ ঘটনাটা যদি মারাত্মক কোনো দিকে মোড় নেয়, সংশ্লিষ্ট থাকার কথা সরাসরি অস্বীকার করবে ডি. ই. এ.। রানার শুধু একটা দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে, কেউ যেন ওকে দেখতে না পায়।

আরো দশ মিনিট কাটলো। বিল মিটিয়ে দিয়েছে রানা, একটা কিউবান সিগার ফুঁকছে, এই সময় তুষারধবল একটা সিলভার শ্যাডো ঠিক যেন পাপ আর অনাচারের বিজ্ঞাপন হিসেবে উদয় হলো রাস্তায়। ওটার পিছু পিছু, বিল্ডিঙের পিছন দিকের গ্যারেজে ঢুকলো গাঢ় নীল একটা হোণ্ডা প্রিলিউড।

কালভিন ওকে একটা চেরোকী দিয়েছে, জানালায় টিনটেড কাঁচ। স্টার্ট দিয়ে রাস্তা বদল করে পাশের লেনে চলে এলো ও, পার্কিং লটের উল্টোদিকটা এখান থেকে পরিষ্কার দেখা যাবে।

চারজন ওরা। মেয়েটার পরনে সাদা ওয়েট স্যুট বলে মনে হলো, সম্ভবত আটশো ডলার দিয়ে কেনা, মেয়ে অ্যাথলেটদের জন্যে সর্বশেষ ফ্যাশন। কালভো ঠিক বলেনি, লুসিয়া সানসেজ ঠিক কালো নয়, শ্যামলা। তার চোয়ালের চ্যাপ্টা হাড় আর চওড়া মুখ দেখে বুঝতে অসুবিধে হয় না শরীরে ইণ্ডিয়ান রক্ত আছে। কালো চুল। ঠোঁটে এমন একটা শেড ব্যবহার করা হয়েছে, দূর থেকে কালচে লাগলো। চোখ দুটো দেখার সুযোগ হলো না রানার, তবে আন্দাজ করলো জ্যান্তই হবে।

লুসিয়ার ওপর মনোযোগ, তাই বাকি তিনজনের পরিচয় সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারলো না রানা। ছোটোখাটো লোকটা, হাসিখুশি ভাব নিয়ে হাঁটছে, শরীরটা নিরেট পাথর যেন, পরনের কাপড়চোপড় সাধারণ কিন্তু দামী, সম্ভবত ফুটবল তারকা হবে—অ্যাভারতি হুয়ারেজ। হোয়াইট লেডির পাশে রয়েছে সে। সামনে আর পিছনে পাহারায় রয়েছে দু'জন বডিগার্ড।

কাছাকাছি যেতে চায় না রানা, দূর থেকেই দেখলো অ্যাপার্টমেন্ট ভবনের লবিতে ঢুকলো দলটা। উত্তেজিত অবস্থায় অপেক্ষা করছে ও, খানিক পর গাড়িতে বসেই দেখতে পেলো লুসিয়া সানসেজের অ্যাপার্টমেন্টে আলো জ্বলে উঠলো। রানা ভাবলো, দু'হপ্তা চারদিন আগে কেউ একজন, সম্ভবত হুণ্ডুরান ব্যাটা, রাস্তায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল ওর স্যুইটে কখন আলো জ্বলে ওঠে দেখার জন্যে।

চেরোকি নিয়ে আরেক রাস্তায় চলে এলো রানা, খানিকটা এগিয়ে একটা ফার্মেসীর পাশে গাড়ি থামলো। ফার্মেসীর ভেতর, দরজার কাছেই ফোনটা। লুসিয়া সানসেজের নম্বরে ডায়াল করলো ও।

তিন বার রিঙ হবার পর রিসিভার তুলে এক লোক হেঁড়ে গলায় বললো, 'হুয়ারেজ।'

তারমানে ফুটবলার। রানা বললো, 'সিনোরিটা সানসেজকে দরকার আমার।'

লোকটা ওকে পাত্তা দিলো না। জানতে চাইলো, 'কে কথা বলছে, কি দরকার?'

'হোয়াইট লেডিকে বলো আমি মাসুদ রানা,' বললো রানা। 'আমাকে যদি চিনতে না পারে, বলো আমিই সেই বান্দা যাকে বিষাক্ত ফলটা অফার করা হয়েছিল। বলো, ভূতের সাথে কথা বলার সুযোগ

সব সময় পাওয়া যায় না।'

কথা না বলে মাউথপীসে নিঃশ্বাস ছাড়লো লোকটা। নামটা হয়তো তার জানা। হঠাৎ করে নিঃশ্বাস বন্ধ করলো সে, রিসিভারটা নামিয়ে রাখলো, তবে ক্রেডলে নয়।

অপেক্ষার মুহূর্তগুলো অসহনীয় লাগলো রানার। লুসিয়া সানসেজ কি করবে তার ওপর নির্ভর করছে ওর প্ল্যান আর মেয়েটার জীবন। যে-কোনো পরিস্থিতিতে মাথা ঠাণ্ডা রেখে সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা রাখে মেয়েটা, কিন্তু এই মুহূর্তে যদি তার ব্যত্যয় ঘটে, মারাত্মক পরিণতির দিকে মোড় নেবে ঘটনা। এক দুই করে প্রায় ষাট সেকেণ্ড গুণে ফেললো রানা, তারপর মৃদু নারীকণ্ঠ শুনতে পেলো।

মধুর বলা যাবে না, তবে যৌনাবেদনে কোনো কমতি নেই তার কণ্ঠস্বরে। 'হ্যালো?'

'ভালো তো, লা ব্লাংকা?' স্প্যানিশ ভাষায় জিজ্ঞেস করলো রানা।

'বলা হয় আত্মারা নাকি যে-কোনো ভাষায় কথা বলতে পারে। তবে বিদেশী উচ্চারণে স্প্যানিশ বলার দরকার নেই। তুমি ইংরেজিতে বলো, মিঃ মাসুদ রানা।'

'ধন্যবাদ,' বললো রানা। 'তোমার সাথে আমার কিছু জরুরী কথা হওয়া দরকার।'

গলা শুনে মনে হলো সামান্য হাসলো মেয়েটা। 'কি কথা?'

'আমার বিশ্বাস, তুমি অত্যন্ত বুদ্ধিমতী ব্যবসায়ী। হিসাবে গরমিল ধরা পড়লে তুমি নিশ্চয়ই তা শুধরে নিতে চাইবে। তোমার কাছে কিছু পাওনা আছে আমার। অনুরোধ করছি, দেনাটা শোধ করো।'

হেসে উঠলো হোয়াইট লেডি। স্বতঃস্ফূর্ত, হৃদয় থেকে উথলে ওঠা আনন্দ ধারা। 'কিন্তু, মিঃ রানা, আমরা বোধহয় দুটো আলাদা ব্যবসায়ে

আছি।'

'হয়তো তাই, লা ব্লাংকা। কিন্তু পরস্পরকে আমরা চিনেছি।'

'তুমি যদি আমাকে চিনেই থাকো, তো কি হলো?'

'চিনি বলেই জানি, তুমি জানো কে আমাকে খুন করার নির্দেশ দিয়েছে,' বললো রানা। 'আগেই সাবধান করে দিচ্ছি, উত্তর না দিলে খুব তাড়াতাড়ি মারা যাবে তুমি।'

আবার হাসতে শুরু করলো লুসিয়া সানসেজ, তবে সিদ্ধান্ত পাল্টালো। 'তুমি এতোটা নিশ্চিত—তাড়াতাড়ি মারা যাবো আমি?'

'প্লিজ, টেরেসের জানালা দিয়ে একবার বাইরে তাকাও,' বললো রানা। 'পর্দা থাকলে সরিয়ে দাও।'

'সরানোই আছে।'

পকেট থেকে হাতটা বের না করেই রেডিও-নিয়ন্ত্রিত ডিটোনেটরের বোতামে চাপ দিলো রানা। শব্দটা পেলো ও, পাশের বাড়িতে যেন একটা দরজা বন্ধ হলো, তবে ফার্মেসীতে ভেতর থেকে দেখতে পেলো না কিছুই।

দেখার দরকারও নেই। যা দেখার দেখতে পাচ্ছে হোয়াইট লেডি। আড়াই শো গজ দূরে, টেরেসের সরাসরি উল্টোদিকে, আধা তৈরি বিল্ডিঙের তেরোতলাটা অকস্মাৎ বিস্ফোরিত হলো। সময়ের একটা হিসাব করে চুপ থাকলো রানা, তারপর বললো, 'স্রেফ একটা নমুনা, লা ব্লাংকা। ঠিক জবাবটি না পেলে এরকম আরো ঘটনা ঘটবে।'

'হুঁ, বুঝতে পারছি,' উত্তেজনায় ফিসফিস করে বললো লুসিয়া সানসেজ।

'কিন্তু বুঝতে পারছো কি যে এরপর ঘটনাটা ঘটবে তোমার খুব কাছাকাছি?'

হোয়াইট লেডি তার ব্যক্তিত্ব বজায় রাখলো। শান্ত গলায় জিজ্ঞেস করলো, 'আমাকে তা বিশ্বাস করতে হবে ?'

'লা ব্লাংকা সি-ফোরে বিশ্বাস করে,' বললো রানা। 'আমি জানি।'

লুসিয়া কিছু বললো না।

'বোকার মতো মৃত্যুকে ডেকে এনো না। আমার কথা শোনো, বেঁচে যাবে—কথা দিচ্ছি। তোমার অ্যাপার্টমেন্টে যে চার্জগুলো বসিয়েছি, ওগুলো মোশন সেনসিটিভ। কোনো অবস্থাতেই ওগুলোকে ডিসটার্ব করা যাবে না। অ্যাপার্টমেন্টের ভেতর থাকতে হবে তোমাদের, কারণ দরজা খুললে বিস্ফোরণ ঘটবে। এমনভাবে তার জড়ানো হয়েছে, করিডরের দিকে দরজাটা দ্বিতীয়বার খুললে চার্জগুলো অ্যাকটিভেট করা হবে। ভেতরে থাকো তোমরা, বেশি নড়াচড়া করো না।'

'কাওয়ার্ড,' বললো লুসিয়া।

'আমার একটা নাম দরকার, লা ব্লাংকা।'

'নামটা পেয়ে তোমার কোনো লাভ হবে না জেনেও ?'

'লাভ হবে কিনা আমাকে বুঝতে দাও।'

অপরপ্রান্তে চুপ করে থাকলো লুসিয়া। তারপর জানতে চাইলো সে, 'নামটা না হয় পেলে, তারপর ? আমি বেরোবো কিভাবে ?'

'তোমাকে বেরোতে হবে না, সরকারী লোকেরা বের করে আনবে।'

'তারমানে কি আমাকে গ্রেফতার করা হবে ?'

'কার্টেলের জন্যে গ্রেফতার হওয়া কোনো ব্যাপার ? চোদ্দ শিঁক থেকে কিভাবে বেরোতে হয় তোমরা তা ভালো জানো।'

আবার কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলো লুসিয়া। 'উত্তরটা যদি আমার জানা না থাকে ?' অবশেষে ফিসফিস করে জানতে চাইলো সে।

'সেক্ষেত্রে,' মিথ্যে ভয় দেখালো রানা, 'চার্জগুলো আমি ফাটিয়ে

দিতে বাধ্য হবো।'

এবার লুসিয়ার নিঃশ্বাসের শব্দও পেলো না রানা। কোনো সন্দেহ নেই, ভয় পেয়েছে, অন্তত গলার আওয়াজ শুনে তাই মনে হলো। 'তুমি আসলে, আমার ধারণা, গাদ ইরেজকে খুঁজছো।'

'কে সে?'

'তাকে একজন ফাইন্যানসিয়ার বলা হয়।'

'ব্যাংকার?'

শান্ত, আত্মবিশ্বাসী ভাবটা সামান্য হলেও ফিরে পেয়েছে লুসিয়া সানসেজ। 'হ্যাঁ,' বললো সে। 'তা বলতে পারো।'

'সে কি মেডিলিনে বাস করে?'

'আর সব ব্যাংকারদের মতো।'

'ধন্যবাদ,' বললো রানা, 'লা ব্লাংকা।'

'এনি টাইম,' বললো লুসিয়া। 'ধরে নাও ব্যবসার খাতিরে পরস্পরকে আমরা সাহায্য করলাম।'

'এরপর কি করতে হবে, মন দিয়ে শোনো,' বললো রানা। 'আমি মিথ্যে ভয় দেখাইনি, অ্যাপার্টমেন্ট থেকে বেরোতে চেষ্টা করলে সত্যি তোমরা মারা পড়বে। যে যেখানে আছো, কেউ নড়াচড়া করো না। আধঘণ্টার মধ্যে ডি. এ. এস.-এর লোকজন, সাথে একজন বিস্ফোরক বিশেষজ্ঞ নিয়ে, তোমাদের তেরোতলায় উঠবে। ফোন করে তাদেরকে ঠিকানাটা দিতে যাচ্ছি আমি। ঠিক আছে?'

কোনো জবাব না দিয়ে রিসিভার নামিয়ে রাখলো লুসিয়া সানসেজ।

ডি. এ. এস. হেডকোয়ার্টারের নম্বরে ডায়াল করলো রানা, যোগাযোগ পাবার জন্যে অপেক্ষা করছে, হঠাৎ শিউরে উঠলো। বিস্ফোরণের ভোঁতা আওয়াজটা চিনতে ভুল হয়নি ওর।

মনটা খারাপ হয়ে গেল রানার। গ্রেফতার এড়াবার জন্যে একা আত্মহত্যা করেনি লা ব্লাংকা, সহমরণে বাধ্য করেছে আরো তিন-জনকে।

আট

'গাদ ইরেজ? তাঁর যে মর্যাদা বা স্ট্যাণ্ডার্ড, তিনি কোনো বাজে কাজের সাথে জড়িত থাকতে পারেন না!' টেলিফোনে বললেন আলিজান আকরাম। 'আমি তাঁকে অত্যন্ত সম্মানী ব্যাংকার হিসেবে চিনি। তারচেয়ে বড় কথা, তিনি একজন ইহুদি।'

'সম্ভবত সরাসরি জড়িত নন,' বললো রানা। 'তবে জানেন নির্দেশটা কোত্থেকে দেয়া হয়েছে। তিনিও সমান দায়ী, আমি বলবো।'

'তোমার ধারণা, এই সুতো ধরে হের মুয়েলার পর্যন্ত যাওয়া যাবে?'

'হ্যাঁ।'

কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে থাকার পর আলিজান আকরাম বললেন, 'মুয়েলারদের সম্পর্কে আরো কিছু তথ্য পেয়েছি আমি। শহরের এক-জন ল-ইয়ারের সাথে কথা হয়েছে আমার, অনেক দিন ধরে চিনি তাকে। মুয়েলার পরিবারের কিছু কিছু কাজ করেছে সে। বিশেষ করে

ছেলেটা সম্পর্কেই বললো।'

'কি বললো ?'

'তোমাকে মারার জন্যে বোমাটা যেদিন ফাটানো হলো, ওই একই দিনে ববি মুয়েলারের লাশ কলম্বিয়ায় পৌঁছায়,' বললেন আলিজান আকরাম। 'তাকে মাটি দেয়া হয় বাড়িতে। তার বন্ধু-বান্ধবের সংখ্যা অনেক হলেও, পরিবারের বাইরে, খুব কম লোককেই উপস্থিত থাকার অনুমতি দেয়া হয়। শহরের বাইরে থেকে প্রিস্টকে আনিয়ে কাজটা সারে ওরা।'

'ওরা বোধহয় রলফ মুয়েলার ও তাঁর এস্টেট-এর কাছাকাছি কাউকে ঘেঁষতে দিতে চায় না।'

'বোধহয়। আরো জানা গেছে, মাটি দেয়ার পরপরই গোটা পরিবার এস্টেট ত্যাগ করে। কেয়ারটেকার ছাড়া আর কেউ নেই সেখানে। ধারণা করা হচ্ছে, দেশের বাইরে চলে গেছে মুয়েলাররা। কথাটা কতোটুকু সত্যি আমি জানি না।'

এতো জানা কথা, ভাবলো রানা, মুয়েলার যদি মুলার হন, সম্ভাব্য সব রকম সাবধানতাই অবলম্বন করবেন তিনি। 'তাহলে গাদ ইরেজ ছাড়া এই মুহূর্তে আমাদের হাতে আর কেউ নেই।'

রিসিভারে দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস ছাড়লেন বৃদ্ধ। 'তুমি চাও, এ-ব্যাপারে আমি কিছু করি ?'

'খুব উপকার হয় আপনি যদি তাঁর সাথে আমার একটা সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করতে পারেন,' বললো রানা। 'আপনি তাঁকে ডাকলে তিনি কি আসবেন ?'

'বোধহয়.' বললেন আলিজান আকরাম। 'আসার তো কথা।'

'কি হলো আপনি তাহলে জানাবেন আমাকে।'

'ঠিক আছে,' বললেন বৃদ্ধ। 'বাড়িটা কেমন, তোমার পছন্দ হয়েছে?'

'খুব ভালো, মিঃ আকরাম।'

'তোমার জন্যে আরো একটা বাড়ি ঠিক করে রেখেছি আমি,' জানালেন বৃদ্ধ। 'কাল থেকে ব্যবহার করতে পারবে। ইকুইপমেন্ট-গুলোও পেয়ে যাবে।'

'ধন্যবাদ, মিঃ আকরাম।'

'দে নাদা,' বললেন তিনি, যেন ব্যাপারটা সত্যি কিছু নয়।

'রানা, কোথায় তুমি?'

বন্ধু টমাস কালভিনকে আপন ভাইয়ের মতো ভালোবাসলেও, তাকে সেফ হাউসের ঠিকানা দিতে রাজি নয় রানা। 'সব ঠিক আছে, টমাস। মিশন সফল হয়েছে।'

'সে-কথা আমি জানতে চাইছি না,' বললো কালভিন। 'শালার রেডিওতে ব্যাপারটা প্রচার করা হয়েছে।'

'হোক।'

'কি ঘটেছে বলবে আমাকে?'

'আর কিছু জানতে চেয়ো না,' বললো রানা। 'তোমার জন্যে বিপদ ডেকে আনতে পারে।'

'বিপদ? আমার? রানা, ধরতে পারলে তোমাকে ওরা দু'বার ফাঁসি দেবে, তা জানো?'

'আমাকে ওরা ধরতে পারবে না, টমাস।'

'ফর গডস সেক, আমি পুলিশের কথা বলছি না। বলছি ক্রিমিন্যাল-দের কথা। নিঃসঙ্গ একজন বিদেশী, এ-দেশে যার কোনো সাপোর্ট নেই, অনায়াসে খুঁজে বের করে ফেলবে ওরা।'

'হ্যাঁ, তা ফেলতে পারে।'

রানার উত্তর উপলব্ধি করার জন্যে কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে থাকলো কালভিন। 'তারমানে বলছো, সে-কথা মনে রেখে গা-ঢাকা দেয়ার ব্যবস্থা তোমার করা আছে?'

এ-প্রশ্নেরও উত্তর দিতে চাইলো না রানা, ফোনে বেশিক্ষণ কথা বলারও ইচ্ছে নেই। কেউ ওদের কথা শুনছে কিনা, কি ধরনের ইকুইপ-মেণ্ট ব্যবহার করা হচ্ছে, কিছুই জানা নেই। 'আমি যোগাযোগ করবো, টমাস।'

'আমাকে তুমি সব জানাবে, রানা,' দাবির সুরে বললো কালভিন।

'অবশ্যই।'

পরদিন শনিবার, আলিজান আকরামের সাথে শহরের দক্ষিণ প্রান্তে দেখা করলো রানা। প্রতিষ্ঠানটার নাম মডার্ন ইলেকট্রনিক্স। অফি-শিয়ালি অবসর নিলেও, তিনতলায় নিজের জন্যে একটা কামরা রেখে-ছেন আলিজান আকরাম, মাঝে মধ্যে এসে দেখে যান তাঁর লোকজন কিভাবে চালাচ্ছে ব্যবসাটা। ডেস্কের পিছনে বসে রানার জন্যে অপেক্ষা করছিলেন তিনি।

'কি বলেছেন তাঁকে, মিঃ আকরাম?' হ্যাণ্ডশেক করার পর বসলো রানা।

'খুব জরুরী একটা বিষয়ে আলাপ আছে,' অস্বভাবিক ভারি গলায় বললেন বৃদ্ধ, ভাবটা যেন ঠিক এই সুরেই গাদ ইরেজকে কথাটা বলে-ছেন তিনি। 'ইনভেস্টমেণ্ট অ্যাডভাইজাররা হঠাৎ করে এ-ধরনের অনুরোধ পেতে অভ্যস্ত।'

'তাহলে কয়েক মিনিট তাঁর সাথে কথা বলতে পারবেন আপনি?'

'অনায়াসে।'

'টিনটো অফার করুন,' বললো রানা। 'পৌঁছুনোর সাথে সাথে।'

'এমনিতেও করবো।'

'কফির সাথে এই ট্যাবলেটটা খাইয়ে দেবেন।'

নীল পিলটা হাতের তালুতে নিয়ে দেখলেন আলিজান আকরাম। 'জিনিসটা কি?'

'আগে এটাকে মিকি বলা হতো,' জানালো রানা। 'তবে উপাদান-গুলো বদলে ফেলা হয়েছে। পঁয়তিরিশ মিলিগ্রাম ডাইয়াজেপাম থাকায় কোনো প্রতিক্রিয়া ছাড়াই সচেতনতা ফিরে আসবে তাঁর। সাধারণত ট্যাবলেটটা খেলে মনে খুব ফুর্তির ভাব আসে।'

'তারপর তুমি তাঁকে জেরা করবে?'

'হ্যাঁ।'

'কি প্রকাশ করলো, পরে মনে করতে পারবে না?'

'সেদিকটাও লক্ষ্য রাখবো আমি,' বললো রানা, দেখলো বৃদ্ধের চেহারায় উদ্বেগ ফুটে উঠছে। 'তাঁকে আঘাত করা হবে না।'

'কেন আমার খারাপ লাগবে বুঝতে পারছি না,' আলিজান আকরাম বললেন। 'তবে বোধহয় আমরা যে গেস্টাপো নই তা প্রমাণ করার জন্যে সবার সাথেই নরম ব্যবহার করা দরকার। আমি সব রকম নির্যাতনের বিরোধী।'

ড্রাগের প্রতিক্রিয়া শারীরিক নির্যাতনের সমতুল্যও হয়ে উঠতে পারে। রানা ভাবলো, কথাটা আলিজান আকরামকে জানানো বুদ্ধি-মানের কাজ হবে না। ড্রাগটা কি রকম প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করবে তা নির্ভর করে সাবজেক্টের শারীরিক ও মানসিক প্রতিরোধ শক্তির ওপর। লোকটা যদি ইন্টারোগেশন পদ্ধতি সম্পর্কে পরিচিত হয়, সেই সাথে

যদি জীবন দিয়ে হলেও তথ্য ফাঁস না করার ব্যাপারে পণ করে থাকে, তাহলে তথ্য আদায়ের যে-কোনো চেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য, অন্তত দীর্ঘ একটা সময় পর্যন্ত। 'ডাক্তার ভদ্রলোককেও খবর দিন, গাদ ইরেজের জ্ঞান ফিরে আসার সময় তিনি উপস্থিত থাকলে ভালো হয়। তিনি জানাতে পারবেন, আসলে শারীরিক কোনো কারণে বেহুঁশ হয়ে পড়েছিলেন ইরেজ। আপনার ডাক্তার কাজটা করবেন তো?'

'আমি যা বলবো তাই করবে সে,' বললেন আলিজান আকরাম। 'নাৎসীরা ওর গোটা পরিবারকে মেরে ফেলে।'

'তাকে আপনি কতোটুকু বলেছেন?'

'প্রায় কিছুই না। আমি অনুরোধ করায় সে কোনো প্রশ্ন তোলেনি।'

'তাহলে আর দেরি করার মানে হয় না, মিঃ আকরাম।'

পনেরো মিনিট পর আর্থিক পরামর্শ দেয়ার জন্যে উপস্থিত হলেন গাদ ইরেজ। পাশের কামরার জানালা থেকে তাঁকে অফিস বিল্ডিঙে ঢুকতে দেখলো রানা। চল্লিশ কি পঁয়তাল্লিশ বছর বয়স হবে, অত্যন্ত দামী স্যুট পরে আছেন, মাথার মাঝখানে সিঁথিটা সরলরেখার মতো, চোখে বড় আকারের চশমাটা নাকের ওপর ঠিকমতো বসেনি। গাড়ি থেকে নেমে দৃঢ় পদক্ষেপে, শান্ত ভঙ্গিতে হেঁটে এলেন তিনি।

খালি অফিস বিল্ডিঙে একাই এসেছেন ভদ্রলোক। এখনো পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে না, ড্রাগ ব্যবসার সাথে তিনি জড়িত কিনা। সাথে বডিগার্ড নেই, এতে হয়তো কিছুই প্রমাণ হয় না। তিনি জানেন, আলিজান আকরাম আইনের লোক নন।

বিশ মিনিট পর আলিজান আকরামের অফিস কামরায় ঢুকে রানা দেখলো, গাদ ইরেজ জ্ঞান হারিয়েছেন। রানা আগেই অনুরোধ করে-

ছিল, লক্ষ্য রাখতে হবে কফিটুকু যেন ইরেজ চেয়ারে বসে পান করেন। কিন্তু নীল কার্পেটে তাঁকে হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে থাকতে দেখে বোঝা গেল, ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে আলাপ করতে পছন্দ করেন। ডেস্কের সামনে একটা টেবিলে রয়েছে কাপটা, এখনো সেটায় যথেষ্ট টিনটো দেখলো রানা।

ভদ্রলোককে তুলে লম্বা একটা ইজিচেয়ারে শুইয়ে দিলো রানা। নাড়াচাড়া করায় তাঁর জ্ঞান ফিরে এলো না। তবু, সাবধানের মার নেই ভেবে, ইন্টারোগেশন কিট থেকে সরঞ্জাম বের করে একটা ইঞ্জেকশন দিলো রানা। পাঁচ মিনিট পর আরেকটা। শেষেরটা ট্রুথ সেরাম বলা ঠিক হবে না, ওটার কাজ হালকা ঘুম আনা। একজন মানুষ যতোই অসচেতন পর্যায়ে যায়, সত্যি কথা বলার ঝোঁক ততোই বাড়ে। জ্ঞান ফিরে পাবার সময়টা কমবেশি করা যায় হিপনোসিসের সাহায্যে।

ওর উদ্বেগ একটাই, গলাটা ইরেজের অচেনা, স্প্যানিশ উচ্চারণে বিদেশী টানও থাকবে। ভদ্রলোক সাড়া না-ও দিতে পারেন। তবে সে-ধরনের কিছু ঘটলো না। গাদ ইরেজের জ্ঞান ফিরিয়ে আনলো রানা, তারপর সম্মোহন করে ঘুম পাড়িয়ে দিলো। সহজ প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করলেন না ভদ্রলোক।

সত্যিই তিনি অ্যাভেনিদা লাস ভেগাসের গাদ ইরেজ। মেডিলিন, কলম্বিয়ায় বাস করেন। তাঁর স্ত্রীর নাম এলডা। দুই মেয়ে, এলমা আর সুসা, বয়স ষোলো আর বিশ। মেডিলিন ক্লাব ও ক্লাব দে প্রফেশন্যালস-এর সদস্য তিনি। পেশা, ইনভেস্টমেন্ট কাউন্সিলর।

'ইনভেস্টমেন্ট কাউন্সিলরের কাজটা কি?'

'মক্কেলের টাকা সবচেয়ে লাভজনক খাতে খাটানো,' এতো শান্ত ও নিচু গলায় বললেন ভদ্রলোক, ভান করছেন বলে মনে হলো না।

'এটাও এক ধরনের আর্ট ?'

'হ্যাঁ।'

'আর আপনি তার মাস্টার ?'

স্বপ্নের মধ্যে হাসলেন গাদ ইরেজ। 'আমি প্র্যাকটিস করি,' বললেন তিনি।

'একজনের টাকা আরেকজনের কাছে পৌঁছে দেয়াও কি আপনার কাজের মধ্যে পড়ে ?'

'পড়ে।'

'এ-ধরনের কোনো কাজ, বড় অঙ্কের, ইদানীং করেছেন ?'

'অবশ্যই।'

'ঘুমোচ্ছেন আপনি, সিনর ইরেজ, ঘুমের মধ্যেই থাকুন। আমি চাই এ-ধরনের কাজগুলোর মধ্যে থেকে একটা কাজের কথা বিশেষ-ভাবে স্মরণ করুন আপনি। ঘটনাটা ঘটেছে প্রায় তিন হপ্তা আগে, দু'একদিন কম হতে পারে। কাজটা ছিলো, লুসিয়া সানসেজকে আড়াই লাখ মার্কিন ডলার ডেলিভারি দেয়ার। কাজটার সমস্ত খুঁটি-নাটি আপনাকে মনে করতে হবে।'

'না,' গাদ ইরেজ বললেন।

'মনে করতে পারছেন না ?'

'অঙ্কটা আড়াই লাখ ডলার ছিলো না,' উদ্বেগের সাথে বললেন ইরেজ। 'ওটা হবে সাত লাখ পঞ্চাশ হাজার ডলার।'

হ্যাঁ, তাই তো হবার কথা। খরচ আছে লুসিয়া সানসেজের, মরিস-কে দেয়ার পর নিজের লাভটাও রাখতে হয়েছে। 'এই টাকা কি নগদ ডেলিভারি দেয়া হয়েছে ?'

'আমার হাত দিয়ে নয়,' বললেন ইরেজ। 'তবে নগদই।'

'টাকাটা কার কাছ থেকে এলো ?'

এই প্রথম ভদ্রলোকের চেহারায় ইতস্তত একটা ভাব লক্ষ্য করলো রানা। বার কয়েক কোঁচকালো ভুরু জোড়া। 'ব্যাপারটা গোপনীয়, সিনর।'

'কিন্তু আপনাকে সাহায্য করার জন্যেই লেনদেনটা সম্পর্কে সব কথা জানতে হবে আমার। প্লিজ, সিনর ইরেজ। ঘটনার সাথে জড়িত সমস্ত চিন্তা আর অনুভব আরেকবার স্মরণ করুন।'

'আপনার জন্যে কি তা গুরুত্বপূর্ণ ?'

'হ্যাঁ,' আন্তরিকতার সাথে বললো রানা।

রানার অনুরোধ রক্ষা করার চেষ্টা করলেন ভদ্রলোক। 'সাধারণ একটা লেনদেন ছিলো ব্যাপারটা। সিটাডেল অ্যাকাউন্ট থেকে মিস লুসিয়াকে দেয়া হয় টাকাটা।'

'বুঝলাম,' বললো রানা। 'সিটাডেল অ্যাকাউন্ট অত্যন্ত সেনসিটিভ।'

'হ্যাঁ।'

'অ্যাকাউন্টটার প্রিন্সিপ্যাল কে ?'

উত্তরটা নিয়ে দ্বিধায় ভুগলেন ইরেজ, এক মুহূর্ত পর বললেন, 'সাতেলা আর রুনা লজেন।'

'এরা তো আসলে ভিক্টর লজেনের মা ও বাবা, তাই না ?'

'হ্যাঁ।'

'অ্যাকাউন্টটা কি তাঁরা সরাসরি নিয়ন্ত্রণ করেন ?'

গাদ ইরেজ মৃদু হাসলেন। 'আমার তা মনে হয় না।'

'তাহলে অন্য কোনো উৎস থেকে নির্দেশ ইত্যাদি আসে।'

'বেশিরভাগ সময়।'

'কে দেয় নির্দেশগুলো ?'

'আজকাল ভিক্টর লজেন।'

আর কিছু জানার দরকার নেই রানার।

নয়

'এখনো ব্যাপারটা আমার কাছে অবিশ্বাস্য লাগছে,' বিষণ্ণ চেহারা নিয়ে বললেন আলিজান আকরাম। 'একজন ইহুদি, হতে পারে ধর্মের প্রতি তাঁর বিশেষ কোনো দুর্বলতা নেই, লজেনের মতো একজন ফ্যাসিস্টের সাথে কেন হাত মেলাবেন ?'

'টাকার জন্যে,' বললো রানা।

'ইরেজরা রীতিমতো ধনী পরিবার,' বললেন বৃদ্ধ। 'এই শহরে আমি আসার পর থেকেই দেখছি প্রাচুর্যের মধ্যে বসবাস করছে ওরা।'

'অন্য কোনো কারণও থাকতে পারে,' বললো রানা। 'আপনি চান, তাঁকে আমি জিজ্ঞেস করি ?'

রানার অনুরোধে গাদ ইরেজকে ডেকেছেন বটে, কিন্তু শুরু থেকেই অস্বস্তি বোধ করছেন আলিজান আকরাম। আগেই উপলব্ধি করেছেন, রানার চাপিয়ে দেয়া ভূমিকাটা তাঁকে ঠিক মানায় না। ব্যাপারটা নিয়ে আর নাড়াচাড়ি করার ইচ্ছে তাঁর না থাকলেও, কৌতূহল চেপে রাখতে

পারলেন না। 'হ্যাঁ,' বললেন তিনি। 'এটা আমাকে জানতে হবে।'

গাদ ইরেজের সাথে এরইমধ্যে একটা সম্পর্ক গড়ে উঠেছে রানার, কাজেই তার সক্রিয় সহযোগিতা পাওয়া খানিকটা সহজ হলো। ইজিচেয়ারের কাছে ফিরে এলো রানা, এখনো সেখানে আধশোয়া অবস্থায় রয়েছেন ভদ্রলোক। রানা বললো, তাঁর অর্থনৈতিক তৎপরতা সম্পর্কে আরো বিশদ বিবরণ পেতে হবে ওকে।

'বুঝতে পারছি আপনাকে আমার সাহায্য করা দরকার,' বললেন ইরেজ, যেন অপরাধবোধে ভুগছেন, সেই সাথে অবহেলার শিকার। 'হিসেবটা এবার মেলাতে হয়।'

'হ্যাঁ,' বললো রানা। 'কিন্তু তার আগে ঘটনার কারণগুলো জানতে হবে আমার। আপনার মতো একজন ভদ্রলোক ভিক্টর লজেনের সাথে হাত মিলিয়েছেন বা তার নির্দেশ মতো কাজ করছেন, এটা বিশ্বাস করা সত্যি কঠিন। আপনি, একজন ইহুদি।'

'ধর্ম না মানলে সে আবার ইহুদি কিসের।'

'কিন্তু আপনি ইহুদি পরিবারের সন্তান।'

'হ্যাঁ।'

'ফ্যাসিস্টরা গরু-ছাগলের মতো হত্যা করেছে ইহুদিদের, সুযোগ পেলে আজও করবে, এ-কথা জেনেও আপনি তাদের দলে নাম লেখালেন?'

কাতরকণ্ঠে ইরেজ বললেন, 'আমার কোনো উপায় ছিলো না।'

'ঠিক কি বলতে চান?'

'ওদের সব কথা শুনতে হবে আমার। তা না হলে আমাদের পরিবারের সম্মান বলে কিছু থাকবে না।'

'ব্যাখ্যা করুন। কি জন্যে তারা আপনাকে হুমকি দিয়েছে?'

'আমি নই,' প্রায় চিৎকার করে উঠলেন ইরেজ, যেন ড্রাগের প্রতিক্রিয়া ঝেড়ে ফেলতে চাইছেন। 'আমাদের জন্যে অসম্মান কিনে আনেন আমার বাবা। অনেক বছর আগের কথা, ইউরোপে তাকে একটা মিশনে পাঠানো হয়। সেকেণ্ড ওয়ার্ল্ড ওঅর চলছে তখন। কলম্বিয়ার ইহুদিরা মোটা টাকা চাঁদা তুলেছিল, নাৎসীদের কাছ থেকে জার্মান ইহুদিদের ছাড়িয়ে আনার জন্যে। বিশ্বাস করে টাকাটা আমার বাবার হাতে তুলে দেয়া হয়। বিশ্বাসের মর্যাদা পুরোপুরি রক্ষা করেননি তিনি। এসএস-কে তিনি টাকা দেন, বিনিময়ে কিছু ইহুদিকে মুক্ত করে আনেন। কিন্তু আরো অনেক টাকা তাঁর কাছে রয়ে যায়, সেগুলো তিনি নিজের কাছে রেখে দেন।'

'আচ্ছা। আপনার অবস্থাটা বুঝতে পারছি,' বললো রানা। 'কিন্তু আপনাকে ব্ল্যাকমেইল করার হুমকিটা কে দিলো?'

'ভিক্টর,' ইরেজ বললেন। 'সে জানে।'

ব্যস, এটুকুই; এর বেশি কিছু ইরেজ জানেন না বা জানাতে চান না। এ-ধরনের একটা তথ্য ভিক্টর লজেন কিভাবে সংগ্রহ করতে পারলো তা তিনি ব্যাখ্যা করলেন না। ব্ল্যাকমেইলিঙের ভয়ে মাঝে মধ্যে তাঁকে এমন সব কাজ করতে হয় যা আইনসিদ্ধ নয়।

উদ্ধার করা তথ্যটা নিয়ে বেশ কিছুক্ষণ আলিজান আকরামের সাথে আলাপ করলো রানা। টাকাটা পেয়েছিল এসএস, কাজেই অঙ্কটা তারা জানতো, জানতো কার কাছ থেকে টাকাটা এলো, কতোজন ইহুদির মুক্তির বিনিময়ে। সে-সময় হেনেরিক মুলার ছিলেন গেস্টাপো প্রধান, সেই সাথে এসএস গ্রুপেনফুয়েরার, বা জেনারেল। ক্যাম্পের গেট দিয়ে লাশগুলো বেরিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত বন্দী সমস্ত ইহুদি তাঁর মাথাব্যথা ছিলো। মুলার ছিলেন আইখম্যানের ইমিডিয়েট বস্ ও উপ-

দেশ। ইহুদিদের মুক্তির বিনিময়ে টাকা পাওয়ার ব্যাপারটা আর কেউ জানুক বা না জানুক, মুলার নিশ্চয়ই জানতেন। তথ্যগুলো তিনি তাঁর ভায়রার ছেলে ভিক্টর লজেনকে জানিয়ে দিলে আশ্চর্যের কিছু নেই।

যে যোগাযোগটা খুঁজে পেতে চাইছে রানা, সেটা যদি এই মুহূর্তে প্রমাণ করা না-ও যায়, অন্তত পাওয়া গেছে। ভিক্টর লজেন তথ্যটা জানে, তথ্যের উৎস হলো গেস্টাপো মুলার।

তিন কি চারদিন ঘুম পাড়িয়ে রেখে ইরেজকে কথা বলাতে পারলে মন্দ হতো না, কোকেন সম্রাটদের সম্পর্কে অনেক অজানা তথ্য বেরিয়ে আসতো। কিন্তু জানাজানি হয়ে যাবার ঝুঁকিটা বিরাট। ইরেজ এক ঘণ্টার বেশি অজ্ঞান না থাকলে আলিজান আকরাম সামান্য ঝুঁকি নিয়ে গ্রহণযোগ্য একটা ব্যাখ্যা দিতে পারবেন।

ঘুমের মধ্যে যা কিছু ঘটেছে সব ভুলে যাবার সাজেশন দিয়ে ইরেজকে বিশ্রাম নেয়ার সুযোগ দিলো রানা, তারপর ডাক্তারের হাতে তুলে দিলো তাঁকে। মডার্ন ইলেক্ট্রকনিক্স থেকে বিদায় নেয়ার আগে রেকর্ডার থেকে টেপটা খুলে নিলো ও, ফোন করে কালভিনের সাথে দেখা করার ব্যবস্থা করলো।

কালভিনকে দ্বিতীয় সেফ হাউসের ঠিকানা দিলো রানা, অনুরোধ করলো সে যেন ভিক্টর লজেনের ফাইলটা সাথে করে নিয়ে আসে। স্পর্শকাতর তথ্য হস্তান্তরে মোটেও উৎসাহী নয় কালভিন, তবে বিনিময়ে কি পাবে জানার পর আর প্রতিবাদ করলো না। গাদ ইরেজ তার কাছে অত্যন্ত অর্থবহ একটা নাম।

লেটেস্ট মডেলের একটা প্লাই মাউথ চালাচ্ছে রানা। শহরের এক প্রান্তে, আলমসেনট্রো শপিং সেন্টারের কাছাকাছি বাড়িটা। আশপাশে আরো কয়েকটা রঙ করা কটেজ আছে, চারধারে বাগান নিয়ে। কালভি-

নের ধারণা, এ-ধরনের অভিজাত এলাকায় রানাকে শুধু যে মানায় তা-ই নয়, ওর সামর্থ্যের মধ্যেও পড়ে।

'রানা এজেন্সির ডিরেক্টর, তোমার কথাই আলাদা!' সেফ হাউসের গাড়ি-বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে সে। 'কিন্তু, দোস্ত, যতোই পোজ-পাজ দেখাও, ভিক্টর লজেনকে ডিনারের দাওয়াত দিয়ে আনতে হলে আরো অনেক ওপরে উঠতে হবে তোমাকে।'

'দাওয়াত দিতে হবে না, ভিক্টর নিজেই আমার কাছে আসবে,' বললো রানা। 'হামাগুড়ি দিয়ে।'

হেসে উঠলো কালভিন, কিন্তু বাড়ির ভেতরটা দেখে হাসি তো থামলোই, হঠাৎ থামায় আরেকটু হলে বিষম খেতে যাচ্ছিলো। লিভিং-রুমে দুনিয়ার ইকুইপমেন্ট জড়ো করা হয়েছে—টেপ রেকর্ডার, কম-পিউটার টার্মিন্যাল, প্রিন্টার, মোডেম ও সফটঅয়্যার, রিসার্চ আর. ও. এম., তিনটে ফোনলাইন, রেডিও ট্রান্সসিভার, ভয়েস সিমিউলেটর, আরো কতো কি। চারদিকে তাকিয়ে মাথা নাড়লো কালভিন। 'তোমার কাজের পদ্ধতি সম্পূর্ণ আলাদা। আমি তোমাকে ঈর্ষা করি।'

আলিজান আকরাম ওর অনুরোধ রক্ষা করেছেন, যদিও ইকুইপ-মেন্টগুলো লেটেস্ট মডেলের নয়। আজ সকালে ওগুলো পরীক্ষা করেছে রানা, কাজ চালাতে কোনো অসুবিধে হবে না। 'এই নাও টেপটা, টমাস। হারিয়ো না, বা এখুনি হাতছাড়া করো না।'

টেপটা নিয়ে সাথে সাথে ঋণ পরিশোধ করলো কালভিন। বললো, 'এটা একটা ডিস্ক কপি। এবার বলো দেখি, গাদ ইরেজকে তুমি কথা বলালে কিভাবে?'

'নারকো-হিপনোসিস।'

'নারকো-হিপনোসিস?' মুখ বাঁকালো কালভিন। 'বাপের কালেও

শুনিনি। কি জানবো আমি?'

'যা জানো তারচেয়ে বেশি।'

'দেখা যাক।'

টেপ রেকর্ডারের সামনে বসলো কালভিন, কানে এয়ারফোন তুললো। আলিজান আকরামের কমপিউটারে একটা সফটঅয়্যার সংযোগ দিলো রানা।

একটা মাইক্রো ডিস্কের পুরোটা জুড়ে রয়েছে ভিক্টর লজেন, ছাপলে সেটা আড়াইশো পৃষ্ঠার একটা জীবনী গ্রন্থ হয়ে যাবে।

মেডিলিন, কলম্বিয়ায় উনিশ শো আটচল্লিশে জন্মেছে ভিক্টর লজেন। সাঁতেলা আর রুনা (ডেল) লজেনের ছেলে সে। একটু বড় হতেই বাড়ি থেকে দূরে শিক্ষালাভের জন্যে পাঠানো হয় ভিক্টরকে। বুয়েনস আয়ার্সের সেন্ট জর্জেস স্কুলে কিছুদিন পড়াশোনা করে, পরে সেখান থেকে বহিষ্কার করা হয় তাকে। সম্ভবত টাকার জোরে একটা মার্কিন সামরিক স্কুলে পড়াশোনা করার সুযোগ হয় তার। কি কারণে জানা যায়নি, কোর্স শেষ না করেই স্কুল ছেড়ে দেয় সে।

পরবর্তী দুই কি তিন বছরের ইতিহাস বিশেষ কিছু জানা যায়নি। সময়টা তার লস অ্যাঞ্জেলসে কাটে, জিম মরিসন আর ডোর নামে খ্যাত রক গ্রুপের অন্ধ ভক্তে পরিণত হয় সে। অন্তত তিন বছর আগে নিজের পত্রিকায় এক সাক্ষাৎকারে তাই বলেছে সে। জিম মরিসনের গান নাকি তার জীবনের সবচেয়ে বড় সম্পদ।

মানুষ হিসেবে অত্যন্ত সিরিয়াস ভিক্টর, কিন্তু পাগলাটে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি প্রচণ্ড ঘৃণা রয়েছে তার। আরিজোনা ইউভানিসিটিতে তিন বছর ছিলো, সাথে ড্রাগ রাখার জন্যে তখনই একবার গ্রেফতার হয় সে। সরকারী মহলে ধরাধরি করায় জেল হয়নি। বিচার হয়,

অভিযোগ প্রমাণিত হয়, রায় হয় বহিষ্কারের।

ষাট দশকে তোলা ছাত্র ভিক্টর লজেনের ফটোয় দেখা গেল কাঁধ পর্যন্ত লম্বা চুল, পরনে লেদার ট্রাউজার আর লেদার জ্যাকেট। লম্বা চুল আর লেদার এখনো তার অত্যন্ত প্রিয়। তখনো সে ড্রাগ বিক্রি করতো, এখনো করে। চেহারায় জেদ আর মারমুখো ভাবটা একটুও বদলায়নি।

ভিক্টর লজেনের মাদকাসক্তি সম্পর্কে ডি. ই. এ. সম্প্রতি কয়েকটা রিপোর্ট তৈরি করেছে। একটা রিপোর্টে বলা হয়েছে, মেডিলিনের উত্তরে একবার একটা কোকেন ল্যাবে উপস্থিত হলো ভিক্টর, শোল্ডার স্ট্র্যাপে কেজি-নাইন ছাড়া পরনে আর কিছু ছিলো না। মার্কিন প্রতিরক্ষা মন্ত্রীকে খুন করার সম্ভাবনা নিয়ে সহকর্মীদের সাথে দীর্ঘক্ষণ আলাপ করে সে।

নিজের একটা রেডিও স্টেশন আছে ভিক্টরের, সেখান থেকে প্রায়ই তার সাক্ষাৎকার প্রচার করা হয়। ডি. ই. এ.-র রিপোর্ট, সাক্ষাৎকার দেয়ার সময় একটা মঞ্চে থাকে সে, দর্শকদের সামনে উপস্থিত হয় সম্পূর্ণ দিগম্বর হয়ে। এতে করে নাকি দর্শক ও শ্রোতাদের আত্মার সাথে যোগাযোগ করা সহজ হয়।

জিম মরিসন আর ডোর নিয়ে যতো পাগলামিই করুক, ব্যবসা বুদ্ধি কখনো হারায়নি সে। তার কোকেন সাম্রাজ্য বিশাল আকৃতি পেতে থাকে। উপদেষ্টা আর সহযোগী হিসেবে বাবাকে পায় ভিক্টর, ল্যাটিন আমেরিকার কোকেন সাপ্লাই আর বিলিবণ্টন ব্যবস্থায় একচেটিয়া প্রাধান্য বিস্তার করে সে।

সত্তর দশকের শেষ দিকেও কোকেন ব্যবসা জমে ওঠেনি। বলিভিয়া থেকে ক্যারিবিয়ান পর্যন্ত ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিলো উৎসগুলো। কাঁচা মাল

থেকে শুরু করে পরিশোধিত মিহি পাউডার পর্যন্ত বিভিন্ন স্তরে মধ্য-সত্ত্বভোগীরা ছোঁ দিয়ে নিয়ে যেতো মোটা টাকা। সরাসরি ক্রেতার কাছে কোকেন পৌঁছে দেয়ার ধারণাটা ভিক্টরই প্রথম ব্যবসায়ী মহলে জনপ্রিয় করে তোলে।

ইণ্ডিয়ান আদিবাসীদের সাথে যোগাযোগ করলো ভিক্টর, তাদের-কে কোকেন চাষ করতে উৎসাহ যোগালো। তারপর চাষীদের বাড়ির কাছাকাছি প্রসেসিং ল্যাবরেটরী বসালো—কলম্বিয়া, বলিভিয়া, পেরু আর ব্রাজিলে। খেতের পাশে বসেই কোকা পাতা থেকে কোকা পেস্ট তৈরি করলো সে, বহনযোগ্য ল্যাব-এর সাহায্যে সেটাকে আরো পরিশোধিত করে মহামূল্যবান কোকেন ক্রিস্টালে রূপান্তরিত করলো।

ইণ্ডিয়ানদের শ্রম সস্তা। কেমিস্টদের বেতন খুব বেশি, কিন্তু সংখ্যায় তারা কম। দশ মিলিয়ন ডলার পুঁজি খাটিয়ে ভিক্টর লজেন ঘরে তুললো একশো মিলিয়ন। ডি. ই. এ.-র এটা খসড়া হিসাব, প্রথম এক বছরের। সত্যিকার লাভ বিলিয়ন ছাড়িয়ে যাবে।

কোকেন ব্যবসা ফুলেফেঁপে ওঠার পিছনে সবচেয়ে বড় কারণ ওই আমেরিকাতেই বিপুল ক্রেতা রয়েছে। শতো বছর, এমন কি সম্ভবত হাজার বছর ধরে দক্ষিণ আমেরিকার লোকজন কোকা পাতা চিবাচ্ছে। এ-ধরনের ব্যবহার থেকে নেশা খুব সামান্যই হয়। কোকা ঝোপ তৈরি করতে খুব একটা পরিশ্রম নেই, পাতাগুলো বিক্রিও হতো সস্তায়। কিন্তু প্রসেসিং করার পর জিনিসটার গুণগত পরিবর্তন হলো বৈপ্লবিক, সেই সাথে বেড়ে গেল দাম। পরিশোধিত কোকেন ছড়িয়ে পড়লো সারা দুনিয়ায়, এমন কি তৃতীয় বিশ্বের হতাশাগ্রস্ত বেকার যুবকরাও এক পুরিয়া কোকেন কেনার টাকার জন্যে শুরু করে দিলো ছিনতাই আর রাহাজানি।

প্রথম দিকে কলম্বিয়ানরা যুক্তরাষ্ট্রে যারই নেটওঅর্ক আছে তার কাছেই কোকেন বিক্রি করতো। মায়ামিতে কিউবানদের কাছে, নিউ-ইয়র্কে মাফিয়ার কাছে। কিছুদিন পর তারা উপলব্ধি করলো, এতে করে নিজেদের তারা বঞ্চিত করছে। যার নেটওঅর্ক আছে, আসল লাভটা তার পকেটে চলে যাচ্ছে। একটা প্যাকেট একশো ডলারে কিনে হাজার বা দু'হাজার ডলারে বিক্রি করছে তারা। ইতিমধ্যে মেইন স্ট্রীটে কোকেনের রমরমা বাজার তৈরি হয়েছে, ওখানে ক্রেতার সংখ্যা এতো বেশি যে লাভের অঙ্ক সম্পর্কে আগাম কিছু বলা কারো পক্ষেই সম্ভব নয়।

সরাসরি ক্রেতার কাছে বিক্রি করার জন্যে কোকেন নিয়ে মেইন স্ট্রীট, দক্ষিণ ফ্লোরিডায় হাজির হলো ভিক্টর লজেন। ওখানকার কিউ-বান ব্যবসায়ীরা একজোট হয়ে ব্যবসা করে, ড্রাগ ব্যবসার কলা কৌশল তারাই কলম্বিয়ানদের শিখিয়েছে। বেশি লাভের লোভে শিক্ষানবীশরা এবার হয়ে উঠলো তাদের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ; শুধু সরবরাহ নয়, বিলি-বণ্টনও নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করলো তারা। কার্টেলের স্বার্থ বজায় রাখার জন্যে লজেন ও কয়েকজন ব্যবসায়ী আততায়ীর একটা ছোটো দলকে পাঠালো ফ্লোরিডায়।

আশির দশকের শুরুতে এভাবেই বেধে গেল ড্যাড কাউন্টি কোকেন ওঅর। তিন বছর স্থায়ী হলো যুদ্ধটা। কলম্বিয়ানরা খুন করলো কিউবানদের, খুন করলো মাফিয়াদের, খুন করলো স্বাধীন প্রতিদ্বন্দ্বীদের, তারপর আর কাউকে না পেয়ে নিজেদের মধ্যে শুরু করলো খুনোখুনি। তাৎক্ষণিক কিংবদন্তীর জন্ম হলো—টার্নপাইক শ্যুটআউট, ড্যাডল্যাণ্ড মল ম্যাসাকার। মারপিট আর খুন-খারাবি ছড়িয়ে পড়লো নগর জীবনের সর্বত্র। লাশ সংগ্রহের জন্যে ড্যাড কাউন্টির মর্গ কর্তৃপক্ষকে

একটা শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ট্রেইলর ভাড়া করতে হলো। সংশ্লিষ্ট মহলের হিসাবে শান্তি নামার আগে খুন হয়ে গেল তিনশোর বেশি লোক।

রক্তপাত বন্ধ হবার পর শেয়ার ভাগাভাগি নিয়ে আলোচনায় বসলো ব্যবসায়ীরা। যা আশা করেছিল নিজের ভাগে তাই পেলো ভিক্টর লজেন। কলম্বিয়ার একটা এয়ারলাইন কিনলো সে, ব্রাঞ্চ থাকলো মায়ামিতে। কোকেনের বিপুল চাহিদা পূরণ করার জন্যে নিজের বিমান বহর খুবই উপকারে লাগলো তার। ফ্লোরিডা রাজ্যের সবচেয়ে বড় র‍্যাঞ্চটা কিনে নিলো, সাবেক মালিককে দায়িত্ব দিলো কোকেন গুদামজাত করার। বাহামার একটা দ্বীপও কিনলো ভিক্টর, বড় ধরনের কোকেনের চালান যাতে জাহাজযোগে চুপিসারে পাচার করা যায়।

খুন করার দরকার নেই এমন সব লোককে ইতিমধ্যে কিনে নিয়েছে ভিক্টর। দীর্ঘদিন যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করায় কালচারের তাৎপর্য আর মূল্য সম্পর্কে পরিষ্কার একটা ধারণা পেয়েছে সে: বড় হবার পর আমরা টাকাকে পুজো করি। এক এক করে ল-ইয়ার, রাজনীতিক, পুলিশ আর ব্যাংকারদের কিনে নিলো সে।

ভিক্টর লজেনের ফাইলে জিম মরিসনের মৃত্যু সম্পর্কেও একটা রিপোর্ট আছে। প্যারিসের এক হোটেলে নিজের বমিতে মুখ ঘষতে ঘষতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে লোকটা। তার এই মৃত্যু রহস্যজনক।

কিছুদিন আগে হোটেলটা কিনেছিল ভিক্টর। যে-কামরায় পা পিছলে আছাড় খায় মরিসন, সেটা নাকি ভিক্টরের পরামর্শ অনুসারে নতুন করে তৈরি করা হয়েছিল। যদিও মরিসনের মৃত্যুর জন্যে তাকে দায়ী করার মতো কোনো তথ্য-প্রমাণ সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি।

মেডিলিন শহরের শেষ প্রান্তে থীম পার্ক তৈরি করেছে ভিক্টর। পার্কের সামনের গেটে সে তার আদর্শ জিম মরিসনের একটা বিশাল

মূর্তি বানিয়েছে। ব্রোঞ্জের তৈরি মূর্তি, জিম মরিসন চিৎকার করছে, সম্পূর্ণ উলঙ্গ।

রানা উপলব্ধি করলো, ভিক্টর লজেনকে শুধু উন্মাদ একটা খুনি বলে মনে করলে ভুল হবে। লোকটা এক ধরনের প্রতিভা। সংশ্লিষ্ট মহলের রাঘব-বোয়ালরা বিশ বছর ধরে বলে আসছিল, কাজটা সম্ভব; কিন্তু অল্প যে-ক'জন কাজটাকে বাস্তবে রূপ দিতে চেষ্টা করে তারা শোচনীয় ভাবে ব্যর্থ হয়। ভিক্টর সফল হলো প্রথমবারই, নিজের জন্যে গড়ে তুললো বিরাট কোকেন সাম্রাজ্য, কোকেন সম্রাট উপাধি নিয়ে আরোহণ করলো সিংহাসনে।

অবশ্য প্রথম থেকেই কিছু সুবিধে পেয়েছে ভিক্টর। নিজের বাবাই তার শিক্ষাগুরু।

সাঁতেলা লজেন কিশোর বয়স থেকেই ড্রাগ বেচতো। এমনকি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধও তার ব্যবসার তেমন কোনো ক্ষতি করতে পারেনি, কারণ মার্সেইলেসের আর সব আণ্ডারগ্রাউণ্ড লিডারদের মতো সে-ও জার্মান দখলদারদের পুরোপুরি সাহায্য করেছে। রেজিস্ট্যান্স সদস্যদের খুঁজে বের করে হেনেরিক মুলারের গেস্টাপোর হাতে তুলে দিতো তারা।

'ল অভ ফিফটি'-র কারণে সাঁতেলা লজেনের অতীত ইতিহাস সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা সম্ভব হয়নি। ফরাসী এই আইনটায় বলা হয়েছে, দুষ্কৃতকারীদের সম্পর্কে সমস্ত রেকর্ড-পত্র যুদ্ধ মন্ত্রণালয়ের আর্কাইভে আগামী পঞ্চাশ বছর চাপা থাকবে। তবে উনিশশো চুয়াল্লিশ সালের জুন মাসে মিত্রশক্তি আক্রমণ করলে মার্সেইলেস ছেড়ে পালিয়ে যায় সাঁতেলা। শহরটায় আর কখনো ফেরেনি সে।

জার্মান সৈন্যরা পিছু হটছিল, অনেকের ধারণা তাদের সাথে ভিড়ে যায় সাঁতেলা। কারো কারো রিপোর্ট থেকে জানা যায়, কর্সিকায় চলে যায় সে, কিংবা আরো দূরে—রোমে। সঠিক খবর পাওয়া গেল একজন ব্রিটিশ ইন্টেলিজেন্স অফিসারের রিপোর্ট থেকে, যুদ্ধ শেষ হবার পর আর্জেন্টিনার বুয়েনস আয়ার্সে দেখা গেছে তাকে।

ওখানে একটা সাপার ক্লাব চালাচ্ছিল সাঁতেলা, পালিয়ে আসা ফ্যাসিস্টরা তার নিয়মিত খদ্দের। কিছুদিনের মধ্যে মার্সেইলেসে রয়ে যাওয়া পুরনো বন্ধুদের সাথে যোগাযোগ করলো সে, সেই সাথে তার উদ্যোগে আটলান্টিক পাড়ি দিতে শুরু করলো হেরোইন।

তখনো ল্যাটিন আমেরিকার ড্রাগ ব্যবসা জমে ওঠেনি। বিশৃংখলা ছিলো চরম। শক্তি অর্জন করে অজেয় হয়ে ওঠার মতো কোনো দলও ছিলো না। কর্সিকান ঐতিহ্য নিয়ে মার্সেইলেসের গ্যাংলিডাররা এই সুযোগটা গ্রহণ করলো। ষড়যন্ত্রের বীজ বপন করলো তারা, হুকুম দিলো প্রয়োজনে খুন করার। কাজ হলো জাদুর মতো, নিয়ম আর শৃংখলার মুখ দেখলো ড্রাগ ব্যবসায়ীরা। সাঁতেলা লজেন নতুন হলেও, চেইন-এর শক্ত লিঙ্ক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করলো নিজেকে, যে চেইনটা সমুদ্রের ওপর দিয়ে বহু দেশে চলে গেছে, চলে গেছে সীমান্ত ছাড়িয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পর্যন্ত।

তবে ড্রাগ চোরাচালানে সব সময় সাফল্য আসেনি। কিছুদিনের মধ্যেই ফরাসী নারকোটিক ব্যবসায়ীদের মধ্যে দলাদলি শুরু হলো। জুয়ান পেরনের ফ্যাসিস্ট সরকার ড্রাগ ব্যবসা একটা পর্যায় পর্যন্ত সহ্য করলো, কারণ ব্যবসাটা থেকে হু-হু করে বৈদেশিক মুদ্রা আসছে। কিন্তু ব্যাপক গোলাগুলি শুরু হতে পেরনবাদীদের টনক নড়লো।

এলাকার ভাগ নিয়ে যুদ্ধ শুরু হওয়ার প্রথম দিকেই ক্ষতিগ্রস্ত হলো

সাঁতেলা। নিজের নাইটক্লাব কাফেতে বসে আছে সে, একদল লোক ভিতরে ঢুকে গুলিবর্ষণ শুরু করল। .৩৮ ক্যালিবার ব্যবহারা করলো তারা, গুলি খেল সাঁতেলাসহ আরও বেশ কয়েকজন। বড় বড় হেডিঙে খবরটা ছাপা হল পত্রিকায়, সেই সাথে বন্ধ হয়ে গেল সাঁতেলা নাইটক্লাব।

তবে ইস্পাতের জ্যাকেট পড়ানো বুলেট সাঁতেলাকে মারার জন্য যথেষ্ট নয়। বেঁচে গেল সে, সময়মত আবার ব্যবসাতেও ফিরে এলো। একদিন প্রতিদ্বন্দী দলের নেতাকে ধরে আনলো তার লোকজন, এই নেতাই তাকে খুন করার হুকুম দিয়েছিল। ধীরে ধীরে, কয়েক ঘন্টা সময় নিয়ে, খুন করা হল লোকটিকে। বলা হয়, তার শারীরিক যন্ত্রণার ছবি তোলে সাঁতেলা, তারপর সেটা মার্সেইলেসে তার সমর্থকদের কাছে পাঠিয়ে দেয়। কথাটা সত্যি হবার সম্ভাবনাই বেশি। কারণ ক'দিন পর একটা স্টিল ফটোগ্রাফ স্থানীয় দৈনিকে ছাপা হয়। যে লোকের লাশই পাওয়া যায়নি, তার ফটো কোত্থেকে আসে? এর কোন ব্যাখ্যা দেয়া হয়নি।

ফাইলের এই ঘটনাটা পড়ে অস্বস্তিবোধ করল রানা। আচরণটায় যেন হেনরিক মুলারের ছাপ মারা রয়েছে। ঠিক এ ধরণের আচরণ অ্যাডমিলার ক্যানারিস-এর সাথেও করেছেন মুলার। ক্যানারিস ছিলেন জার্মানি মিলিটারী ইন্টেলিজেন্স-এর চীফ, মুলারের একজন প্রতিদ্বন্দী। হিটলারের সাঙ্গপাঙ্গদের খুশি করার জন্য দীর্ঘ, যন্ত্রণাকর ইন্টারোগেশনের পুরোটা মুভি ক্যামেরায় ধরে রাখার ব্যবস্থা করেন মুলার। নাৎসি এলিটদের জন্য এধরণের কাজ আরো তিনি করেছেন, একজন বন্ধুর জন্য আরেকবার করে থাকলে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই।

হাসপাতালে সেরে উঠছে সাঁতেলা, কেবিনে তার সাথে আরও একজন লোক রয়েছে। ঘটনাচক্রে গুলি খেয়েছে লোকটা, নাম ভিক্টর ডেল। পা হারাবার জন্য সুদর্শন সাঁতেলাকে দায়ী না করে তার বন্ধুতে পরিণত হল ভিক্টর ডেল।

একজন কলম্বিয়ান অ্যামব্যাসাডরের ছেলে ডেল, বাপের সাথে আর্জেন্টিনায় বসবাস করছে। ফুর্তিবাজ ছেলে, জাজ ভালবাসে, ড্রাগে আপত্তি নেই, পছন্দ করে ফ্যাসিস্ট পলিটিক্স। তার এক বোন আছে, রুনা ডেল, আহত ভাইকে দেখতে প্রায়ই হাসপাতালে আসে। এই সুত্রেই সাঁতেলা লজেনের সাথে রুনা ডেলের পরিচয়।

রুনার বাবা মারা যাবার পরদিন বিয়ে করলো ওরা, পরিচয় হবার ছ'মাস পর। বিয়ের আগেই রুনার পেটে বাচ্চা আসে, যে বাচ্চাটি প্রকৃতির একটি মারাত্মক ভুল হিসেবে প্রতিপন্ন হবে ভবিষ্যতে। জন্ম নিল বাচ্চা, নাম রাখা হল ভিক্তর লজেন। একবছরের মধ্যে রুনার দেশ কলম্বিয়ায় চলে এল পরিবার টি। বাবার জমিদারীর বিরাট একটা অংশ পেয়ে গেল রুনা লজেন।

স্ত্রীর সাথে কলম্বিয়ার চলে আশার পিছনে বড় একটা উদ্দেশ্য ছিল সাঁতেলার। আর্জেন্টিনার প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে সরে দাঁড়াল সে, তার মানে এই নয় যে ব্যবসা থেকে অবসর নিল।

খুব বেশিদিন লাগল না, সংশ্লিষ্ট মহল লক্ষ্য করলো, হটাৎ করে কোকেনের সরবরাহ দারুনভাবে বেড়ে গেছে। ব্যাপারটা কি? কোত্থেকে আসছে এত কোকেন? খোঁজ নিতে গিয়ে জানা গেল, নতুন উৎসটা হল আপার কাউকা ভ্যালি। সন্দেহ নেই, ওদিকে কেউ নিজের উদ্যোগে কোকা পাতা চাষ করছে। শুধু তাই নয়, নিজের প্রসেসিং প্ল্যান্ট আছে তার। পরিশোধিত কোকেন স্থানীয় বাজারে, সেই সাথে

পশ্চিম গোলার্ধে ছড়িয়ে দিচ্ছে সে।

ব্যবসায় ফিরে এলো সাঁতেলা। ছেলের জন্যে তৈরি করে দিলো সাম্রাজ্য বিস্তারের ভিত। প্রায়ই তাকে বলতে শোনা গেছে, কলম্বিয়ায় তার বসবাস করার কারণ হলো : এটাই ল্যাটিন আমেরিকায় একমাত্র দেশ যেখান থেকে দুটো সমুদ্রের নাগাল পাওয়া যায়। দেশটা দুর্গম পর্বতসংকুল, সেই সাথে সরকারী অফিসাররা লোভী ঘুষখোর, এক-জন স্মাগলারের স্বর্গরাজ্য হতে কোনো বাধা নেই।

কলম্বিয়ায় যখন লা ভায়োলেনসিয়া তুঙ্গে, ফ্যাসিস্ট আদর্শে উদ্বুদ্ধ সমর্থকদের নিয়ে রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডে মেতে উঠলো সাঁতেলা। পরে তার ছেলে ভিক্টর লজেন এদেরকে নিয়েই প্রতিষ্ঠিত করলো নিজের রাজনৈতিক পার্টি, হোয়াইট গামা।

ঘুষ দিয়ে ছেলের জন্যে আরো একটা কাজ করলো সাঁতেলা। সর-কারী এয়ারলাইন অ্যাভিয়ানকার গুরুত্বপূর্ণ পদে নিজের লোকদের বসালো সে। টিকেট আর নিরাপত্তা বিভাগের প্রধানরা জানলো, তারা যদি চোখ বুজে থাকে তাহলে রাতারাতি কোটিপতি হতে পারে। আর যদি চোখ খোলা রাখে, নিজেদের দায়িত্ব পালন করতে চায়, লাশ হয়ে বাড়ি ফিরতে হবে।

রাজনীতিকদের কেনা গেল আরো সহজে। নির্বাচন অভিযান পরি-চালনার জন্যে টাকা দরকার তাদের। জনসাধারণের কাছ থেকে খুব একটা চাঁদা পাওয়া যায় না, কাজেই অভাবটা পূরণ করা হলো নারকো-ডলার দিয়ে। নির্বাচিত হবার পর কোকেন সম্রাটকে দেয়া প্রতিশ্রুতি রক্ষা না করে উপায় থাকলো না তাদের। পেশাদার খুনিদের হাতে প্রাণ হারাবার ঝুঁকি তারা নিতে পারে না।

তারপরও অবশ্য টাকা খেতে রাজি নয় এমন লোকের সংখ্যা কম

নয়। রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের ব্যাপকতাই তার প্রমাণ। ডজন ডজন বিচারককে খুন করা হলো, মেডিলিনের দু'জন মহিলা ম্যাজিস্ট্রেটকেও রেহাই দেয়া হলো না। উনিশশো চুরাশি সালে মোটরসাইকেল আরোহী ককেরসদের হাতে প্রাণ হারালেন আইন মন্ত্রী। যে-কোনো জাতীয় দৈনিকের মালিক তাঁর পত্রিকায় ড্রাগ ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে কিছু লিখলে ধরে নিতে হবে তিনি তাঁর মৃত্যু ডেকে এনেছেন।

এরপর ভিক্টর লজেনের নেতৃত্বে হোয়াইট গামা কলম্বিয়ার রাজনীতিতে তৎপর হয়ে উঠলো। সবাই জানলো, নির্বাচনে দলটা তেমন সুবিধে করতে পারবে না, কিন্তু কেউ অস্বীকার করতে পারলো না যে ভিক্টর লজেন গোড়া শক্ত করে বেঁধে নিয়েই মাঠে নেমেছে।

অঢেল টাকা আছে তার, আছে দৈনিক পত্রিকা, রেডিও স্টেশন, এয়ারলাইন, সশস্ত্র সমর্থকবাহিনী। এখন শুধু বাকি নির্বাচনী বৈতরণী পার হয়ে কলম্বিয়ার শাসক হওয়া। সময় আর সুযোগের অপেক্ষায় আছে সে।

রানার মনে হলো, ভিক্টরের হোয়াইট গামা একটা ভুল পদক্ষেপ। রাজনীতিতে এসে নিজেকে মেলে ধরেছে সে। নিজের সাক্ষাৎকার প্রচার করায় কিংবদন্তীর আড়ালের মানুষটা বেরিয়ে পড়েছে, সশস্ত্র একজন স্মাগলার। সে যেন প্রদর্শনীতে সাজানো দর্শনীয় একটা বস্তু। এখানে তাকে পরীক্ষা করার সুযোগ পাবে লোকজন। সুযোগ পাবে নাড়াচাড়া করার।

দশ

'চেরোকীটা আবার আমার দরকার হবে।

'কেন?' জানতে চাইলো কালভিন। 'তুমি কি ভিক্টর লজেনকে উড়িয়ে দেয়ার কথা ভাবছো?'

'দি নেক্সট বেস্ট থিং।'

'কি সেটা, আমাকে বলবে?'

'না,' বললো রানা। 'তবে তুমি শুনতে পাবে।'

'তোমার সাথে আমি যাচ্ছি, রানা।'

'তা সম্ভব নয়, টমাস।'

'ওগুলো আমার চাকা,' বললো কালভিন। 'আমাকে ছাড়া কোথাও নাও যেতে পারে।'

'শোনো, তোমাকে আমার এখানে দরকার। কাল একটা জিনিসের নাম আর ঠিকানা চাই আমি। জিনিসটার মালিক ভিক্টর। নোংরা একটা জিনিস। ওটা তোমার খুঁজে বের করতে হবে।'

'তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে, আজ তুমি যেটা খুঁজতে যাচ্ছো সেটা খুব পরিষ্কার।'

'তারচেয়েও বেশি,' বললো রানা। 'পবিত্র।'

হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়লো কালভিন, বললো, 'আসলে তুমি চাইছো আমি সাথে থাকি। বাধা দেয়ার ভান করছো আমি যাতে জেদ ধরি।'

'না।'

'কিছু এসে যায় না, কারণ তোমার জিনিসটা, তোমার নোংরা জিনিসটা, এরইমধ্যে পেয়ে গেছি আমি। ভেবেছিলাম পরে জানাবো। তথ্যটার বিনিময়ে আমাকে সাথে নিতে হবে, রানা।'

'ঠিক আছে,' বললো রানা। 'অপারেশনে তুমিও আছো।'

'ভুলেই গিয়েছিলাম সামরিক বাহিনীতে ছিলে তুমি,' আবার মাথা নেড়ে বললো কালভিন। 'আজকাল আর এভাবে কেউ কথা বলে না।

খানিক পর ওদেরকে নিয়ে রওনা হয়ে গেল চেরোকী, ড্রাইভিং সীটে রানা। উত্তর-পুব দিক ধরে শহর থেকে বেরিয়ে এলো ওরা। পথে দু'বার থামলো রানা, প্রথমবার একটা দোকান থেকে পঞ্চাশ ফুট পাটের রশি কিনলো, দ্বিতীয়বার একটা রেস্তোরাঁয় ঢুকে স্টেক আর ভাজা আলু খেলো। খেতে বসে প্রশ্নটা করলো কালভিন। 'পবিত্র জিনিসটা কিরে, ভাই?'

'প্রতীক,' বললো রানা।

'হেঁয়ালি বাদ দাও, বুঝলে!' বিরক্তি প্রকাশ করলো কালভিন। 'নারকো-হিপনোটিস্ট হও আর যাই হও, তোমাকে স্বীকার করতে হবে, ভুল একটা করেছো। গাদ ইরেজকে ঠিকমতো কথা বলাতে পারলে, ভিক্টর লজেনকে এতোক্ষণে আমরা এক্সট্রাডিশন-যোগ্য হিসেবে পেতে পারতাম।'

'ঠিকমতো মানে তো গ্রেফতার করে ভয় দেখানো, তাই না? ওতে

কোনো কাজ হতো না। পোকাটার কাজ হলো ল্যুপ থেকে সবাইকে কেটে বাদ দেয়া। গ্রেফতার করে কোথায় রাখতে ইরেজকে, হাজতে তো? সম্রাটরা না চাইলে ওখানে কেউ বাঁচে?'

'আমাদের হাতে একজনও নেই, রানা।'

'লোক নেই, তথ্য আছে,' বললো রানা। 'কয়েকটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে আমরা নিশ্চিত। এবার বলো, লজেনের নোংরা জিনিসটা কি?'

'ডি. এ. এস. কালি-তে একটা কোকেন ল্যাব সম্পর্কে জানতে পেরেছে। হানা দেয়ার জন্যে কাল সেখানে আমার যাওয়ার কথা।' হলুদ একটা আলু পুরোটাই মুখে পুরলো কালভিন, একবার চিবালো, তারপর গিলে ফেললো। 'ওরা সম্ভবত আমার স্বার্থে অপারেশনটার আয়োজন করেছে, আমি যাতে রিপোর্ট করতে পারি এখানে ভালো কিছু কাজ হচ্ছে। তবে, ওদের তথ্যে কোনো ভুল নেই বলেই মনে হয়। অপারেশনে ওদের সেরা একজন অফিসার নেতৃত্ব দেবেন। তাঁর বিশ্বাস, ল্যাবটা লজেনের।'

'আমি থাকতে পারি?'

'কাল জানাবো, রানা।'

তারমানে, সম্ভবত ওকে সাথে নেয়া হবে না। খাওয়ার মধ্যে আর কোনো কথা হলো না। স্টেকের পর ফল পরিবেশন করা হলো, তিনটে ফল সম্পূর্ণ অচেনা রানার। খাওয়ার পাট চুকিয়ে কিউবান চুরুট ধরালো ও। তাড়াহুড়ো করছে না, কারণ বন্ধ হওয়ার কাছাকাছি সময়ে পার্কে পৌঁছুতে চায়। অর্থাৎ দশটায়, অন্তত চারদিকে বিজ্ঞাপনগুলো তাই বলছে।

ভিক্টর লজেনের থীম পার্ক বারো মাইল উত্তরে, হাইওয়ের কাছা-

কাছি। পার্কের ভেতর কৃত্রিম একটা লেক আছে, লেকে ভেসে বেড়ায় হরেক জাতের হাঁস, চারপাশে গাজেল হরিণ আর ক্যাঙ্গারুর ঘের। প্রায় সবরকম পশু-পাখিই রাখা হয়েছে। ক্যাঙ্গারুদের জন্যে আছে একটা বক্সিং রিঙ। কৃত্রিম খাদে রাখা হয়েছে চিতাবাঘ। বাচ্চাদের সুযোগ আছে হাতি চড়ার। আর আছে নগ্ন জিম মরিসনের মূর্তি, পার্কের প্রবেশমুখে টাওয়ারের মতো উঁচু, পাঁচ ফুট বেদীর ওপর।

বন্ধ হতে মাত্র এক ঘণ্টা বাকি আছে, তাই হাফ টিকেটে প্রবেশাধিকার পেলো ওরা। কোমরে হোলস্টার নিয়ে চারজন গার্ডকে দেখলো রানা, আর কোনো নিরাপত্তা ব্যবস্থা চোখে পড়লো না। গার্ডরা সবাই তরুণ, ধরে নেয়া হয়েছে গুরুত্বপূর্ণ কোনো কাজ তাদেরকে করতে দেয়া হয়নি। একটা নির্দোষ পার্কে গুরুত্বপূর্ণ কি কাজই বা থাকতে পারে?

পার্কের মাঝামাঝি জায়গায় ছোটো একটা প্যাসেঞ্জার প্লেন দেখা গেল, একটা নাগরদোলার চাকা ও উঁচু চাতালের ওপর তৈরি রিফ্রেশমেণ্ট স্ট্যাণ্ডের সাথে তার দিয়ে বাঁধা। একটা মডেল যেন, প্রদর্শনের জন্যে রাখা হয়েছে। খোঁজ নিতে ওদেরকে জানানো হলো, বিনা সংকোচে, এই প্লেনে করেই কোকেনের প্রথম চালান যুক্তরাষ্ট্রে নিয়ে গিয়েছিল ভিক্টর লজেন।

কথাটা বলার সময় হাসলো তরুণী মেয়েটা, টেনে-টুনে সিধে করলো বেরেটটা। পার্কের প্রত্যেক অ্যাটেনড্যাণ্ট পরে ওটা। মেয়েটা অবশ্য 'কোকেন' শব্দটা উচ্চারণ করেনি, বললো 'সিলেকটেড এক্সপোর্ট'।

তথ্যটা পাবার পর ইতিকর্তব্য স্থির করা সহজ হলো রানার জন্যে। উপস্থিত অ্যাটেনড্যাণ্টদের দৃষ্টি নিজের দিকে আকৃষ্ট করলো কালভিন, সেই ফাঁকে সবুজ গাছপালা আর ঝোপ-ঝাড়ের আড়ালে গা-ঢাকা দিলো রানা। খোলা রেলগাড়ির পিছনে চলে এলো ও। ফাঁকা জায়গাটা পেরিয়ে প্লেনটার দিকে এগোবার সময় ভয় হলো, অ্যাটেনড্যাণ্টরা

না ওকে দেখে ফেলে। ভয়টা অমূলক, কারণ ওর দেয়া বাহান্নটা তাস নিয়ে ইতিমধ্যে জাদু দেখাতে শুরু করেছে কালভিন, গার্ড বা অ্যাটেন-ড্যান্টদের অন্য কোনো দিকে তাকাবার ফুরসত নেই। পাঁচ মিনিট পর কাজ সেরে ফিরে এলো রানা। বিদায় নেয়ার আগে গার্ডরুমে বসে দু'কাপ কফি খেতে হলো ওদেরকে।

পার্ক থেকে সিকি মাইল এসে ছোটো একটা পাহাড়ের নিচে গাড়ি থামালো রানা। পাথুরে ঢাল বেয়ে খানিকটা ওপরে উঠলো ওরা। পার্ক বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।

পার্কটা থেকে তেমন কোনো আয় নেই লজেনের, লোকজন খুব কমই আসে। কর্মীদের গাড়ি ছাড়া বাকি সব যানবাহন পরবর্তী আধ-ঘণ্টার মধ্যে এলাকা ছেড়ে চলে গেল। এক ঘণ্টা পর পার্কিং লটে থাকলো তিনটে মাত্র গাড়ি। তিনটের মধ্যে দুটো নিরাপত্তা অফিসার-দের বলে মনে হলো, অপরটি আবাসিক ম্যানেজারের।

গার্ডদের একজনকে দেখা গেল সামনের গেটের কাছে পায়চারি করছে। তার রেডিওটা উদ্বিগ্ন করে তুললো রানাকে। এভাবে যদি গান বাজতে থাকে, বিস্ফোরণের শব্দ হয়তো শোনাই যাবে না। 'গেট পর্যন্ত হেঁটে যাবো আমি,' কালভিনকে বললো ও। 'নাইট গ্লাস ব্যবহার করবে তুমি। আমাকে গেটের সামনে দেখলে গাড়ি নিয়ে রওনা হয়ে যাবে।'

আধবোজা চোখে মাথা ঝাঁকালো কালভিন। রানার আইডিয়াটা যদিও তার পছন্দ হয়নি, তবে ওর মাথা থেকে আরো কিছু বেরোবে ধরে নিয়ে তর্ক না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সে।

পাহাড় থেকে নেমে ঠাণ্ডা বাতাসে হি হি করতে করতে হাঁটা ধরলো রানা। ভাবলো আর্কেটটা না এনে ভুল করেছে। রাস্তা ছেড়ে, পাশের

ঝোপ-ঝাড়ের ভেতর দিয়ে এগোচ্ছে ও। ওর কাঁধে মোটা রশির কুণ্ডলী, মাঝে মধ্যে ঝোপের ডালে আটকে যাচ্ছে। পার্কের গেটের কাছাকাছি পৌঁছে গেল ও, গার্ডরুম আর টিকেট-ঘরটা দেখতে পেলো। সামনেই একটা বিরাট বট গাছ, অসংখ্য ঝুরি নেমে এসেছে নিচে, আড়াল পেতে কোনো অসুবিধে হলো না। গাছ আর গেটের মাঝখানে এটাই একমাত্র আড়াল।

পার্কিং লটটা গেটের পাশে, বাইরের দিকে। ওদিকে যাবার আগে গার্ডদের মনোযোগ অন্য কোনো দিকে সরাতে হবে ওর। দেরি করার মানে হয় না ভেবে পকেট থেকে সংকেত পাঠানোর অ্যাকটিভেটর-টা বের করলো ও। চার মাইল রেঞ্জ ওটার। ওর টার্গেট অবশ্য মাত্র তিনশো গজ দূরে।

বোতামে চাপ দেয়ার সাথে সাথে রাতের আকাশ যেন চুরমার হয়ে গেল। অন্ধকার পার্ক নীলচে সাদা অত্যুজ্জ্বল আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো মুহূর্তের জন্যে, আলোকিত হয়ে উঠলো স্ট্যাচু আর টিকেট-ঘর। এক সেকেণ্ড পর সি-ফোর বিস্ফোরণের শব্দটা হলো, যেন বজ্রপাত হলো কাছে কোথাও।

রাস্তার দিকে পিছন ফিরলো গার্ড। হতভম্ব হয়ে গেছে সে। পার্কের দিকে ফিরে বিধ্বস্ত প্লেনটা দেখছে। শুধু প্লেনটা নয়, তার সাথে খোলা ট্রেনটাও আবর্জনায় পরিণত হয়েছে। কিছু চিন্তা না করেই সেদিকে ছুটলো সে, হোলস্টার থেকে হাতে চলে এসেছে পিস্তলটা, পিছন ফিরে তাকালো না একবারও।

লোকটা পঞ্চাশ ফুটও এগোয়নি, বটগাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো রানা। লোকটা একশো গজ এগিয়েছে, পাঁচ ফুট উঁচু বেদীর ওপর উঠে পড়লো ও। জায়গামতো ডেটকর্ড বসাতে দু'মিনিটের বেশি

লাগলো না। এরপর স্ট্যাচুর দুই পায়ে মোটা রশি জড়ালো। কাজটা শেষ করেছে, মূর্তির গোড়ায় ঘ্যাঁচ করে ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে পড়লো চেরোকী।

গাড়িটা ঘুরিয়ে রাস্তার দিকে মুখ করে রাখলো কালভিন। রশির প্রান্তটা ট্রেইলের হিচ-এর সাথে শক্ত করে বাঁধলো রানা. কালভিনকে সরিয়ে দিয়ে ড্রাইভিং সীটে নিজে বসলো।

কাজটা প্ল্যান মতো হলো না। গাড়ি ছাড়লো রানা. পেডাল চেপে ধরলো, কিন্তু সামান্য এগিয়ে স্থির হয়ে গেল চেরোকী। চাকাগুলো কাঁকর আর বালি ছড়ালো, প্রতিবাদ করলো, কিন্তু স্ট্যাচুটা নড়লো না। ব্যাক গিয়ার দিয়ে গাড়িটাকে বেদীর গোড়া পর্যন্ত পিছিয়ে আনলো রানা। গিয়ার আবার বদলে চাপ দিলো অ্যাকসিলারেটরে।

খানিক পর রশিতে টান পড়ায় প্রচণ্ড ঝাঁকি খেলো ওরা, মনে হলো কাঁধ থেকে ছিটকে বেরিয়ে যাবে মাথা। এবার নড়লো মূর্তিটা যদিও শুধু টলমল করলো, কাত হলো না। চাকাগুলো আবার ঘুরছে, সগর্জনে বাঁধন ছিঁড়ে বেরিয়ে যেতে চাইছে চেরোকী।

ব্যাক গিয়ার দিয়ে আবার পিছিয়ে এলো রানা। আবার সামনের দিকে ছোটালো গাড়ি। এবার কাজ হলো। অতিরিক্ত ধাক্কা দেয়ার জন্যে ডেটকর্ড অ্যাকটিভেট করলো ও। মনে হলো, জিম মরিসনের মাইক্রোফোন জানালা দিয়ে গাড়ির ভেতর ঢুকে পড়বে। তবে রশিতে ঢিল পড়ায় চেরোকীর গতিও বাড়লো।

ভোঁতা একটা শব্দের সাথে মূর্তিটার পতন ঘটলো ওদের পিছনে।

'পড়েছে!' চিৎকার করলো রানা। 'রশিটা কেটে দাও!'

শব্দ নিয়ে উদ্বিগ্ন হবার এখন আর কোনো মানে হয় না, লাফ দিয়ে গাড়ি থেকে নেমে পকেট থেকে কোল্ট পাইথন বের করে গুলি করলো

কালভিন, বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল মোটা রশিটা ক্যাঙ্গারুর মতো আরেক লাফে গাড়িতে ফিরে এলো সে। গাড়ি ছেড়ে দিলো রানা।

পার্কিং লট থেকে তীরবেগে বেরিয়ে যাওয়া উচিত ছিলো ওদের, কিন্তু তা সম্ভব হলো না। নিরেট আর শক্ত কি যেন একটা পড়ে আছে মাটিতে, তার সাথে গাড়ির বাম পাশ আর সামনেটা প্রচণ্ড ধাক্কা খেলো। লাফ দিলো চেরোকী, কিন্তু বাধাটা টপকাতে পারলো না, স্থির হয়ে গেল। পাশের জানালা আর ছাদের সাথে ঠুকে গেছে রানার মাথা, কয়েক সেকেণ্ড কিছুই স্মরণ করতে পারলো না। সংবিত ফিরলো কালভিনের চিৎকারে।

'রানা, গাড়ি ছাড়ো! মুভ ইট, ম্যান, মুভ ইট! ওরা আসছে!'

গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে আসছে ওরা। গুলির আওয়াজ এতো কাছে, বিস্ফোরণের মতো লাগলো কানে। চেরোকীর পিছনের জানালায় একটা বুলেট লাগলো, মাকড়সার জাল হয়ে গেল কাঁচটা।

পাশের জানালা থেকে মাথা তুলে ব্যাক গিয়ার দিলো রানা, পিছিয়ে আনলো চেরোকী, এঞ্জিনে প্রচুর গ্যাস ভরলো। যান্ত্রিক গর্জনের সাথে কর্কশ সংঘর্ষের আওয়াজ হলো, পরমুহূর্তে বাধাটা টপকে এলো গাড়ি। দিকভ্রান্ত হয়ে বৃত্ত রচনা করতে যাচ্ছে চেরোকী, হুইল ঘুরিয়ে সেটাকে সিধে করলো রানা, সামনের দিকে ছোটালো। কাঁকর আর নুড়ি পাথরের ওপর দিয়ে উঠে এলো কংক্রিটের রাস্তায়।

'ক্ষয়ক্ষতির জন্যে দুঃখিত,' বললো রানা। 'তবে কি জানো, আমার বহুদিনের ইচ্ছে একটা স্ট্যাচু ফেলে দিই।'

পার্ক পাঁচ মাইল পিছনে ফেলে আসার পর এই প্রথম মন খুলে হাসলো কালভিন। 'গাড়ির জন্যে দুঃখ করো না, রানা,' বললো সে।

'তুমি পুষিয়ে দিয়েছো।'

চেরোকী ভালো চলছে না। স্টিয়ারিং তিরিশ ডিগ্রীর মতো বাঁকা করে রাখলে রাস্তার ওপর সোজা থাকছে ওটা। গাড়ির একটা পাশ আর সামনের দিকটা ভেঙেচুরে বিধ্বস্ত হয়ে গেছে। বাতাসে গ্যাসোলিনের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে মাঝে-মধ্যে। 'বেশ, কিন্তু কাল কি হবে?'

'কালির কথা বলছো?'

'তাছাড়া কি!'

উত্তরটা এড়িয়ে গেল কালভিন। 'আচ্ছা, শেষ যে বিস্ফোরণের শব্দটা পেলাম, ব্যাপারটা কি বলো তো?'

'শেষ বিস্ফোরণ?'

'স্ট্যাচুটা যখন পড়তে শুরু করলো। সি-ফোর আমি চিনি, রানা। ওটা সি-ফোর ছিলো না।'

'ছিলো এক ফুট লম্বা ডেটকর্ড-এর একটা টুকরো,' বললো রানা। 'বেঁধে রেখে এসেছিলাম। স্ট্যাচুর বিশেষ একটা জায়গায়।'

'বিশেষ জায়গায়···কি রকম?'

'ওটা আমি জড়িয়ে দিয়েছিলাম স্ট্যাচুর ডিক-এ।'

'ডিক!' আর্তনাদ করে উঠলো কালভিন। 'মাই গড! তোমার এতো স্পর্ধা! তুমি ভিক্টর লজেনের গুরু জিম মরিসনের টেসটিকল উড়িয়ে দিয়েছো! একজন কলম্বিয়ানকে তুমি এভাবে অপমান করলে! জানো, এর পরিণতি কি হতে পারে?'

'আমি তোমাকে বলিনি, প্রতীক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।'

হেসে উঠতে গিয়ে নিজেকে সামলে নিলো কালভিন। 'তুমি আসলে ভিক্টরকে জানাতে চাইছো, তুমি তাকে ধাওয়া করবে, তাই না?'

'জানাতে চাই, কেউ একজন তাকে ধাওয়া করবে।'

'ঠিক আছে,' বললো কালভিন। 'কাল তুমি প্লেনে থাকছো।'

এগারো

মেডিলিন থেকে বিমানে মাত্র এক ঘণ্টার পথ কালি। কাউকা উপত্যকার দিকে প্রায় নাক বরাবর সোজা দক্ষিণে শহরটা। মহাদেশের সবচেয়ে উর্বরা এলাকাগুলোর মধ্যে একটা। সম্ভাব্য প্রায় সব কিছুই ওখানে জন্মায়, তবে অর্থকরী ফসল হলো আখ, তুলো, কফি আর কোকা। বিশাল সব পাহাড়শ্রেণীর মাঝখানে উপত্যকাটা। কালির অবস্থান টিয়েরা টেমপালাডা-য়। টিয়েরা টেমপালাডা মানে হলো টেমপারেচার জোন, যেখানে বাস করা ও চাষ করা দুটোই লাভজনক। তবে কালি সমুদ্র সমতল থেকে মাত্র তিন হাজার ফুট উঁচুতে হওয়ায় এখানকার আবহাওয়া বেশ গরম।

মার্কো সুয়ারেজ এয়ারফোর্স বেস থেকে একটা পুরনো ডজ ভ্যান নিয়ে রওনা হলো ওরা। রাস্তার দু'পাশে আখখেত, ঘাম চকচকে মুখ নিয়ে খেতে কাজ করছে কালো তরুণীরা, ওদেরকে দেখে হাত নাড়লো। ভ্যানের ভেতর গরমে হাঁসফাঁস করছে ওরা, রানা বাদে আর কেউ সাড়া দিলো না।

ভ্যানের ড্রাইভার সাদা কাপড়ে ডি. এ. এস.-এর একজন কর্পো-

রাল। লোকটা তরুণ, ইণ্ডিয়ান, চুপচাপ। কালি ইণ্ডিয়ানদের শহর, বিভিন্ন গোত্রের আদিবাসীরা এসে কলম্বিয়ার তৃতীয় বৃহত্তম শহরে পরিণত করেছে এটাকে। শহরের ভেতর ও বাইরে বস্তিগুলো যেমন নোংরা তেমনি দুর্গন্ধময়। ড্রেনের পাশে খুপরি কাদামাটিতে শুয়ে বসে আছে গাদা গাদা হাড্ডিসার, রুগ্ন, নগ্ন শিশু—বাংলাদেশী দুর্ভাগাদের কথা মনে করিয়ে দিলো রানাকে।

কোকেন প্রসেস করার কেন্দ্র হিসেবেও পরিচিতি রয়েছে কালির। দক্ষিণে সীমান্ত কাছে হওয়ায় বলিভিয়া আর পেরু থেকে অবাধে ও সস্তায় কাঁচামাল পাবার সুবিধে আছে। স্থানীয় ফার্মগুলোও যথেষ্ট কোকা পাতা সরবরাহ করে। স্থানীয়ভাবে কোকা পাতার চাষ হয় বেশির ভাগ পারিবারিক খেতে। কাউকা উপত্যকায় এ-ধরনের খেতের কোনো অভাব নেই। কলম্বিয়ান ড্রাগ ব্যবসার ব্রেন বলা হয় মেডিলিনকে, আর কালিকে বলা হয় ওয়ার্কিং মাসল।

'যার সাথে দেখা করতে যাচ্ছি,' রানাকে জানালো কালভিন, 'তাকে তুমি দুটোই বলতে পারো—কার্টেলের বিরুদ্ধে ব্রেন ও মাসল।'

কালভিনের বর্ণনা থেকে জানা গেল, কর্নেল হার্নান্দেজ বেনিন একটা জ্যান্ত মিরাকল, তাঁর মতো সৎ, সাহসী ও বুদ্ধিমান ইনভেস্টিগেটর গোটা কলম্বিয়ায় দ্বিতীয়টি আছে কিনা সন্দেহ। ড্রাগ ব্যবসা বন্ধ করার জন্যে যতোটা মনোযোগী তিনি, ততোটাই কম মনোযোগী দীর্ঘায়ুর প্রতি। ডি. এ. এস.-এর উঁচু পদে আসীন থাকায় রাজনীতিক বা অন্যান্য ইনফর্মাররা তাঁর কাঁধের ওপর দিয়ে খুব কমই উঁকি-ঝুঁকি মারার সুযোগ পায়।

'আজকের অপারেশন সম্পর্কে কাউকে তিনি কিছু জানতে দেননি,' বললো কালভিন। 'ডিপার্টমেন্টের কেউ কিছু জানে না, বাইরের

লোকেরাও জানে না। এমনকি অ্যাসল্ট ইউনিটকেও টার্গেট সম্পর্কে কিছু জানানো হয়নি, তারা জানবে স্পটে পৌঁছুনোর পর।'

'তাঁকে বলবে, অ্যাসল্ট টিমের কোনো দরকার নেই।'

'আমি তাঁকে কিছুই বলবো না। তুমিও তাঁকে ঠ্যালা-গুঁতো দিতে চেষ্টা করো না। গোটা ব্যাপারটাকে তুমি ব্যক্তিগত যুদ্ধ হিসেবে নিয়েছো দেখে আমি উদ্বিগ্ন, রানা।'

'তোমরা, আমেরিকানরা, কিভাবে যে এতো বড়ো একটা অন্যায় বছরের পর বছর ধরে সহ্য করছো, আমি জানি না। অস্ত্র, লোকবল, সম্পদ, রাজনৈতিক ক্ষমতা, কিছুরই তো অভাব নেই তোমাদের, অথচ কলম্বিয়ান কার্টেল ঠিকই তোমাদেরকে নিয়মিত বিষ খাইয়ে যাচ্ছে। ব্যক্তিগত যুদ্ধ? হ্যাঁ, তা বলতে পারো। কলম্বিয়ার কোকেন আমার দেশ—বাংলাদেশে যাচ্ছে জানার পর ব্যাপারটা আমি যুদ্ধ হিসেবেই নিয়েছি। এমনিতেই আমাদের সমস্যার কোনো সীমা নেই, তার ওপর আরেকটা অভিশাপ আমরা মেনে নিতে পারি না।'

'এ-কথা তাহলে সত্যি নয় যে তোমার এই যুদ্ধের পিছনে লিলিয়ানও একটা কারণ?'

'তার ব্যাপারটাও আছে।'

'তুমি তাকে ভালোবাসো?'

'আমরা বন্ধু, টমাস,' বললো রানা। 'যেমন তুমি আর আমি।'

'তোমাকে আমি মাঝেমধ্যে একেবারেই বুঝতে পারি না,' গম্ভীর সুরে বললো কালভিন। 'লিলিয়ান একটা মেয়ে, সুন্দরী মেয়ে, এটা তুমি অস্বীকার করো কিভাবে?'

'কে অস্বীকার করছে?'

'তাহলে স্বীকার করো, লিলিয়ানের সাথে তোমার সম্পর্কটা শুধু

বন্ধুত্বের নয়, তারচেয়েও বেশি কিছু।'

'তোমার সাথেও আমার সম্পর্ক শুধু বন্ধুত্বের নয়, কালভিন। তুমি একদিন আমার প্রাণ বাঁচিয়েছো।'

'তার আগে তুমি আমাকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে উদ্ধার করেছিলে,' মনে করিয়ে দিলো কালভিন।

'তুমি জানো না, লিলি আমাকে ল্যাংলিতে নিয়ে গিয়ে আটকে রাখার, এমনকি কোর্টে পাঠিয়ে শাস্তি দেয়ার সুযোগও পেয়েছিল। সুযোগটা নেয়নি সে।'

'তাহলে বলো, প্রতিদান দিচ্ছো।'

'দেয়ার সুযোগ পেলে ধন্য মনে করবো নিজেকে। শুধু লিলিকে নয়, টমাস—দুনিয়ায় আমার জন্ম হয়েছে সেজন্যে আমি কৃতজ্ঞ, ঋণী; তাই কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্যে, খানিকটা ঋণ শোধ করার জন্যে ভালো কিছু কাজ আমাকে করতে হবে।'

'সেজন্যে যদি এলোপাতাড়ি খুন করতে হয় তাতেও তোমার আপত্তি নেই।'

'ভুল করছো, টমাস। লা ব্লানকা নিজেই নিজের মৃত্যু ডেকে এনেছে। আমি তাকে সাবধান করে দিয়েছিলাম, সে গুরুত্ব দেয়নি।'

'ব্যাখ্যাটা দেরিতে হলেও পেলাম,' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো কালভিন।

'কি জানো, এরা টেরোরিস্ট, প্রচলিত নিয়মে এদের বিরুদ্ধে কিছু করা যাবে না। তবু আমি চেষ্টা করছি। কিন্তু জেনে রাখো, যদি দেখি সুবিধে করতে পারছি না, আমি কোনো নিয়ম মানবো না।'

'তুমিও ওদের মতো টেরর হয়ে উঠবে?'

'ইচ্ছে করলে আমি তা হতে পারি।'

'তা আমি জানি।'

এক সেকেণ্ড পর রানা চ্যালেঞ্জের সুরে বললো, 'আমার পিস্তলটা চাও তুমি?'

'না,' মাথা নাড়লো কালভিন। 'তোমার সুইস রিপিটার দরকার নেই আমার। তবে বেনিনের লাগতে পারে।'

মিলিত হওয়ার নির্দিষ্ট জায়গায় কর্নেল বেনিনকে পাওয়া গেল না। অ্যাভেনিডা কলম্বিয়ায় ছোটো একটা কফি শপ, রাস্তা থেকে কয়েকটা ধাপ বেয়ে উঠতে হয়। কফি শপের দেয়ালে খবরের কাগজের বিজ্ঞাপন কেটে সাঁটা হয়েছে, বেশিরভাগই চিত্রনায়িকাদের অর্ধ উলঙ্গ ছবি।

প্রায় আধ ঘণ্টার মতো অপেক্ষা করতে হলো ওদেরকে। তারপর বুলগেরিয়ান ওয়েট লিফটার-এর কাঠামো নিয়ে বিশাল এক লোক ঢুকলো ভেতরে। বিপজ্জনক করমর্দনের জন্যে মানসিকভাবে প্রস্তুত হয়ে নিলো রানা, কিন্তু লোকটা ওদেরকে ছাড়িয়ে গেল, বসলো মাঝখানে কয়েকটা টেবিল রেখে এক কোণে। কফি শপের পিছন দিকে বসলো, কিন্তু তার সমস্ত মনোযোগ সামনের দিকে। এক এক করে ভেতরের ষোলোটা টেবিলই পরীক্ষা করলো সে। ধাপগুলোর নিচে ফেলা টেবিলগুলোও বাদ দিলো না।

'বডিগার্ড,' রানাকে বললো কালভিন।

তিরিশ সেকেণ্ড পর আরো একজন ঢুকলো, প্রথম লোকটার যমজ ভাই যেন। দরজার কাছাকাছি একটা টেবিলে বসলো সে। আরো তিরিশ সেকেণ্ড পর তৃতীয় ব্যক্তির উদয় হলো। শান্তভাবে ভেতরে ঢুকলেন তিনি, এদিক ওদিক তাকালেন না, যেন নিরাপত্তা সম্পর্কে তার কোনো উদ্বেগ নেই। সোজা এগিয়ে এলেন কালভিনের দিকে,

কালভিন উঠে দাঁড়াতে বুকে টেনে নিলেন তাকে। কালভিনের মতোই লম্বা তিনি, ঋজু, গায়ের চামড়া রোদে পোড়া তামাটে।

পরিচয় ও কুশল বিনিময়ে মিনিট পাঁচেক ব্যয় হলো। আনুষ্ঠানিকতার জন্যে সময় দেয়া যাবে না বলে ক্ষমা চেয়ে নিয়ে কর্নেল জানালেন, 'এখুনি আমাদের রওনা হতে হবে।' রানার প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হয়েছেন বলে মনে হলো না, পরিচয় বিনিময়ের সময় করমর্দন করেছেন স্রেফ নিয়ম রক্ষার জন্যে। তবে গাড়িতে ওঠার সাথে সাথে রানার প্রতি মনোযোগ দিলেন তিনি। গাড়িটা পুরনো একটা বুইক সিডান।

'রানা,' ভদ্রলোকের ইংরেজিতে এতো বেশি আঞ্চলিক টান যে মনে হলো সাংকেতিক ভাষায় কথা বলছেন। 'বাংলাদেশে নামটা কি অনেকেই ব্যবহার করে?'

'আমার জন্যে খুশির ব্যাপার—করে,' বললো রানা। যারা দুর্লভ নাম পছন্দ করে রানা তাদের দলে পড়ে না।

কর্নেল বেনিন হাসলেন, হাসিটা মিছরির ছুরি নাকি জল্লাদের নির্দয়তা, রানা ঠিক বুঝতে পারলো না। 'আপনি কি জানেন, এই একই নামের এক ব্যক্তি মেডিলিনে অ্যাক্সিডেন্ট করেছেন? ভদ্রলোকের হোটেল স্যুইট একেবারে পাউডার করে দেয়া হয়েছে।'

'ভদ্রলোকের বাঁ হাতটা সম্ভবত প্রায় অকেজো হয়ে আছে, কর্নেল।'

'হ্যাঁ,' বললেন কর্নেল। 'কিন্তু আমি শুনেছি, তিনি নাকি তাঁর সরকারের বাম হাতের সাথে যুক্ত। বলা হয় অসাধারণ নিপুণ, দক্ষ ও বিস্ময়কর একজন মানুষ। সম্ভবত একজন ল্যাণ্ড-বেসড্ মেরিনার।'

ব্যাপারটা আর কৌতুক থাকলো না, কারণ ডি. এ. এস.-এর কারো পক্ষে রানার অপারেশন্যাল নাম জানার কথা নয়। রানাই

গোরিলার। এবারের অ্যাসাইনমেন্টের জন্যে বি. সি. আই. হেডকোয়ার্টার ঢাকা থেকে নামটা দেয়া হয়েছে ওকে।

'আমার দিকে তাকিয়ো না,' তাড়াতাড়ি বললো কালভিন। 'নিজস্ব উৎস আছে কর্নেলের।'

'সেই উৎসটা সম্পর্কেই জানতে চাই আমি।'

আবার হাসলেন কর্নেল বেনিন। রোদে পোড়া মুখে সাদা দাঁতগুলো আরো সাদা লাগলো। 'আমি আসলে কিছুই ফাঁস করিনি, মেজর রানা। আমি শুধু নিজের ভঙ্গিতে আপনাকে জানাতে চেয়েছি যে আপনি আমাদের দেশে পরিচিত। এমন হতে পারে যে কিছু মন্দ লোক কারেন্সিতে আপনার নাম লিখে বাজারে ছড়িয়ে দিয়েছে।'

মন্দ লোক, ভাবলো রানা। কর্নেল কাদের কথা বলছেন অনুমান করতে পারলো ও। 'এই লোকগুলো কি, কর্নেল, ব্যানানা ক্রপ সম্পর্কে হিসাব আর গবেষণা করে? পরিচয়হীন সেক্রেটারি, ইকোনমিক অ্যাফেয়ার্সের সাথে জড়িত?'

'হতে পারে,' বললেন কর্নেল। 'অঙ্ক আর সংখ্যা নিয়ে আমেরিকান ইকোনমিক অ্যাডভাইজারদের বাড়াবাড়ি আমার অদ্ভুত লাগে। এতো এতো লোক শুধু গোনার কাজে ব্যস্ত, কারণটা আমার বোধগম্য নয়।'

'তবে আমার কাছে কারণটা পরিষ্কার হয়ে যায়, ওরা যখন আমার মাথার দাম হিসেবে টাকা গোনে,' বললো রানা।

'সেজন্যেই তো আপনি আমার ভাই, মিঃ রানা। এই বান্দার মাথার জন্যেও আজ অনেক দিন হলো নগদ এক লাখ ডলার অফার করা হয়েছে। আমাদের মতো আরো যারা আছে, সবাই মিলে একটা সামাজিক ক্লাব গড়ে তুলতে পারি।'

'ভিক্টর লজেনের বন্ধুগোষ্ঠী।'

'সংখ্যায় তারা কম নয়,' বললেন কর্নেল। 'ধারণা করা হয়, ক্যাশিয়ারদের সাথে তার ভালো সম্পর্ক আছে।'

কানের পিছনটা চুলকালো রানা। ও জানে, ববি মুয়েলারের সাথে সি. আই. এ.-র একটা সম্পর্ক ছিলো। ববির সাথে সি. আই. এ.-র যোগাযোগ ঘটিয়ে দেয় লিলিয়ান। কাজটা করার পিছনে গোপন উদ্দেশ্য ছিলো লিলির, একটা অন্যায় ষড়যন্ত্র উন্মোচিত করার চেষ্টা করছিল সে। দেরিতে হলেও, সি. আই. এ. ব্যাপারটা জেনে ফেলে। এরইমধ্যে লিলিকে তারা খুন করে ফেলতো, করেনি বিরাট ক্ষতি করার হুমকি দেয়ায়। রানার অনুরোধে বি. সি. আই., সেই সাথে রানা এজেন্সি এসপিওনাজ জগতে রটিয়ে দিয়েছে, লিলির কোনো ক্ষতি হলে সি. আই. এ.-র বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবে তারা। সে-জন্যেই লিলির দিকে হাত বাড়াচ্ছে না ওরা, আর রানার দিকে হাত বাড়াচ্ছে তৃতীয় পক্ষের মাধ্যমে। রানার মনে কোনো সন্দেহ নেই, লজেন আর কার্টেলকে ওর বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়েছে সি. আই. এ.। এই কথাটাই আভাসে বলতে চাইছেন কর্নেল বেনিন।

'এক লোক আমাকে বলেছে, তার জানার কথা, ব্যানানা গণনা-কারীদের সাথে কার্টেলের নাকি ভালো সম্পর্ক আছে,' বললো রানা, জ্যাক মরিসের কথা মনে পড়ে গেছে ওর। 'কলম্বিয়ায় এই সময় আমার উপস্থিতি দু'পক্ষের জন্যেই উদ্বেগের বিষয়।'

'হ্যাঁ,' বললেন কর্নেল বেনিন। 'শুনেছি মোটা অঙ্কের টাকা হাত-বদল হচ্ছে।'

এটা রানার জন্যে নতুন একটা তথ্য। 'টাকার স্রোত কোনদিকে?' জানতে চাইলো ও।

'কার্টেল থেকে ব্যানানা গণনাকারী বা ক্যাশিয়ারদের দিকে,' বললেন কর্নেল। 'আমার কাছে ব্যাপারটা অদ্ভুত লেগেছে।'

'আমি ঠিক বিশ্বাস করতে পারছি না,' বললো রানা, যদিও সি. আই. এ. ও মার্কিন প্রশাসন সম্পর্কে ভালো করেই জানে ও। নিকারাগুয়ান যুদ্ধের খরচ যোগানোর জন্যে যে-কোনো উৎস থেকে টাকা সংগ্রহের চেষ্টা করেছে ওরা, ভালো-মন্দ বাছ বিচার করেনি।

'কথাটা আমারও কানে এসেছে, রানা।'

টমাস কালভিনও যদি শুনে থাকে, ব্যাপারটা স্রেফ গুজব হতে পারে না। তার তথ্যের উৎস সব সময় নির্ভরযোগ্য। 'তুমি শুনেছো সি. আই. এ.-তে ঢুকে পড়েছে কার্টেল।'

'হ্যাঁ,' বললো কালভিন।

'উল্টোটা নয়।'

'না,' বললো কালভিন। 'তবে, আগে বা পরে ব্যাপারটা এক সময় উল্টো হয়েই দেখা দেয়।'

কথাটা সত্যি। এরইমধ্যে তা ঘটেছে। টাকা সংগ্রহের জন্যে ববি মুয়েলারকে ফ্রন্ট হিসেবে ব্যবহার করেছে সি. আই. এ.। এই ঘটনাটাই সি. আই. এ.-তে কার্টেলের ঢুকে পড়ার সমতুল্য। কিন্তু সি. আই. এ. বদি মুয়েলারের ইতিহাস নিশ্চয়ই জানতো, অর্থাৎ তার মাধ্যমে সি. আই. এ.-ও কার্টেলে ঢুকে পড়ে। ববির সাথে ভিক্টরের কি সম্পর্ক সি. আই. এ. তা জানতো না, এ হতে পারে না। 'আমরা কতো টাকা নিয়ে আলোচনা করছি এখানে?' জানতে চাইলো রানা।

'আমি শুনেছি কয়েক মিলিয়ন,' বললো কালভিন। 'ডলার, অবশ্যই।'

'কয়েক মিলিয়ন,' কর্নেলও মাথা ঝাঁকালেন।

কার্টেলের সামর্থ্য সম্পর্কে রানা কোনো প্রশ্ন তুললো না, কলম্বিয়ায় আসার পর চিন্তা-ভাবনা গুছিয়ে নেয়ার যথেষ্ট সময় পেয়েছে ও।

রাস্তা ছেড়ে মেঠো একটা পথ ধরলো সিডান। উপত্যকার ওপর দিয়ে পাহাড়ের দিকে চলে গেছে পথটা। শহর দশ মাইল পিছনে ফেলে এলো ওরা। সামনে পাঁচিল ঘেরা একটা হাসিয়েনদা দেখা গেল, এককালে বিশাল ক্যাটল র‍্যাঞ্চ ছিলো। লালচে ইঁটের কাঠামো ছাড়িয়ে বাঁ দিকে আরো কিছু ছোটোখাটো দালান-কোঠা রয়েছে, গুদাম ও গোলাঘর হিসেবে ব্যবহার করা হতো। দূর থেকে সব খালি বলে মনে হলো। নির্জন, খাঁ-খাঁ করছে। দালান-কোঠাগুলোকে বৃত্তাকারে ঘিরে আছে ইউক্যালিপটাস, কয়েক শো গজ লম্বা পথের দু'পাশেও একই গাছ, পথটা চলে গেছে ঝর্না আর ছোটো একটা পুকুরের দিকে। ভারি সুন্দর জায়গাটা, আশপাশের এলাকা থেকে বিচ্ছিন্ন, দলবল নিয়ে চুপিসারে পৌঁছুনো কঠিন।

সবচেয়ে ভালো হতো হেলিকপ্টার নিয়ে এলে। কিন্তু হেলিকপ্টার পেতে হলে দু'দিন আগে চাইতে হবে কর্নেল বেনিনকে। আর আট-চল্লিশ ঘণ্টা দেরি করলে কেমিস্টরা হয়তো বিপদের গন্ধ পেয়ে যেতো বাতাসে।

কর্নেলের লোকেরা নাকি দক্ষ ও সৎ, রানাকে জানালো কালভিন। কর্নেল নিজে তাদেরকে ট্রেনিং দিয়েছেন। তা সত্ত্বেও, নারকো-ডলারের লোভ কে সামলাতে পারবে কে পারবে না, বলা কঠিন। এতো দিনে ডি. এ. এস.-এর চীফ হয়ে যেতে পারতেন বেনিন, যদি না গত বছর এ-ধরনের একটা অপারেশনে বেঈমানী করার জন্যে নিজের দু'জন লোককে তিনি খুন করতেন।

শুকনো একটা চওড়া নালায় নেমে এলো বুইক সিডান। কমিউনি-

কেশন ইকুইপমেন্ট বের করা হলো, তোলা হলো নালার কিনারা ঘেঁষা ছোটো একটা টিবির মাথায়, ওটাকেই কমাণ্ড পোস্ট হিসেবে বেছে নেয়া হয়েছে। এতোক্ষণে অ্যাসল্ট স্কোয়াডের সাথে যোগাযোগ করলেন কর্নেল বেনিন। এখান থেকে দু'মাইল পিছনে কোথাও জড়ো হয়েছে তারা।

চারদিকে তাকিয়ে লম্বা ঝোপ দেখতে পেলো রানা, আন্দাজ করলো মারিজুয়ানা হবে।

'তাই,' বললো কালভিন।

কর্নেলের ক্ষমাপ্রার্থনাসূচক হাসিটাও যেন নির্দয় জল্লাদের। 'কোকা ছাড়াও কলম্বিয়ায় কয়েক শো ধরনের হ্যালুসিনোজেনিক প্ল্যান্ট জন্মায়, মিঃ রানা। কিছু কিছু বনে-জঙ্গলে আপনা থেকেই বাড়ে। আমার সন্দেহ আছে হারামীরা জানে কিনা এখানে এগুলো আছে। জানলেও গুরুত্ব দেবে বলে মনে হয় না। মারিমবা আজকাল কৌলিন্য হারিয়েছে, সবাই এখন কোকেনের ভক্ত।'

কলম্বিয়ায় আসার পর থেকে বহুলোককে ঝিমাতে দেখেছে রানা, কারণটা বোঝা গেল। মাদক সরবরাহের ব্যাপারে প্রকৃতি এখানে উদার, তারই সন্তান ভিক্টর লজেন নিষ্ঠার সাথে ভাই-বেরাদারদের মধ্যে বিলি করছে জিনিসটা। কর্নেলের দিকে ফিরে রানা বিস্ময় প্রকাশ করলো, 'আপনারা সামলাচ্ছেন কিভাবে?'

'কাজটা সহজ নয়, মিঃ রানা। যদি কোনো আইন না থাকতো, এতোদিনে আমরা গোটা কলম্বিয়া থেকে ওদেরকে গায়েব করে দিতে পারতাম। আমার হাতে ক্ষমতা থাকলে ওদের সবার অ্যাপার্টমেন্ট গি-ফোর দিয়ে উড়িয়ে দিতাম।'

কথাটা শুনতে ভালো লাগলো না রানার। লা ব্লানকার মৃত্যু সম্প-

কিন্তু বিবরণ বেশিদিন গোপন থাকবে না জানতো ও, তবে কর্নেল যদি এরইমধ্যে জেনে থাকেন, ধরে নিতে হবে কার্টেলও জেনে ফেলেছে। মাথা নাড়লো ও, বললো, 'আমার বিশ্বাস, আইন থাকতেই হবে। অবশ্য দু'একটা ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমও ঘটতে পারে।'

একটা হাত বাড়িয়ে রানার কাঁধ ধরলেন কর্নেল। চাপ বাড়লো, তবে ব্যথা পাবার মতো নয়। 'আমার ধারণা ছিলো না বিস্ফোরক কেউ এভাবে সাজাতে পারে। অ্যাপার্টমেন্টটা পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে গেল ফার্নিচার আর লোকজনসহ অথচ পাশের অ্যাপার্টমেন্টের দেয়ালে শুধু সামান্য একটু চিড় ধরলো, তিনটে বাচ্চা নিয়ে সুখী দম্পতির ফটোটা পর্যন্ত দেয়াল থেকে পড়লো না!'

'মানতেই হবে, ব্যাপারটা অস্বাভাবিক, কর্নেল। আমি বলবো, কপাল।'

'সম্ভবত,' বললেন বেনিন। 'কিন্তু মিউনিশন এক্সপার্টরা রাস্তার উল্টোদিকে বিধ্বস্ত একটা তেরোতলার টয়লেটটাও পরীক্ষা করেছে। পরীক্ষা করার আসলে কিছু ছিলো না, দেখে মনে হয়েছে অ্যাটম বোমা মেরে গুঁড়িয়ে দেয়া হয়েছে সেটা।'

'পয়ঃনিষ্কাশনের জন্যে অত্যন্ত ক্ষতিকর একটা কাজ।'

'জনস্বাস্থ্য হুমকির সম্মুখীন হয়, এমন কোনো কাজ আমরা বরদাস্ত করতে পারি না,' বললেন কর্নেল। 'কাজটার জন্যে দায়ী ব্যক্তি আমার সামনে উপস্থিত থাকলে, তাকে আমি বলতাম, অযথা বারুদ খরচ করবেন না।'

'ঠিক আছে, দেখা হলে কথাটা তাকে আমি জানিয়ে দেবো।'

রানার কাঁধ থেকে হাত নামিয়ে হেসে উঠলেন কর্নেল। 'তাকে আরো জানিয়ে দেবেন, প্লিজ,' বললেন তিনি, 'বাস্কো কুইনকে বিদায়

করে দেয়ায় আমি ভারি খুশি হয়েছি। সত্যি কথা বলতে কি, ভদ্রলোকের প্রতি আমরা কলম্বিয়ানরা কৃতজ্ঞ। তার কারণও আছে।'

'বাসুকো কুইন, বাহ্ !'

'পরিশোধিত কোকেন, মিঃ রানা, ধনীলোকের বখাটে ছেলেরা কেনে,' বললেন কর্নেল। 'কিন্তু বাসুকো সস্তা, নিম্নমধ্যবিত্ত আর গরীব পরিবারের বেকার যুবকদের মাথাগুলো চিবিয়ে খেয়ে ফেলছে। বাসুকো কুইন বিদায় নেয়ায় সরবরাহে প্রচণ্ড বিঘ্ন ঘটবে বলে আমার ধারণা। ভদ্রলোক সত্যি একটা কাজের কাজ করেছেন। সি-ফোর সত্যি খুব কাজের জিনিস, উপযুক্ত হাতে পড়লে।'

নিঃশব্দে কাঁধ ঝাঁকালো রানা।

'শুনেছি,' কর্নেল বললেন, 'মেডিলিনের হোটেল স্যুইটেও নাকি এই একই জিনিস ব্যবহার করা হয়েছিল।'

'আপনি বলতে চাইছেন, ভদ্রলোক জেনুইন সেন্স অভ হিউমার-এর অধিকারী ?'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকালেন কর্নেল। 'আমার তাই ধারণা। আমার ধারণা, বিরাট বিরাট সমস্যা কিভাবে সমাধান করতে হয় তিনি জানেন। তিনি যদি এই মুহূর্তে এখানে উপস্থিত থাকতেন তাহলে কোকেন র‍্যাঞ্চে চুপিসারে ঢোকার একটা চমৎকার উপায় বাতলাতে পারতেন আমাদের।'

উপত্যকার মেঝেতে বুইকটা পৌঁছুনোর পর থেকে এই সমস্যাটা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করছে রানা। নিজের প্ল্যানটা ব্যাখ্যা করলো ও। গোটা একটা দলকে নয়, কারো চোখে ধরা না পড়ে হাসিয়েনদার ভেতর মাত্র একজন লোককে প্রথমে ঢোকাতে চায় ও। মেইন বাঙ্ক কাটিয়ে [illegible] নেবে সে, সাথে থাকবে অটোমেটিক রাইফেল, ফলে

হাসিয়েনদার ভেতর অনেক দূর পর্যন্ত কাভার দিতে পারবে সে। তার-পর অ্যাসল্ট স্কোয়াড ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করবে।

'কিন্তু ভদ্রলোককে যদি গার্ডরা এগোতে দেখে ফেলে?'

'আমরা যে লোকের কথা আলোচনা করছি, তাকে দেখতে পাবে না,' বললো রানা। 'তবে সে একটা সুবিধে চাইতে পারে।'

'কি হতে পারে সেটা?' আগ্রহের সাথে জানতে চাইলেন বেনিন।

'বিশ ফুট লম্বা প্রাইমাকর্ড,' বললো রানা। 'দুই কেস গ্রেনেড—একটা কনকাশন, একটা ইনসেনডিয়ারি। এ-সব তাকে ডেলিভারি দিতে হবে এখানকার অপারেশন সফল হবার পর।'

'পজিশনে পৌঁছুতে কতোক্ষণ সময় লাগবে আপনার, মিঃ রানা?'

'পঁচিশ মিনিট,' বললো রানা, সরাসরি কথা বলার সুযোগ পেয়ে স্বস্তিবোধ করলো।

সজোরে রানার কাঁধ চাপড়ে দিলেন কর্নেল। 'আমি রাজি।'

হাসিয়েনদার চারদিকে আট ফুট উঁচু পাঁচিল, পাঁচিলের মাথায় কাঁচের টুকরো গাঁথা, তার ওপর তিন ফুট উঁচু কাঁটাতারের বেড়াও আছে। কোনোটাকেই সমস্যা বলে মনে করলো না রানা।

প্রতিটি পুরনো পাঁচিলে দুর্বল জায়গা থাকবে। দুটো খুঁজে পেলো রানা, দক্ষিণ দিকে দুটো পাঁচিল যেখানে এক হয়েছে, আর পশ্চিম ভাগের শুরুতে একটা গাছ যেখানে পাঁচিল টপকে ভেতর দিকে ঝুঁকে আছে। দুর্বল জায়গাগুলো চিহ্নিত করার পর সতর্কতার সাথে এড়িয়ে গেল রানা। হাসিয়েনদার ভেতরে যদি আধুনিক সেনসর ইকুইপমেন্ট থাকে, ওই দুর্বল জায়গাগুলোর দিকেই বিশেষ ভাবে তাক করা আছে।

শুকনো নালার ভেতর দিয়ে এগোলো রানা। একটা পিরিখাদের

তলা দিয়ে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিলো, হাসিয়েনদাকে চক্কর দিচ্ছে। ঢালু হয়ে নেমে গেছে গিরিখাদের মেঝে, সামনে এক সময় পানি দেখা গেল। রওনা হবার আগে কাপড়চোপড় ছেড়ে শুধু শর্টস্ পরেছে রানা, প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো সব সাইড পকেটে ভরে নিয়েছে। পানির কিনারায় পৌঁছে চারদিকটা ভালো করে দেখে নিলো ও, তার-পর নেমে পড়লো।

ঘোলা পানি, সাপ থাকলেও সহজে চোখে পড়বে না। শির শির করে উঠলো গা।

পানি কম, মাত্র কোমর সমান, দাঁড়ালেই কারো চোখে পড়ে যাবার ভয় আছে। দূরত্বটা পেরোবার সময় পানির ওপর একবারও মাথা তুললো না রানা। পাঁচিলের কাছে পৌঁছুলো ও, দেখলো খাদটা ভেতর দিকে চলে গেছে। কী রিঙ দিয়ে ড্রেনেজ ওয়ার কাটলো ও।

ট্র্যাপ কাটার পর আবার পানির নিচে ডুব দিলো রানা, পাঁচিলের তলা দিয়ে ঢুকে পড়লো হাসিয়েনদার ভেতর। পানির ওপর মাথা তুলে চারদিকটা দেখার পর আবার পাঁচিলের বাইরে বেরিয়ে এলো ও, অল-ওয়েদার ব্যাগে ভরা উজি মডেল বি-টা নিয়ে এলো। কর্নে-লের উপহার, নাইন এমএম, ম্যাক্সিমাম ফায়ারিং রেট প্রতি মিনিটে ছ'শো রাউণ্ড।

দ্বিতীয়বার পাঁচিল গলে ভেতরে ঢোকার পর আরো বিশ ফুট সাঁতার কেটে এগোলো রানা। ওর পাশে একটা লম্বা দোচালা দেখা গেল, দেয়ালগুলো নেই বললেই চলে। পানি থেকে শুকনো মাটিতে উঠে তিন মিনিট স্থির হয়ে বসে থাকলো ও। কাউকে দেখা গেল না, কিছু নড়ছে না, ইতিমধ্যে শুকিয়ে এলো শরীরটা। পোর্টেবল জেনারে-টরের আওয়াজ বাকি সব শব্দকে চাপা দিয়ে রেখেছে। সূক্ষ্ম কোনো

শব্দ রানা যেমন শুনতে পাচ্ছে না, শুনতে পাচ্ছে না প্রতিপক্ষও।

খোলা মাঠের ওদিকে বাঙ্কহাউসটা, তিরিশ গজ দূরে। ভেতরে কেউ থাকতে পারে ভেবে তাকিয়ে ছিলো রানা, এক লোক বেরিয়ে এলো। পরনে খাকি শার্ট, চোখে চশমা, রানার মতোই লম্বা। কাপড়চোপড় অনেকটাই রানার মতো, কাজে লাগলেও লাগতে পারে।

লোকটা নিরস্ত্র। এ-থেকে অবশ্য কিছু বোঝা যায় না। অস্ত্র থাকলেই যে সেটা সাথে নিয়ে ঘুরে বেড়াতে হবে তার কোনো মানে নেই। এখানে যদি কোকেন প্রসেসিং ল্যাব-এর অস্তিত্ব থাকে, হাসিয়েনদার প্রতিটি ঘরে অস্ত্র থাকার কথা।

পিছনের একটা দরজা-দিয়ে একটা বাড়িতে ঢুকলো লোকটা। দরজায় পর্দা ঝুলছে। লোকটা ফিরে আসতে পারে ভেবে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলো রানা। তারপর পানির কিনারায় সিধে হয়ে দাঁড়ালো, খোলা জায়গাটা ধরে শান্ত সতর্কতার সাথে সামনে বাড়লো। ব্যাগে ভরা উজিটা ওর বাঁ পায়ের সাথে আটকানো। পাঁচটা ক্লিপ পকেটে।

এগোচ্ছে বাঙ্কহাউসের দিকে, দরজা-খোলা একটা গোলাঘরকে পাশ কাটাতে গিয়ে থমকে দাঁড়ালো। ভেতরে টয়োটা পিকআপ, মিতসুবিসি কার্গো ভ্যান, আর একটা স্পোর্টস-মডেল নিশান রয়েছে। দক্ষিণ আমেরিকায় পা দিয়েছে জাপানীরা। হুডগুলো তুলতে চার মিনিট সময় লাগলো রানার, অলটারনেটরের সাথে সংযুক্ত তারগুলো খুলতে আরো দু'মিনিট ব্যয় হলো। কোনো শব্দ না করে, ধীরে ধীরে নামিয়ে রাখলো হুড।

গোলাঘরে পিছনেও একটা দরজা রয়েছে, অদ্ভুত ব্যাপার। সেটা দিয়ে বেরিয়ে হাসিয়েনদার বাইরের পাঁচিল আর গোলাঘরে মাঝখান দিয়ে ছ'ফুটের মতো এগোলো রানা, পৌঁছে গেল বাঙ্কহাউসের পিছনে।

তিনটে জানালা, হা-হা করছে। দেয়াল ঘেঁষে প্রথমটার দিকে এক ইঞ্চি করে এগোলো রানা। উঁকি দিতেই চোখ পড়লো এক লোকের ওপর। একটা ফিল্ড কট-এ শুয়ে আছে। চোখ বন্ধ, নিয়মিত নিঃশ্বাস পড়ছে। ভেতরে আর কেউ আছে বলে মনে হলো না। তবু, ঝুঁকি নেয়ার কোনো মানে হয় না। হামাগুড়ি দিয়ে প্রথম জানালার নিচ দিয়ে সামনে বাড়লো ও। থামলো দ্বিতীয়টার নিচে এসে।

সতর্কতা অবলম্বন করায় নিজের ওপর খুশি হলো রানা। বাঙ্কহাউসের শেষ দিকে, চারটে মনিটরসহ একটা টেলিভিশন কনসোল-এর সামনে বসে রয়েছে সশস্ত্র একজন গার্ড। গোলাঘর থেকে সরাসরি বাঙ্কহাউসে আসেনি রানা, এসেছে গোলাঘরের পিছন থেকে বাঙ্কহাউসের পিছন দিকে, তা না হলে মনিটরে ওকে দেখে ফেলতো গার্ড। বাকি মনিটরগুলোয় হাসিয়েনদার সামনের গেট, গোলাঘরের মাথা থেকে চারদিকের দৃশ্য, আর বাইরের পাঁচিলের দুর্বল জায়গাগুলোর একটাকে দেখা যাচ্ছে।

একজনের পক্ষে চারটে মনিটরে চোখ রাখা সহজ কাজ নয়, অনেকক্ষণ ধরে ডিউটিতে থাকলে তার ভুল-ভ্রান্তি হওয়া স্বাভাবিক। রানাকে যদি লোকটা দেখেও থাকে, নিজেদের একজন লোক ভেবে সচকিত হয়নি। উজি ভরা ব্যাগটা পায়ের সাথে আটকে রেখে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছে রানা।

আর আড়াই মিনিট পর জিরো আওয়ার। কাজেই সময় নষ্ট করার উপায় নেই। কর্নেল বেনিনকে নির্দিষ্ট একটা সময় জানিয়ে দিয়েছে রানা, তার আগেই বাঙ্কহাউসে পজিশন নেয়ার কথা ওর। জিরো আওয়ারের মধ্যে অবজারভেশন পোস্টটা দখল করা সম্ভব হলে কর্নেলের অ্যাসল্ট স্কোয়াড প্রায় বিনা বাধায় ঢুকতে পারবে ভেতরে।

কাজটা দ্রুত সারার ওপর নির্ভর করছে অপারেশনের সাফল্য, দেরি করলে অনেক প্রমাণ নষ্ট করে দেবে শত্রুরা।

সশস্ত্র লোকটার ওপর একটা চোখ রেখে জানালার লোহার গ্রিলে তিনটে গুলি করলো রানা। লোকটা ওর দিকে ফিরে হোলস্টার থেকে পিস্তল বের করে ফেলেছে দেখে চতুর্থ গুলিটা করলো তার কব্জিতে। ভাঙা গ্রিল দিয়ে ভেতরে ঢুকলো ও, সাপ্রেসর থাকায় উজি তেমন কোনো শব্দই করেনি। মধ্যবর্তী খোলা দরজায় দ্বিতীয় লোকটাকে দেখা গেল, চোখে এখনো ঘুম লেগে রয়েছে। রানাকে দেখে পিছিয়ে গেল সে, পাশের চেয়ারে পড়ে থাকা কেজি-নাইনটা ছোঁ দিয়ে তুলে নিলো। পিস্তলের আকার হলেও ওটা একটা অটোমেটিক রাইফেল। রানার দিকে তাক করতে যাবে, তারও কব্জিটা গুঁড়িয়ে দিলো উজির একটা বুলেট। প্রথম লোকটা মেঝেতে পড়ে গড়াগড়ি খাচ্ছে, তাকে অনুকরণ করলো দ্বিতীয় লোকটা।

সমস্যার আংশিক সমাধান হয়েছে, কাজেই পালা করে লোক দু'-জনের মাথার পাশে লাথি মারতে হলো রানাকে অজ্ঞান করার জন্যে।

অস্ত্র দুটো সরিয়ে ফেললো রানা। লোক দু'জনকে বাঁধলো, টেনে নিয়ে এসে দু'জনকেই ঠেলে দিলো কটের নিচে। টেলিভিশন মনি-টরের কোনো ক্ষতি হয়নি, হাসিয়েনদার ওপর নজর রাখার কাজ বিশ্বস্ততার সাথে করে যাচ্ছে ওগুলো।

গার্ডের চেয়ারটা সিধে করে বসলো রানা। অ্যাসট্রে থেকে সিগা-রেট তুলে নেভালো সেটা। মনিটরে চোখ রেখে দেখলো, রাস্তা ধরে পায়ে হেঁটে ও গাড়িতে করে এগিয়ে আসছে পঁয়তিরিশ জন শুভানুধ্যায়ী।

খোলা একটা জীপের সামনের দিকে দাঁড়িয়ে রয়েছেন কর্নেল বেনিন, ঠিক যেন জেনারেল প্যাটন।

বারো

কিছুক্ষণের জন্যে নালার পানি সাদা হয়ে গেল। প্রতিটি ব্যাগে এক কিলোগ্রাম কোকেন ক্রিস্টাল, মুখ ছিঁড়ে নালার পানিতে উপুড় করে ধরলো কর্নেলের লোকেরা। যুক্তরাষ্ট্রের রাস্তায় কয়েক মিলিয়ন ডলারে বিক্রি করা যেতো ওগুলো।

হাসিয়েনদার ভেতর এমন কোনো জায়গা নেই যেখানে কেমিকেল আর কোকেন প্রসেসিং ইকুইপমেন্ট পাওয়া গেল না। বিপুল পরিমাণ পেস্টও উদ্ধার করা হলো, এখনো ক্রিস্টালে পরিণত করা হয়নি। পরিশোধনে কি কি লাগে জানার পর বুঝতে পারলো রানা, কোকা পাতা থেকে পেস্ট, তারপর পেস্ট থেকে ক্রিস্টাল তৈরিতে বাধা দেয়া কেন এতো কঠিন। সাধারণ কিছু কেমিকেল হলেই চলে—পটাশিয়াম পারমাংগানেট, হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড, বেনজিন, অ্যাসিটোন আর ইথার।

কোকেন পেস্টই আসলে ড্রাগ ব্যবসার প্রধান উপকরণ। সবুজ কাদার মতো দেখতে, ভেজা ভেজা, সামান্য অ্যামোনিয়ার গন্ধ পাওয়া যায়। বহুস্তর বিশিষ্ট পদ্ধতির সাহায্যে কোকা পাতা থেকে পেস্ট

তৈরি করা হয়। পেস্ট শুকিয়ে নিয়ে বাস্তুকো হিসেবে ছাড়া হয় বাজারে। আরো পরিশোধনের পর বেরিয়ে আসে কোকেন হাইড্রো-ক্লোরাইড বা মহামূল্যবান ক্রিস্টাল।

'কি ধ্বংস করছেন সে-সম্পর্কে আপনার ধারণা থাকা দরকার,' রানাকে বললেন কর্নেল। জড়ো করা ইকুইপমেন্ট আর কোকেন পেস্টের কাছে ওকে নিয়ে এলেন তিনি। তথ্য ও বিবরণ একজন বিশে-ষজ্ঞর কাছ থেকে পেলো রানা।

উৎপাদনের সাথে জড়িত পাঁচজন লোককে গ্রেফতার করা হলো। ছ'জন ছিলো ওরা, একজন কর্নেলের অ্যাসল্ট টিমের হাতে মারা পড়েছে। গার্ড ছিলো ওই দু'জনই। তাদের প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

ককেরস লোকটা আসলে বোকামি করে মারা পড়লো। তাকে সাবধান করা হলেও, ওদের কথা কানে তোলেনি। এক ছুটে গোলা-ঘরে গিয়ে ঢোকে সে, অচল টয়োটা পিকআপ নিয়ে পালাবার চেষ্টা করে। কর্নেলের লোকেরা জানতো না গাড়িটা অকেজো করে রেখেছে রানা, তারা কোনো ঝুঁকি না নিয়ে গুলি ছোঁড়ে। পিকআপের ছাদ উড়িয়ে দেয় তারা, বডিটা চুরমার করে ফেলে। অটোমেটিক রাই-ফেলের অসংখ্য বুলেট খেয়ে গাড়ি এবং ড্রাইভার স্পেয়ার পার্টসে পরিণত হয়।

গোটা দেশ জুড়ে হাজার হাজার লোক কোকেন নিয়ে ব্যবসা করছে, সরকারী প্রশাসনও সর্বশক্তি নিয়ে লেগে আছে তাদের পিছনে, কাজেই রানা ধারণা করলো কোকেন উদ্ধারের এ-ধরনের ঘটনা প্রায়ই ঘটে কলম্বিয়ায়। কর্নেল বেনিন ওর ভুলটা ভেঙে দিলেন। যারা গ্রেফতার হয়েছে তাদের সবার কাছে অস্ত্র পাওয়া গেছে, নিহত লোকটার সাথেও

কেজি-নাইন ছিলো, কাজেই গার্ডের সংখ্যা মাত্র দু'জন মনে করার কোনো কারণ নেই। যদিও গার্ডের সংখ্যা তেমন কোনো তাৎপর্য বহন করে না, কার্টেলের নিরাপত্তা রহস্য অন্যখানে। হানা দেয়ার পরিকল্পনা যেখান থেকেই করা হোক, সবখানে কার্টেলের লোক আছে, আগেভাগে জেনে ফেলে তারা। হানা দিতে এসে দেখা যায় লোকজন, ইকুইপমেন্ট, পেস্ট ক্রিস্টাল, কেমিকেল, কিছুই নেই। তারপরও যদি কোকেন ধরা পড়ে, মোটা টাকার বিনিময়ে ফেরত পাবার চেষ্টা করে ওরা। ধরা পড়লো পঞ্চাশ কিলো, সরকারী খাতায় লেখা হলো পাঁচ কিলো। ককেরসরা গ্রেফতার হলো, কেস দায়ের করার আগে হাজত থেকেই তাদেরকে ছাড়িয়ে নেয়া হয়। 'বলতে পারেন আজ আমি একটা অসাধ্যসাধন করেছি,' বললেন কর্নেল বেনিন। 'গত কয়েক বছরে একবারে এতো কোকেন এই প্রথমবার ধরা পড়লো। দুঃখের বিষয়, আমি কোনো প্রচার পেলাম না। প্রচার মাধ্যমগুলো উপস্থিত থাকলে গোটা কলম্বিয়ায় আজ আমি হিরো বনে যেতাম। বলা যায় না, রাজনীতিতে আমার হয়তো নতুন একটা ক্যারিয়ার তৈরি হতো।'

'আপনার উচিত ছিলো ওদেরকে খবর দিয়ে রাখা,' বললো রানা।

'বলেন কি! ওদেরকে কার্টেলের চেয়ে কম বিপজ্জনক ভাববেন না। শুধু একটু আভাস পেলেই ওরা বুঝে ফেলতো কোথায় আসছি আমরা অপারেশনে। যেখানে দাঁড়িয়ে কথা বলছি এখানে আমার লাশ দেখতে পেতেন।' কর্নেলের চেহারা ম্লান হয়ে গেল। 'সাংবাদিক মহলে দুর্নীতি ঢুকেছে বলেই তো কলম্বিয়ার সাধারণ মানুষ জানে না দেশে কি ঘটছে।'

'বিকল্প ব্যবস্থা আছে,' শান্তভাবে বললো রানা। 'টেলিভিশনে আপনি কিছু বলতে চান? কী সেটা?'

দখল করা হাসিয়েনদার চারদিকে তাকালেন কর্নেল, যেন আশা করছেন আশপাশে কোথাও ক্যামেরাম্যান আর রিপোর্টাররা লুকিয়ে আছে। 'বলবো, আমার স্বপ্ন সত্যি হতে শুরু করেছে। কলম্বিয়াকে আমি কোকেনমুক্ত করে ছাড়বো। ব্যস, প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচনে দাঁড়াবার পথ পরিষ্কার হয়ে যাবে আমার।'

'প্রেসিডেন্ট হিসেবে আপনি ভালো করবেন,' সহাস্যে বললো রানা। 'খবর পেলে আমি এসে আপনার পক্ষে জনমত গঠনে সাহায্য করবো।'

কিসের যেন একটা অভাব বোধ করলেন কর্নেল। বাস্তবতার, সম্ভবত। 'মিঃ রানা,' গম্ভীর স্বরে বললেন তিনি, 'আপনি এরইমধ্যে যথেষ্ট সাহায্য করেছেন। কর্নেল বেনিন আপনার প্রতি ভারি কৃতজ্ঞ। কথা দিচ্ছি, সেটা আপনার কাছে নগণ্য বলে মনে হবে না।'

'বাঙ্কহাউসে এমন একটা জিনিস আছে, যেটা আপনার কাছে মনে হবে অমূল্য।'

ভুরু কুঁচকে রানার দিকে তাকিয়ে থাকলেন কর্নেল বেনিন। 'তাই?'

'বিশ্বাস না হয়, আসুন; নিজের চোখেই দেখবেন,' বলে কর্নেলকে নিয়ে বাঙ্কহাউসে ফিরে এলো রানা। টেলিভিশন মনিটরগুলো আগেই দেখেছেন কর্নেল। এবার রানা তাকে ভিডিও ক্যামেরাটা দেখালো। 'হাসিয়েনদায় আপনি ঢুকলেন, আমিও দৃশ্যটা রেকর্ড করে রাখলাম। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত যা ঘটেছে, সবই ওই ক্যামেরায় বন্দী করা হয়েছে।'

'আপনি সিরিয়াস?' আনন্দে অভিভূত কর্নেলের মুখ থেকে আর কোনো শব্দ বেরোলো না।

'চারটে মনিটর, সব ক'টার প্রোগ্রাম রেকর্ড করা সম্ভব ছিলো না,'

বললো রানা। 'তবে একবার এটা, একবার ওটা থেকে রেকর্ড করেছি আমি। অপারেশনের প্রতিটি পর্যায়ে প্রথম সারিতে ছিলেন আপনি, কাজেই ক্যামেরাও সব সময় আপনাকে সামনে পেয়েছে।'

বোবা হয়ে গেছেন কর্নেল। ধীরে ধীরে এগিয়ে এলেন তিনি, আলতো হাত বোলালেন মনিটর স্ক্রীনে, ওগুলো যেন আলাউদ্দীনের আশ্চর্য প্রদীপ। ধীরে ধীরে ঘুরলেন তিনি। তারপর অকস্মাৎ, বিনা নোটিসে, ছুটে এসে বুকে জড়িয়ে ধরলেন রানাকে।

রানার কানে কানে কালভিন জানালো, 'প্রাণাধিক বন্ধুকে ছাড়া আর কাউকে উনি আলিঙ্গন করেন না।'

'আপনি দেবদূত, মিঃ রানা।'

'তা নয়, কর্নেল,' বললো রানা। 'আসলে টেপটার কোয়ালিটি খুব ভালো।'

কথাটা শোনার সাথে সাথে সম্ভাবনা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা শুরু করলেন কর্নেল। 'কিছু একটা করা যায় না?'

'ভালো একজন ফিল্ম এডিটর খুঁজে বের করুন,' বললো রানা। 'তার কাজ হবে গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলো রেখে বাকি সব টেপ থেকে বাদ দেয়া। সেরকম একজন লোক এখানে পাবেন বলে মনে হয়?'

'পেতেই হবে আমাকে,' বললেন কর্নেল, জানেন টেলিভিশন নেটওঅর্ক সরকার নিয়ন্ত্রিত হওয়ায় তাঁর কাজ অনেক সহজ হয়ে যাবে।

'ফিল্মটা অবশ্য সাদা কালো,' বললো রানা।

'হ্যাঁ।' চেহারা ম্লান হয়ে গেল কর্নেলের। 'কি আর করা!'

'করার একেবারে কিছু নেই তা সত্যি নয়,' বললো রানা। 'আমি কি কোনও পরামর্শ দিতে পারি?'

'আপনাকে অনুরোধ করছি আমি,' বললেন কর্নেল। 'অনুরোধে

কাজ না হলে, নির্দেশ দিচ্ছি—তাড়াতাড়ি একটা পরামর্শ দিন।'

'এডিটরকে ফিল্মটা দিয়ে বলবেন, সে যেন ভালো একটা কপি তৈরি করে। কপিটা আপনি পাঠিয়ে দেবেন প্যাসিফিক কালার-আইজ-এ, লস অ্যাঞ্জেলস, ক্যালিফোর্নিয়ায়। টেপটা প্রসেস করবে ওরা, কালো আর সাদা টোন-এ ন্যাচারাল টিন্ট ব্যবহার করবে। অল্প সময়ে তাক লাগানো কাজ করে ওরা। আর যদি ওদেরকে জানান যে মাসুদ রানার বন্ধু আপনি, কাজটা আরো যত্নের সাথে, আরো তাড়াতাড়ি করবে ওরা। আপনাকে কসম খেয়ে বলতেই হবে, চেহারাটা ওরা আরো ভালো করে দিয়েছে।'

'লজ অ্যাঞ্জেলস,' মুখস্থ করছেন কর্নেল। 'কালার আইজ।'

'মুখস্থ করার দরকার নেই,' বললো রানা। 'আমি লিখে দেবো সব।'

'সেটাই ভালো হবে, মিঃ রানা। মাথা যখন সম্ভাবনা নিয়ে ব্যস্ত থাকে, সব কথা ঠিকমতো মনে থাকে না।'

'শুধু তখন, কর্নেল?'

গলা ছেড়ে হেসে উঠলেন কর্নেল। 'কি চান আপনি আমার কাছে, মিঃ রানা? কি এমন জিনিস যা আপনাকে আমি দিতে পারি না?'

স্বস্তির সাথে ভাবলো রানা, যাক, শেষ পর্যন্ত কাজের কথায় ফেরা গেছে।

'হেলিকপ্টার?' জিজ্ঞেস করলো কালভিন। 'খেলনার ওপর তোমার দেখছি ভারি ঝোঁক।'

'ওটা ব্যাটল-ফিল্ড টেস্টেড, এইচইউ-টোয়েনটিথ্রি,' বললো রানা। 'খেলনা নয়।'

'আদ্যিকালের পুরনো একটা ফড়িং ওটা,' বললো কালভিন। 'কি মনে করো, ঝকড়মার্কা একটা হেলিকপ্টার তোমাকে ভিক্টর লজেনের কাছে পৌঁছে দেবে?'

'পৌঁছে দিতে সাহায্য করবে,' বললো রানা। 'পাহাড়ী এলাকা, গাড়িতে কয়েক মাইল যেতে হলে কয়েক ঘণ্টা লেগে যায়। লজেনের সমান মোবিলিটি পেতে হলে আমাদের একটা হেলিকপ্টার পেতে হবে।'

'হেলিকপ্টার তুমি চালাবে কিভাবে?' জিজ্ঞেস করলো কালভিন। 'দু'বার বলেছো, মাথার ব্যথাটা কমেনি। বাঁ হাতটা তো এখনো অকেজো।'

'একজন পাইলট খুঁজে নেয়া কঠিন হবে না,' বললো রানা। 'একান্ত যদি না পাওয়া যায়, এক হাতে আমিই চালাবো।'

'তারপর?' চ্যালেঞ্জের সুরে প্রশ্ন করলো কালভিন।

'তারপর লজেনকে খুঁজে বের করবো।'

'এক হপ্তা সময় দেয়া হলো তোমাকে, আজ থেকে ধরা হবে।'

'অতো সময় লাগবে না।'

'তাহলে তো ভালোই। কর্নেলও তোমার ওপর খুশি হবেন, কারণ আজকের এই অপারেশনের পর তাঁর কোনো নিরাপত্তা নেই।'

'জনপ্রিয়তার তুঙ্গে উঠে যাবেন তিনি,' বললো রানা। 'সেটাই তাঁকে যথেষ্ট নিরাপত্তা দেবে।'

'ভদ্রলোক বোকা নন,' বললো কালভিন। 'তিনি জানেন, পুরস্কার যেমন আছে, তেমনি ঝুঁকিও আছে।'

'তোমাদেরকে আমি কথা বলতে দেখেছি। তাকে তুমি কি বললে?'

'বলেছি, তুমি একটা জুয়াড়ী। আর, একজন জুয়াড়ী যখন জিতছে,

তার সাথে লেগে থাকাই সবদিক থেকে ভালো।'

'আর যখন জিতছে না?'

'তখন কি করতে হবে কর্নেলকে তা বলে দিতে হবে না।'

রানাকে আরেকটা প্রতিশ্রুতি দিলেন কর্নেল, প্রতিশ্রুতি রক্ষাও করলেন। প্রধান কেমিস্টকে রানার হাতে ছেড়ে দিলেন তিনি।

লোকটাকে প্রথমবার দেখেছে রানা হাসিয়েনদায় ঢোকার পরপরই। চোখে চশমা, চেহারায় আত্মমগ্ন একটা ভাব। আলোচনায় ভালো ফল না পাওয়া পর্যন্ত লোকটাকে কোথাও পাঠানো হবে না।

কর্নেলের লোকজন আগেই তাকে মারধর করেছে। রাইফেলের বাঁট দিয়ে মারায় কপালের ওপর ফুলে আছে, রক্ত ঝরছে সেখান থেকে। চশমাটাও অক্ষত নেই। পঞ্চান্ন গ্যালন ঈথার ভরা একটা ড্রামের ওপর বসানো হয়েছে তাকে, ড্রামের সাথে হাত-পা বেঁধে।

স্মোকহাউসের পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে কর্নেলের দু'জন লোক। ইন্টারোগেশনে কি ধরনের পদ্ধতি ব্যবহার করা হতে পারে তাই নিয়ে আলোচনা করছে তারা। একজনের ধারণা, ড্রামটা পানিতে ফেলে দেয়া হবে, নালায় পানি যেখানে সবচেয়ে গভীর। ড্রামের কোন্ দিকটা ডোবে, কোন্ দিকটা ভাসে দেখার জন্যে আগ্রহ প্রকাশ করলো সে। দ্বিতীয়জন বললো, তার খুব মজা লাগবে ড্রামটা যদি শুকনো, ঢালু নালা দিয়ে গড়াতে শুরু করে।

'তোমরা যাও তো,' নির্দেশ দিলো রানা। 'টেকনিশিয়ানের সাথে কথা বলতে দাও আমাকে।'

সাথে সাথে সরে গেল লোক দু'জন, তবে খুব বেশি দূরে নয়। ওই সুরে তাদের সাথে অন্য কেউ কথা বললে উত্তরে হয়তো গুলিই করে

বসতো, কিন্তু রানা কি করেছে জানে তারা, ওর প্রতিটি আচরণের প্রতি মৌন সমর্থন দিয়ে যাচ্ছে সবাই।

'তুমি প্রধান পাচক,' ব্যারেলের সাথে বাঁধা লোকটাকে বললো রানা। 'চীফ কেমিস্ট।'

কথা বললো না লোকটা। বাক শক্তি হারিয়ে ফেলেছে কিনা বোঝা গেল না, তবে অন্তত একটা শারীরিক নিয়ন্ত্রণ নিঃসন্দেহে হারিয়েছে। তার খাকি শর্টস ভিজে গেছে, গন্ধটা চেনা গেল।

'তোমার নাম কি ?'

এবারও কথা বললো না লোকটা। পাঁচ সেকেণ্ড অপেক্ষা করে আরো সামনে চলে এলো রানা। লোকটার সামনে হাঁটু গেড়ে বসলো ও, কাস্তে আকৃতির রেঞ্জ দিয়ে ব্যারেলের মাথায় বসানো ছিপিটা ঢিলে করলো। এক কাপের মতো ঈথার পড়লো মাটিতে, মিষ্টি একটা গন্ধ ছড়িয়ে পড়লো বাতাসে। ছিপিটা তাড়াতাড়ি বন্ধ করে দিলো রানা, শুকনো মাটি তরল ঈথার শুষেও নিলো এক নিমেষে, তারপরও বাষ্প-টুকু রয়ে গেল বাতাসে। একজন কেমিস্ট হিসেবে লোকটা খুব ভালো করেই জানে যে বাতাসের সংস্পর্শে আসামাত্র বাষ্পে পরিণত হয় ঈথার, সেই সাথে ওটা একটা বিপজ্জনক বিস্ফোরক পদার্থও বটে।

সিধে হলো রানা, ঘুরলো, ধীর পায়ে হেঁটে এলো কর্নেলের লোক দু'জনের কাছে। নরম সুরে একটা সিগারেট চাইলো ও। তাড়াতাড়ি সিগারেট বাড়িয়ে দিলো দু'জনেই, রানার উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে হাসছে। রানা সিগারেটটা ধরাতে কয়েক পা দ্রুত পিছিয়ে গেল তারা। ধীর পায়ে ঈথার ভরা ব্যারেল আর ওটার ওপর বসা বন্দীর দিকে এগোলো রানা।

লোকটার কাছ থেকে বারো ফুট দূরে দাঁড়ালো ও, লোকটা মুখ

খোলে কিনা দেখার জন্যে অপেক্ষা করলো কয়েক সেকেণ্ড, তারপর কাঁধ ঝাঁকিয়ে আবার এগোলো। ড্রামের সামনে এসে দাঁড়ালো ও। কেমিস্টের হাত দুটো কোলের ওপর পড়ে আছে, কব্জির নিচে আঙুলের গোড়া পর্যন্ত পেঁচানো হয়েছে রশি, ফলে আঙুলগুলো পরস্পরের সাথে সেঁটে আছে। কথা না বলে দুই আঙুলের মাঝখানে জ্বলন্ত সিগারেটটা ঢুকিয়ে দিলো রানা। ডি. এ. এস. ট্রুপার দু'জন আরো কয়েক পা পিছিয়ে গেল। পিছিয়ে এলো রানাও। তারপর জিজ্ঞেস করলো, 'তোমার নাম কি?'

'জুয়ান ভিলা।'

'তোমার ঠিকানা আর ঘনিষ্ঠ আত্মীয়স্বজনের নাম বলো।'

'তার কোনো দরকার হবে না, সিনর।'

'বেশ,' বললো রানা। 'তাহলে বলো ভিক্টর লজেনকে কোথায় পাওয়া যাবে।'

ব্যাকুলদৃষ্টিতে রানার দিকে তাকালো কেমিস্ট, গলা চড়িয়ে বললো, 'সিনর, এমন প্রশ্ন করুন যার উত্তর দিতে পারবো আমি। ঈশ্বরের দোহাই, ঈথার অত্যন্ত ভয়ংকর জিনিস।'

'চেইনের পরবর্তী লিঙ্ক কে, ভিলা? লজেনের নিচের লোকটা?'

সিগারেটের গরম ধোঁয়া ভিলার আঙুলে ছ্যাঁকা দিচ্ছে। শারীরিক কোনো ব্যথা এখনো অনুভব করছে না, তবে খানিক পরই সরাসরি আগুনের ছ্যাঁকা খাবে। তখন কি ঘটবে? 'আমি আপনাকে জানাতে পারি কোথায় কোকা পাতা চাষ হয়। আপনি চাইলে কোকা পাতার গুদামগুলো দেখাতে পারি।'

'কোকা ঝোপ খুঁজতে আসিনি আমি,' বললো রানা। 'কোকা চাষীদের খবর জেনে আমার কোনো কাজ হবে না। কোথায় পেস্ট

তৈরি হয় তাও আমার জানার দরকার নেই। এ-সব তুমি জানো, ভিলা।'

'প্লিজ, সিনর। দয়া করে আমার পরিবারের কথা বিবেচনা করুন।'

'তোমার পেশায় ঈথার নিশ্চয়ই একটা হাতিয়ার,' বললো রানা, যেন গুরুত্বহীন বিষয়ে হঠাৎ আগ্রহ জেগেছে ওর মনে। 'দুর্ঘটনার সাহায্যে কতোজন লোককে তাদের পরিবার থেকে চিরতরে সরিয়েছো তুমি?'

চোখ নামিয়ে সিগারেটটার দিকে আবার তাকালো জুয়ান ভিলা। দু'আঙুলের মাঝখানে নেমে যাচ্ছে আগুন। ছাইটা লম্বা হয়ে রয়েছে, অটুট।

'তাড়াতাড়ি বলো, ভিলা,' তাগাদা দিলো রানা। 'বাসুকো বা ক্রিস্টাল কোথায় ডেলিভারি দেয়া হয়?'

'অ্যারোভিয়াস-এ,' বললো জুয়ান ভিলা।

ওটা ভিক্টর লজেনের এয়ারলাইন। 'কার নামে পাঠানো হয়?'

'পাইলটের নামে,' বললো ভিলা। 'সিনর গর্ডন উইন্টারের কাছে।'

'গর্ডন? কে লোকটা? আমেরিকান নাকি?'

দ্রুত মাথা ঝাঁকালো জুয়ান ভিলা। 'হ্যাঁ, সিনর,' বললো সে। 'আপনার বন্ধুর মতো।'

তেরো

'গর্ডন উইন্টারের কথা দুনিয়ার মানুষকে জানানো দরকার,' বললো কালভিন। 'অল্প যে-দু'চারজন আমেরিকান সরাসরি কার্টেলের পক্ষে কাজ করে, তাদের একজন সে। গত দশ বছর ধরে দক্ষিণ আর মধ্য আমেরিকায় প্লেনে করে ড্রাগ নিয়ে যাচ্ছে লোকটা। পরিস্থিতি গরম হয়ে উঠলে গা-ঢাকা দেয়। দু'বছর আগের কথা জানি, সরকারী পেনশন নিয়ে কোস্টারিকায় বসবাস করছিল।'

'পেনশন?'

'কোস্টারিকান সরকারের কোনো অফিসারকে দু'লাখ ডলার ঘুষ দাও, সে তোমাকে সরকারী চাকরি থেকে শুরু করে পেনশন পর্যন্ত সবই ম্যানেজ করে দেবে। ক্রিমিনাল আর ড্রাগ ট্রাফিকারদের জন্যে এটা তাদের বিশেষ সেবা। অপরাধীরা আইনসিদ্ধ একটা মর্যাদা পায়, দেশটা মুখ দেখে বিদেশী মুদ্রার।'

ল্যাটিন আমেরিকায় অনেক দেশই দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দিয়ে নিজেদের অর্থনৈতিক ভিত্তি শক্তিশালী করে নিচ্ছে, জানতে পারলো রানা। অনেক সরকারই ড্রাগ ব্যবসার অনুকূলে, গোপনে সহায়তা করে

যাচ্ছে। 'তোমরা কখনো গর্ডনের নাগাল পাবার চেষ্টা করোনি?'

'সে-সময় তার বিরুদ্ধে আমাদের হাতে কোনো প্রমাণ ছিলো না,' বললো কালভিন। 'একজন আমেরিকানের গল্প শুনতাম আমরা, লোকটা কলম্বিয়ানদের সাথে হাত মিলিয়েছে। অবিশ্বাস্য একটা ঘটনা। গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্যে শুধু নিজেদের লোককে বিশ্বাস করে ওরা। অথচ ওদের হয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা কাজ করছে গর্ডন।'

'যেমন?'

'যেমন—উনিশশো একাশি সালে কার্টেল সদস্যদের একটা শীর্ষ সম্মেলন ডাকলো ওকহোয়াস, রাঘব-বোয়ালদের বয়ে নিয়ে গেল পাইলট গর্ডন উইন্টার। এর মানে হলো, তাকে ওরা বিশ্বাস করে। গত বছরের ঘটনা, বিপুল পরিমাণ কোকেন পাঠাবার দরকার হলো মেক্সিকোয়, দায়িত্বটা দেয়া হলো গর্ডনকে। আমরা জানতাম, কারণ প্লেনে আমাদের লোক ছিলো। সেবার গর্ডনকে আমরা হাতের মুঠোয় পাই। কিন্তু প্রাণের ওপর ঝুঁকি নিয়ে আমাদেরকে কাঁচকলা দেখালো সে। কুইনটানা রো-র এয়ারস্ট্রিপে প্লেনটাকে বিধ্বস্ত করলো সে, প্লেনের সাথে সমস্ত সাক্ষী-প্রমাণ পুড়ে গেল। বন্ধু গর্ডনকে গুরুতর আহত অবস্থায় পাঠানো হলো হাসপাতালে।'

'এখন সে বাইরে রয়েছে, টমাস।'

'ইমার্জেন্সী থেকে বেরোনো বা ইমার্জেন্সীতে ঢোকা তার কোনো ব্যাপারই নয়,' বললো কালভিন। 'ভিয়েতনামে হেলিকপ্টার চালিয়েছে সে। একজোড়া পার্পল হার্ট পদক পেয়েছে। থাইল্যাণ্ডে প্লেন চালিয়েছে। আফ্রিকা আর সেন্ট্রাল আমেরিকায় মার্সেনারিদের বয়ে নিয়ে গেছে। ওয়েদার হেলিকপ্টার চালাবার অভিজ্ঞতাও আছে তার।'

'ঝুঁকি নিতে পছন্দ করে,' বললো রানা।

'সেটা পরিষ্কার, রানা। বোধহয় সেজন্যে কার্টেল তাকে এতোটা পছন্দ করে।'

'লজেন তাকে পছন্দ করে।'

'মনে হয়।'

'কাউকে পছন্দ করতে হলে তাকে তোমার ভালো করে চিনতে হবে।'

'সবক্ষেত্রে কথাটা সত্যি নাও হতে পারে, রানা।'

'আমার ধারণা, বিলাসবহুল জীবনের প্রতি লোভ আছে গর্ডনের,' বললো রানা। 'এবং সে নিজেও বোধহয় কোকেন ব্যবহার করে।'

'আমাদেরও সেরকম ধারণা।'

'লজেনের মতো,' বললো রানা। 'আমরা বোধহয় এই লোককেই খুঁজছি, টমাস।'

'হতে পারে।'

'গর্ডন একজন পাইলট, ভিক্টর লজেনকে ভালোভাবে চেনে, কাজেই সে আমাদেরকে কোকেন সম্রাটের কাছে নিয়ে যাবে।'

'তাকে আমরা বাধ্য করবো, এইতো?'

গর্ডনকে ধরতে হলে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে হবে। কালি র‍্যাঞ্চে হানা দেয়ার খবর কার্টেলের কাছে পৌঁছে যাবে, সান্ধ্য দৈনিকে কর্নেল বেনিনের সাফল্যের কাহিনী ছাপা হওয়ার আগেই। গর্ডন কাছাকাছি একটা প্লেনে পৌঁছুনোর আগেই তার কাছে পৌঁছুতে হবে ওদের।

সিগারেটের আগুনে জুয়ান ভিলার শুধু আঙুল পুড়েছে। তার কাছ থেকে জানা গেল, পুরোপুরি প্যাকিং করা অবস্থায় অ্যারোভিয়াস অফিসে

ডেলিভারি দেয়া হয় কোকেন। ছ'টা প্লেন নিয়ে ওটা একটা বৈধ এয়ারলাইন। ছ'টার মধ্যে দুটো সব সময় কালিতে থাকে, জরুরী পরিস্থিতির জন্যে একটাকে সব সময় তৈরি অবস্থায় রাখা হয়। সারা দেশ জুড়ে নেটওঅর্ক আছে আরোভিয়াসের, তবে কোকেন নিয়ে সাধারণত বন্দর শহর বারাকুইলা আর কার্টেজেনা-য় যায়। ওখান থেকে জাহাজে তোলা হয় কার্গো। জাহাজগুলোর গন্তব্য সম্পর্কে কিছুই জানে না জুয়ান ভিলা।

অভ্যন্তরীণ ফ্লাইটে চলাচল করে বলে বাণিজ্যিক শিপমেন্টের ওপর সত্যিকার কোনো নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখা সম্ভব হয় না। লেদার গুডস লেখা বাক্সের ভেতর থাকে কোকেন, কাউকা উপত্যকা থেকে পাঠানো অন্যান্য পণ্যও এ-ধরনের বাক্সে ভরা হয়। কালি র‍্যাঞ্চের স্মোকহাউসে চামড়াজাত পণ্যের কোনো অভাব নেই—হাতব্যাগ, ফুটবল, ব্রিফকেস থেকে শুরু করে জুতো পর্যন্ত সবই আছে। একটা বিশাল দোচালার ভেতর অসংখ্য বাক্সও পাওয়া গেছে, কার্ডবোর্ডের তৈরি।

কি করতে হবে দ্রুত চিন্তা করে নিলো রানা। স্মোক হাউসের কিছু জিনিস-পত্র বাক্সে ভরার নির্দেশ দিলো ও, বাক্সগুলো তোলা হলো মিতসুবিশি ভ্যানে। সামনের সীটে জুয়ান ভিলাকে বসালো, তার পাশে বসলো কর্নেলের একজন লোক, পুলিশের ইউনিফর্ম পরে। ভ্যানের গায়ে মিলিওনারিয়স-এর লোগো আঁকা রয়েছে, ইনট্রা-কলম্বিয়ান লীগে অংশগ্রহণরত একটা ফুটবল টিমের প্রতীকচিহ্ন ওটা পাতানো খেলার একটা টিকেট বিনা পয়সায় পাবার ইচ্ছে না হলে কোনো পুলিশ ভ্যানটাকে থামাবে না।

ধরা যাক, মধ্য কালিতে, কেসোদো পার্ক থেকে বেশি দূরে নয়, অ্যারোভিয়াস অফিসের কাছাকাছি থামানো হলো ভ্যানটাকে। ফ্রি

পাস পাবার ইচ্ছে রয়েছে পুলিশ লোকটার, কিন্তু ভ্যানের ভেতর খেলার সরঞ্জাম না দেখে অস্বস্তিবোধ করবে সে। চামড়াজাত খেলার সামগ্রীর বদলে সে দেখতে পাবে অনেকগুলো প্লাস্টিক ব্যাগে কোকেন রয়েছে।

যে কোনো দেশে একজন টহল পুলিশের কাছে পরিস্থিতিটা দুটো সম্ভাবনা নিয়ে হাজির হবে: ভালো কাজের জন্যে ডিপার্টমেন্টের প্রশংসা, কিংবা মোটা টাকা পুরস্কার। প্রথম সম্ভাবনাটা নিয়ে কলম্বিয়ার খুব কম পুলিশই মাথা ঘামায়, অবশ্য তার যদি আত্মহত্যা করার শখ চাপে তাহলে আলাদা কথা। কলম্বিয়ায় ঘুষ এমন একটা জিনিস, খাওয়ার জন্যে নরম সুরে অনুরোধ করা হয়, সবিনয়ে সাধা হয়, কিন্তু না খেলে গুলি করে মেরে ফেলার ব্যবস্থা করা হয়। ঘুষ প্রত্যাখ্যান করেছে এমন একজন লোক পরবর্তী হপ্তা পর্যন্ত বেঁচে থাকবে, সে-সম্ভাবনা নেই বললেই চলে।

'প্ল্যানটা কিন্তু ঝুঁকিবহুল,' বললো কালভিন, হাইওয়ে ছেড়ে অ্যাভেনিডা টেরেস-এ চলে এলো গাড়ি, শহরের মাঝখানে। 'হয় গর্ডন চেহারাই দেখাবে না, নয়তো কালির গুণ্ডাপাণ্ডা নিয়ে হাজির হবে।'

'ভুল করছো, টমাস। শুধু যদি দেখার জন্যেও হয়, ওখানে থাকবে সে।'

'আমিও সেজন্যে যাচ্ছি, দেখতে,' বললো কালভিন। 'রাস্তায় কাটা মাথা গড়াগড়ি খাচ্ছে, জীবনে কখনো দৃশ্যটা চাক্ষুষ করিনি। শহরের মাঝখানে, শপিং এলাকায়, তুমি যদি গোলাগুলি শুরু করো, আমার অনেক দিনের সাধটা পূরণ হয়।'

রানা ভেবেছে ঝুঁকিটা নেয়া যেতে পারে। কালি শহরের হৃৎপিণ্ডে, রোববার বিকেলে, প্রতিপক্ষ ব্যাপক প্রতিরোধ গড়ে তোলার সুযোগ

পাবে বলে মনে হয় না। স্থানীয় খুনিরা ঐতিহ্য বজায় রেখে গির্জায় গিয়েছিল, সবেমাত্র ফিরেছে তারা। দিনের বাকিটা সময় যার যার পরিবারের সাথে কাটাবে তারা, অবসর সময়টা ব্যয় করবে আগামী হপ্তার অপরাধ কর্মসূচীর পরিকল্পনা রচনায়। ল্যাটিন আমেরিকায় রোববার বিকেলের চেয়ে পবিত্র ও ধীরগতি ব্যাপার খুব কমই আছে। আগেই খবর নিয়েছে রানা, অ্যারোভিয়াস এয়ারলাইনের কোনো ফ্লাইট আজ নেই।

চৌরাস্তায় পৌঁছে অ্যারোভিয়াস অফিসে ফোন করা হলো। নিজের দায়িত্ব পালন করলো জুয়ান ভিলা. জরুরী সুরে বারবার তাগাদা দিলো, সিনর গর্ডন উইন্টারকে সশরীরে উপস্থিত থাকতে হবে। মিষ্টি একটা নারীকণ্ঠ তাকে জানালো, সে যেন ঠিক জায়গামতো অপেক্ষা করে। উৎসাহ বোধ করলো ওরা।

কর্নেল বেনিনও রানার প্ল্যানটা পুরোপুরি পছন্দ করতে পারেননি, যদিও দুটো ঘোড়ার কোনোটাই ছাড়তে রাজি হননি তিনি। একটার ওপর বাজি ধরেছেন, অপরটার ওপর সওয়ার হয়েছেন। দৃশ্যটা কাভার দেয়ার জন্যে চারজন অতিরিক্ত লোককে দায়িত্ব দিয়েছেন তিনি। তাঁর দলের সেরা চারজনকে।

পার্কের উত্তর পেরিমিটারের চারধারে পজিশন নিলো ডি. এ. এস. এর লোকগুলো। নিজেদের কাজে দক্ষ তারা। দু'জন ট্যাক্সি স্ট্যাণ্ড চেক করতে শুরু করলো, পালা করে ড্রাইভারদের জিজ্ঞেস করছে উপত্যকার বাইরে একটা জায়গায় তারা ভাড়া যাবে কিনা। হ্যাঁ, জায়গাটা দূরে। না, প্রচলিত হারে ভাড়া দেয়ার সামর্থ্যও তাদের নেই। কিন্তু...।

বাকি দু'জন বেঞ্চে বসে দুই বুড়োর দাবা খেলা দেখছে। মাঝে মধ্যে চাল বলে দেয়ার চেষ্টা করলো তারা। পছন্দ হলে বাদামওয়ালা-

কে ডাকলো বুড়োরা, পছন্দ না হলে বাপ-মা তুলে গাল দিলো।

মিতসুবিশি ভ্যানের নাক বরাবর সামনে, রাস্তার ওপর পাতা টিনটো বার-এর দিকে হেঁটে এলো রানা আর কালভিন। ইচ্ছে না থাকলেও কফি খেতে হবে ওদেরকে।

'এখনো আমার ধারণা, সে আসবে।'

'কফির দামটা ফেরত দিয়ো আমাকে,' বাজি ধরে বললো কালভিন।

কালভিনের হাতে একটা চুরুট গুঁজে দিলো রানা। 'তুমি ফেরত দিয়ো চুরুটের দাম।'

'তুমি জিতে যেতে পারো মাত্র একটা কারণে, লড়াকু ষাঁড়ের মতো পাগলাটে গর্ডন। তার সম্পর্কে প্রথম যে রিপোর্টটা পাই আমরা, ইউকাতান থেকে, তাতেই লোকটার পরিচয় ফুটে ওঠে। খবর এলো, বীচক্রাফট নিয়ে এক উন্মাদ পেনিনসুলায় আসা-যাওয়া করছে, তার কাজ হলো জানালা দিয়ে ফুটবল ছোঁড়া। ফুটবলগুলোর বৈশিষ্ট্য হলো, ভেতরে আশ্চর্য উন্নতমানের কোকেন ক্রিস্টাল। আর সমস্যা হলো, এয়ারক্রাফট থেকে মাটিতে পড়লে ওগুলোর বেশিরভাগই ফেটে যায়। শহরতলীর অর্ধেক মাঠ সাদা হয়ে গেল।'

'ফুটবল, অ্যাঁ?'

'ঠিক ধরেছো, মিলিওনারিয়স ক্লাবের ছাপ মারা ছিলো ওগুলোয়,' বললো কালভিন।

'লা ব্লাংকার বয়ফ্রেণ্ড ওদের হয়ে খেলতো, তাই না?'

'তাকে জেরা করার সুযোগ পেলে ভালো হতো, রানা। ছেনি দিয়ে চেঁছে তুলে আনতে পার তার কার্টেলের গা থেকে।'

'প্রমাণ নিশ্চিহ্ন করার জন্যে হোয়াইট লেডিকে দায়ী করতে পারো তুমি। তবে দুঃখ করো না, তার বদলে গর্ডনকে পাচ্ছো।'

'তাকে আমরা পাচ্ছি, নাকি সে আমাদেরকে পাচ্ছে, বলা কঠিন। ইট বেরিয়ে থাকা দেয়ালের সাথে কথা বললে, এমনকি কলম্বিয়াতেও ব্যাপারটা অদ্ভুত লাগবে মানুষের।'

চারদিকে তাকিয়ে শুধু চার্চের সামনের দেয়ালে ইট বেরিয়ে থাকতে দেখলো রানা। চৌরাস্তার চারপাশের লম্বা বিল্ডিংগুলোর তুলনায় চার্চটাকে বেঁটে আর বাতিল বলে মনে হলো। একবার চোখ বোলালেই বোঝা যায়, মেডিলিনের মতো কালিতেও নারকো ডলারের আগমন ঘটেছে। বিল্ডিংগুলো নতুন ও আধুনিক।

বিকেলের রোদে ফেরিওয়ালা যে ক'জনকে দেখা গেল তারা ফেরিওয়ালাই, ছদ্মবেশী চর নয়। একজন বাদাম ফেরি করছে, স্যুভেনির বিক্রি করছে দু'জন, লোহার শিকে গেঁথে আগুনে ঝলসানো কলিজা বিক্রি করছে একজন, টিনের বাক্স নিয়ে জুতো পালিশ করছে এক কিশোর, সমবয়েসী আরেক ছেলে কমলা বেচছে। ছয় কি আটজন ট্যুরিস্টকে ঘিরে আছে তারা, ট্যুরিস্টরা এসেছে কালির বিখ্যাত সুন্দরীদের দেখতে, কিং বাবারবউদের সন্ধানে। আধাবয়েসী দশ কি বারোজন কালিবাসীকে এড়িয়ে যাচ্ছে ফেরিওয়ালারা, তারাও সম্ভবত ওই একই উদ্দেশ্যে রাস্তায় ঘুর ঘুর করছে।

দুঃসাহসীরা পৌঁছুনোর সাথে সাথে টের পেয়ে গেল রানা, তবে তাদের সংখ্যা সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারলো না। আটজনকে নিঃসন্দেহে চিনতে পারলো ও, বাকি দু'জনকে সন্দেহ করলো। লোকগুলো যে দ্রুত এলো তা নয়, এলো একটা ছক ধরে। বিভিন্ন রাস্তা দিয়ে চৌরাস্তায় ঢুকলো তারা, সবাই এগোলো মিতসুবিশি ভ্যানের দিকে। প্রত্যেকের বেল্টের ওপর ঢিলেভাবে ঝুলছে শার্ট বা জ্যাকেট।

'ভাগাভাগির সময়, টমাস,' বললো রানা।

'বাঁ দিকের দু'জন আমার,' বললো কালভিন। ক্যারেরা ফাইভ পেরোচ্ছে তারা, তার দিকে পিছন ফিরে। ইচ্ছে করলেই তাদেরকে ফেলে দিতে পারে সে। দু'জনই চওড়া, ভারি ; সাথে যোগ হয়েছে অস্ত্রের ওজন, চাইলেও তারা ক্ষিপ্র হয়ে উঠতে পারবে না। আর কালভিন স্মল আর্মস-এ বিশেষ দক্ষ, রানার জানামতে শ্রেষ্ঠ মার্কস-ম্যানদের অন্যতম।

যতোদূর বোঝা যাচ্ছে, বাজিটা কালভিনই জিতবে, কারণ এখনো কোথাও গর্ডন উইন্টারকে দেখা যাচ্ছে না। তার অনুপস্থিতি বিকট একটা সমস্যা তৈরি করতে যাচ্ছে। কালভিনের শিকার দু'জন ভ্যানের পনেরো গজের মধ্যে রয়েছে, চৌরাস্তার মাথায়, মই বেয়ে উঠে পড়েছে ক্রসওয়াক-এ, ওপর থেকে কোণাকোণিভাবে লক্ষ্য রাখছে টার্গেটের ওপর। আরো দু'জন ঢুকে পড়লো ট্যাক্সি স্ট্যাণ্ডের পিছনে, অবশ্য সাথে সাথে ধরা পড়ে গেল ডি. এ. এস. এজেন্টদের চোখে। চার-জনের শেষ দলটা, পার্ক ঘিরে থাকা চওড়া ফুটপাত ধরে আসছে, হঠাৎ তাদের হাঁটার গতি বাড়িয়ে দিলো।

রানাকে এবার জায়গা বদল করতে হলো। ডি. এ. এস.-এর যে দু'জন লোক দাবা খেলা দেখছিল, নিজেদের বিপদ টের পেয়ে ছড়িয়ে পড়লো তারা। একজন গা ঢাকা দিলো মোটা পাম গাছের আড়ালে। অপর লোকটা দুই বুড়োকে ভাগিয়ে দিয়ে পাথুরে বেঞ্চের পিছনে হাঁটু গেড়ে বসলো, বেঞ্চের ব্যাকরেস্ট-এ পিস্তল ধরা হাতটা ঠেকিয়ে অপে-ক্ষায় থাকলো।

ব্যাপারটা ঘটতে যাচ্ছে, ভাবলো রানা। রোদ ঝলমলে বিকেলে একটা শহরের প্রধান চৌরাস্তাকে রণক্ষেত্র হিসেবে কল্পনা করা কঠিন, তবে পুনরাবৃত্তি ঘটায় এ-ধরনের ব্যাপারগুলোয় অভ্যস্ত হয়ে ওঠে মন।

প্রায় তিন হপ্তা আগেই উপলব্ধি করেছে রানা, দেয়ালগুলো যখন ওর ওপর ছিটকে পড়ছিল। গোটা কলম্বিয়াই আসলে যুদ্ধক্ষেত্র। নিজেকে এই বলে সান্ত্বনা দিলো ও, ভাগ্য ভালো যে, আজ ছুটির দিন।

রাস্তা পেরোলো রানা। পার্ক করা সার সার গাড়িগুলো গোটা চৌরাস্তাকে বেড় দিয়ে রেখেছে, দু'সারি গাড়ির মাঝখানে ঢুকে হোলস্টার থেকে পিস্তলটা বের করলো ও। হীরক আকৃতি ফুটপাতে উঠলো, মিতসুবিশি ভ্যান থেকে পনেরো ফুট দূরে। ঠিক তখুনি উদয় হলো গর্ডন উইন্টারও।

অকস্মাৎ একটা গাঢ় লাল টাউন কার কালি ইলেভেন থেকে বাঁক ঘুরে ঢুকে পড়লো চৌরাস্তায়, সজোরে ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে পড়লো প্রচণ্ড এক ঝাঁকি খেয়ে। ফুটপাতের কিনারায় দাঁড়িয়ে থাকা মিতসুবিশি ভ্যান আর পাশের গাড়িটা আড়ালে পড়ে গেল। টাউন কারের খোলা দরজা দিয়ে বেরিয়ে এলো লাল চুল আর লম্বা গলা। লোকটাকে দেখার আগেই রানা আন্দাজ করে নিয়েছে, হয় গর্ডন বা হোমরা-চোমরা কেউ পৌঁছুলো, কারণ টাউন কারকে দেখামাত্র গোটা চৌরাস্তার সমস্ত নড়াচড়া থেমে গেছে।

চৌরাস্তার মাঝখানে রয়েছে দুঃসাহসীদের চারজন, ব্যস্ততার সাথে রাস্তার পাশে সরে গেল তারা, ভ্যান থেকে বিশ গজ দূরে। হাঁটু গেড়ে আক্রমণাত্মক ভঙ্গি নিলো তারা। পশ্চিম দিকে ভ্যানের আরো কাছা কাছি রয়েছে কালভিনের দুই শিকার, তাদের পিছু নিয়ে চমৎকার একটা পজিশনে রয়েছে সে। বাকি দু'জন উত্তর প্রান্তের ফুটপাত আর বাগানের মাঝখানে রয়েছে। ব্যাপারটা শুরু হলে অংশগ্রহণ করার শখ একজনেরও অপূর্ণ থাকবে না।

গর্ডন উইন্টার দ্রুত নেমে এলো। দেখতে তেমন কিছু নয় সে।

একহারা, খুব বেশি লম্বা নয়, মাথায় সামান্য টাক। মুখে এতো বেশি খয়েরি তিল যে চেহারাটা বিকৃতই বলা যায়। হাঁটার ভঙ্গিটা ঋজু। ভ্যানের কাছাকাছি পৌঁছে থমকে দাঁড়ালো সে, কারণ রানাকে এতো-ক্ষণে দেখতে পেয়েছে। রানাকে দেখেই সে বুঝতে পারলো, লোকটা ইচ্ছে করেই এখানে দাঁড়িয়ে আছে, যাতে ভ্যানের কাছাকাছি পৌঁছুলে দেখা হয় দু'জনের।

'কে তুমি?' জিজ্ঞেস করলো গর্ডন উইন্টার।

'তোমার মৃত্যু, গর্ডন।'

রানার হাতে পিস্তলটা দেখলো গর্ডন। গোটা চৌরাস্তার ওপর দ্রুত একবার চোখ বোলালো সে। 'আশপাশটা তোমার দেখা আছে তো, বন্ধু?'

'তোমার সব ক'জন লোকই টার্গেট হয়ে আছে,' বললো রানা। 'তুমি আমার, গর্ডন।'

'জানি না কোন্ জাহান্নাম থেকে এসেছো তুমি,' শান্তস্বরে বললো গর্ডন, তিলবহুল মুখে ভাঁজ তুলে হাসলো সে। 'সম্ভবত আমার সাথে তোমার কোনো জরুরী আলাপ আছে।' কথাটা বলার সময় রানার বুক লক্ষ্য করে তর্জনী তাক করলো সে।

ল্যাটিন আমেরিকায় কেউ সাধারণত কারো দিকে আঙুল তোলে না, ব্যাপারটাকে অপমানকর ও অশালীন বলে মনে করা হয়। আঙুলটা ওর দিকে খাড়া হতে যাচ্ছে দেখেই ডাইভ দিয়ে রাস্তার ওপর পড়লো রানা।

প্রথম সুযোগেই পাইলটকে গুলি করতে পারতো রানা। করলো না, কারণ লোকটাকে অক্ষত অবস্থায় দরকার ওর। বাকি দুঃসাহসীরা মরলেই বরং ভালো। মাটিতে পড়লো রানা গুলি করতে করতে।

টাউন কারের ড্রাইভার তিনটে গুলি খেলো। একটা মাথায়, একটা বুকে, শেষটা মেশিন-পিস্তল ধরা হাতের কনুইয়ে। ড্রাইভার মারা পড়লেও, গর্ডন ইতিমধ্যে ছুটতে শুরু করেছে। লোকটা পালাচ্ছে দেখেও কিছু করতে পারলো না রানা। চারদিক থেকে গুলি করা হচ্ছে ওকে লক্ষ্য করে।

রানা একা নয়, সশস্ত্র সবগুলো লোক টার্গেটে পরিণত হলো। কেজি-নাইন বেরিয়ে এলো জ্যাকেটের তলা থেকে, কোমরের বেল্ট থেকে বেরোলো রিভলভার। গোটা চৌরাস্তা জুড়ে লোকজন চিৎকার আর কান্নাকাটি করছে। শরীরটাকে গড়িয়ে দিয়ে একটা পাথুরে বেঞ্চের পিছনে চলে এলো রানা, পিস্তলের মাজল তাক করলো নিঃসঙ্গ এক ককেরসের দিকে। ওয়েস্টার্ন সিনেমার অজেয় নায়কের মতো লোকটা, দু'পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে আছে, কাঁধে ঠেকে আছে অটোমেটিক রাইফেল, মুখে বেপরোয়া হাসি। পাথুরে বেঞ্চে লাগলো তার গুলি, উল্টে দিলো পাশের একটা ডাস্টবিন, খানিকটা আবর্জনা ছিটকে পড়লো রানার মুখে।

ওভাবেই মারা গেল লোকটা, মুখে বেপরোয়া হাসি নিয়ে, বুকে গুলি খাবার সময় ট্রিগার টিপছে, এক দিক থেকে আরেক দিকে ঘোরাচ্ছে রাইফেলটা, ভেঙে চুরমার করছে জানালার কাঁচ, টুকরো টুকরো করছে পাম গাছের পাতা।

আরেকজন ককেরসকে গুলি করতে যাচ্ছিলো রানা, তার হালকা নীল শার্টে স্থির হলো সাইট, কিন্তু পিস্তল থেকে গুলি বেরোবার আগেই ধরাশায়ী হলো টার্গেট। ডি. এ. এস.-এর যে লোকটা লক্ষ্যভেদ করেছে তাকে দেখতে পেলো রানা। আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান হয়ে পাম গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো সে, সাথে সাথে নিজেও গুলি খেলো।

এমন ভঙ্গিতে পড়লো লোকটা, ঠিক যেন বরফে পা পিছলে গেছে। মুখটা নিচের দিকে ঝুঁকে পড়লো, হাত দুটো দু'দিকে প্রসারিত, এই সময় দ্বিতীয়বার গুলি খেলো বেচারা।

গুলি করতে করতে সিধে হচ্ছে রানা, আরো কয়েকটা দৃশ্য চোখে পড়লো ওর। দেরি না করে গর্ডনের পিছু নিয়ে ছুটলো ও। জুতো পালিশ করার বাক্সের ওপর মুখ থুবড়ে পড়ে আছে কিশোর ছেলেটা, মুখ হাঁ করে চিৎকার করছে, যদিও কোনো শব্দ বেরোচ্ছে না গলা থেকে। এক মহিলা কাঁদছে, গুলি খেয়েছে বলে মনে হলো না। কাল-ভিনের কোল্ট এখনো বিকট শব্দ করছে। অটোমেটিক আগ্নেয়াস্ত্রের গর্জন আগের চেয়ে অনেক কমেছে। গুলির কিছু শব্দ যেন পিছিয়ে যাচ্ছে। টাউন কারের ড্রাইভার মারা গেলেও, লাশের ধাক্কা খেয়ে দরজাটা খুলে গেছে, বাইরে বেরিয়ে এসেছে রক্তাক্ত মাথা।

চুল ধরে লাশটা টেনে আনলো রানা, ফেলে দিলো নর্দমায়। ইগনি-শনেই পাওয়া গেল চাবিটা। সহজেই স্টার্ট নিলো এঞ্জিন। গাড়িটা এতো বড় যে ঘোরাতে হিমশিম খেয়ে গেল রানা। তবে সিধে হবার পর দ্রুতবেগে ছুটলো।

সামনে গর্ডনকে দেখা যাচ্ছে না। রানা তাকে উত্তর দিকে যেতে দেখেছে, এভারলিফট বিজ্ঞাপনটা ছাড়িয়ে পাশের রাস্তায় উঠেছে সে এই মুহূর্তে ওখানেও নেই সে। বাম কিংবা ডান, দুটোর যে-কোনো একটা বেছে নিতে হবে রানাকে। বাঁ দিকেই গাড়ি ঘোরালো ও, অ্যারোভিয়াসের অফিসটা ওদিকেই।

রাস্তাটা ওয়ান-ওয়ে, টাউন কার উল্টোদিকে ছুটছে। ছোটো একটা ফিয়াটের ড্রাইভার আঁতকে উঠে ফুটপাতের ওপর তুলে দিলো গাড়িটা। ভাগ্য ভালো যে ছুটির দিন বলে শহরের মাঝখানে যানবাহনের ভিড়

নেই। রাস্তার শেষ মাথায় খর্বকায় একটা লালচুলো মূর্তিকে দেখা গেল, বাঁক ঘুরে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। মোড়ে পৌঁছুনোর আগেই সজোরে ব্রেক কষলো রানা, ব্যাক গিয়ার দিয়ে পিছিয়ে আনলো গাড়িটাকে, তারপর হুইল ঘুরিয়ে ঢুকে পড়লো সাইড রোডে।

গর্ডন উইন্টার ভয়ে দিশেহারা হয়ে পড়েছে, এ-কথা মনে করার কোনো কারণ নেই, ভাবলো রানা। কাছাকাছি কোথাও নিশ্চয়ই আরেকটা গাড়ি রাখা আছে তার। কিংবা সে হয়তো কোনো সেফ হাউসের দিকে যাচ্ছে। আরেকটা সম্ভাবনা উঁকি দিলো রানার মনে, ওর হাতে ধরা পড়ার আগে গর্ডন না আবার প্রতিপক্ষের হাতে ধরা পড়ে যায়।

আত্মরক্ষায় দক্ষ লোক গর্ডন, ভাগ্যের সহায়তা পেয়ে আজও বেঁচে আছে সে। রাস্তা পেরোবার সময় ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে একবার তাকালো সে, দেখলো টাউন কারটা পিছু নিয়েছে। স্যাঁৎ করে একটা গলির ভেতর গা-ঢাকা দিলো সে।

সুযোগের সদ্ব্যবহার করেছে গর্ডন, অ্যারোভিয়াস অফিসে ঢুকে পড়েছে।

সাইড রোড থেকে বেরিয়ে এসেই তাকে দেখতে পেলো রানা। অ্যারোভিয়াস অফিসে অস্ত্র থাকতে পারে, থাকতে পারে ব্যাকআপ টিম, পালাবার গোপন পথ, ম্যান-ট্র্যাপ। ওর মাথায় একটা বুদ্ধি এলো, জানে কাজটা ঝুঁকিবহুল, তবু বাতিল করলো না। রাস্তাটা তেমন চওড়া নয়, সামনের চৌরাস্তাটাও বিশাল নয়, বাঁক নিতে হলে এখুনি টাউন কারের স্পীড কমানো দরকার। তা না করে, স্পীড আরো বাড়িয়ে দিলো রানা। তীরবেগে ছুটলো গাড়ি, নাক বরাবর সামনে অ্যারোভিয়াস অফিসের কাঁচমোড়া দরজা আর জানালা।

দরজার গায়ে লেখা রয়েছে, 'আপনার টাকার বিনিময়ে সেরা জিনিস-টা পাবেন এখানে'।

কাঁচ আর কাঠ ভাঙার শব্দগুলো মিষ্টি সঙ্গীতের মতো লাগলো কানে। ফুটপাতে ধাক্কা খেয়ে শূন্যে উঠে পড়লো টাউন কার, জানালা আর দরজা ভেঙে সোজা ঢুকে পড়লো অফিসে।

কাউন্টারে বসা তরুণী মেয়েটি হাঁ করে তাকিয়ে থাকলো। গর্ডন উইন্টার ছুটতে ছুটতে অফিসে ঢুকলো, দেখেও নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারলো না সে। পরমুহূর্তে জানালা-দরজা ভেঙে টাউন কারকে ভেতরে ঢুকতে দেখে জ্ঞান হারাবার অবস্থা হলো তার। কাউন্টারের পাশে গাড়িটা পৌঁছুনোর আগেই তারস্বরে চিৎকার জুড়ে দিলো সে।

গাড়ির ধাক্কায় ভেঙে পড়লো কাউন্টার, চেয়ার থেকে মেঝেতে ছিটকে পড়লো মেয়েটি, মেঝেতে হামাগুড়ি দিচ্ছে।

কোথায় কি ক্ষতি হয়েছে দেখার জন্যে থামলো না গর্ডন। গাড়ি থেকে নামছে রানা, খোলা সিঁড়ি বেয়ে খোলা দোতলার দিকে তর তর করে উঠে যাচ্ছে সে। লাফ দিয়ে রিসেপশন ডেস্কের মাথায় উঠলো রানা, সিঁড়ির মাথায় দরজার গায়ে ইউ-সাইট স্থির করলো। গর্ডনের মাথার ঠিক ওপরে দু'বার গুলি করলো ও। পালিশ করা কাঠে গিয়ে লাগলো বুলেট দুটো।

দাঁড়িয়ে পড়লো গর্ডন উইন্টার। ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকালো সে। বোকার মতো কিছু করলো না। জানে, ধরা পড়ে গেছে। হাত দুটো ধীরে ধীরে তুললো মাথার ওপর।

(আগামী খণ্ডে সমাপ্য)

Nahid

FUAD

মাসুদ রানা

কোকেন সম্রাট-২

কাজী আনোয়ার হোসেন

সেবা প্রকাশনী

ANIK

কোকেন সম্রাট ২

দুই খন্ডে সমাপ্ত রোমাঞ্চোপন্যাস

কাজী আনোয়ার হোসেন

বাংলাদেশে কোকেন আসছে।

উৎস খুঁজতে গিয়ে কলম্বিয়ার মেডিলিনে হাজির হয়েছে

মাসুদ রানা।

জানা গেছে হিটলারের দোসর, নাৎসি গুপ্তচর

বিভাগের প্রধান হেনেরিক মুলার রয়েছে এর পেছনে।

গভীর জঙ্গলে ঘাঁটি বানিয়েছে সে। সেখানে রয়েছে

বিশাল এক গুদাম, গোটা পৃথিবীর যুব সমাজকে

হতাশার মুখে ঠেলে দেয়ার জন্য বিপুল মজুত।

হানা দিল রানা।

একা।

সেবা বই

প্রিয় বই

অবসরের সঙ্গী

প্রকাশক :
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০০

লেখক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারী, ১৯৯১

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা শরাফত খান

রচনা বিদেশী কাহিনী অবলম্বনে

মুদ্রণে
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০০

যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন ৪০৫৩৩২
জি পি. ও. বক্স নং-৮৫০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/ ০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

Masud Rana-177
COCAINE SAMRAT-2
by Qazi Anwar Husain

মাসুদ রানা

বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের
এক দুর্দান্ত দুঃসাহসী স্পাই
গোপন মিশন নিয়ে ঘুরে বেড়ায় দেশ-দেশান্তরে।
বিচিত্র তার জীবন। অদ্ভুত রহস্যময় তার গতিবিধি।
কোমলে-কঠোরে মেশানো নিষ্ঠুর-সুন্দর এক অন্তর।
একা।
টানে সবাইকে, কিন্তু বাঁধনে জড়ায় না।
কোথাও অন্যায় অবিচার অত্যাচার দেখলে
রুখে দাঁড়ায়।
পদে পদে তার বিপদ শিহরণ ভয়
আর মৃত্যুর হাতছানি।
আসুন, এই দুর্ধর্ষ চির-নবীন যুবকটির সাথে
পরিচিত হই।
সীমিত গণ্ডিবদ্ধ জীবনের একঘেয়েমি থেকে
একটানে তুলে নিয়ে যাবে ও আমাদের
স্বপ্নের এক আশ্চর্য মায়াবী জগতে।
আপনি আমন্ত্রিত।
ধন্যবাদ।

সেবা প্রকাশনী

প্রিয় পাঠক

এই বইটিতে, অথবা সেবা প্রকাশনীর অন্য যে-কোন বইয়ে বাঁধাইয়ের ত্রুটি যদি কোনও কপি বাদ পড়ে, কিংবা উল্টোপাল্টা হয়, তাহলে দয়া করে সেটি সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০০—এই ঠিকানায় পোস্ট করুন। আমরা নিজ খরচে একটি ভাল বই আপনার ঠিকানায় রেজিস্টার্ড বুকপোস্টে পাঠিয়ে দেব।

ঢাকার পাঠক হাতে হাতে বদলে নিতে পারেন।

বইয়ের ভেতর আপনার নাম লিখে থাকলেও ক্ষতি নেই, বরং নামের নিচে ঠিকানাটাও স্পষ্ট হরফে লিখুন, এবং নির্দ্বিধায় পাঠিয়ে দিন। প্রকাশক।

এই বইয়ের প্রতিটি ঘটনা ও চরিত্র কাল্পনিক। জীবিত বা মৃত ব্যক্তি, বা বাস্তব ঘটনার সঙ্গে এর কোনও সম্পর্ক নেই। লেখক।

২৮শে এপ্রিল, ১৯৪৫। ফুয়েরার বাংকার থেকে পালানোর পরিকল্পনা করলেন গেস্টাপো প্রধান হেনেরিক মুলার।

৬ই অক্টোবর, ১৯৮৬। কলম্বিয়ার মেডিলিন শহরে পৌঁছুলো বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স-এর দুর্ধর্ষ এজেন্ট মাসুদ রানা।

বি. সি. আই. একটি এসপিওনাজ সংস্থা, মাতৃভূমির স্বার্থবিরোধী যে-কোনো ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করার জন্যে পাল্টা আঘাত হানার গুরুদায়িত্ব পালন করে চলেছে ওরা। সংস্থার অকুতোভয় এজেন্টদের মধ্যে মাসুদ রানা একজন। রোমাঞ্চপ্রিয় এই চির-তরুণের মনে রয়েছে শেখার প্রবল আগ্রহ, মাথায় ক্ষুরধার বুদ্ধি, বুকে দুর্দান্ত সাহস। রক্তমাংসের সাধারণ বাঙালী ; কিন্তু নিষ্ঠা, অধ্যবসায়, দেশপ্রেম ও ত্যাগ অজেয় বীরের মহিমা দান করেছে তাকে। বি. সি. আই.-এর একটি কাভার হলো রানা ইনভেস্টিগেটিং এজেন্সি, সঙ্গত কারণেই প্রতিষ্ঠানটির ডিরেক্টর হতে হয়েছে ওকে। সুমায় রয়েছে অনারারী প্রজেক্ট ডিরেক্টরের পদ। ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্টি-টেরোরিজম অর্গানাইজেশন-এর একজন কমাণ্ডার ও। এছাড়াও, আরো অনেক সংগঠন ও সংস্থার সাথে জড়িত রানা।

এবারের অ্যাসাইনমেন্টে দুটো কাজ নিয়ে কলম্বিয়ায় এসেছে ও। পাকিস্তান ও গোল্ডেন ট্রায়াঙ্গল হয়ে বাংলাদেশে কোকেন ঢুকছে, সেটা বন্ধ করতে হবে। দ্বিতীয় কাজটি হলো, নাৎসী অপরাধী হেনেরিক মুলারকে খুঁজে বের করা। এ-ব্যাপারে সি. আই. এ.-র দলছুট এজেন্ট লিলিয়ান ওকে কিছু তথ্য দিয়েছে। আর, সি. আই. এ.-র মুখোশ উন্মোচনের জন্যে, যুক্তরাষ্ট্রেরই আরেকটি এসপিওনাজ সংস্থা,

ন্যাশনাল সিকিউরিটি এজেন্সি, ওর সাহায্য প্রার্থনা করেছে। এন. এস. এ.-র বিশ্বাস, কণ্ট্রা বিদ্রোহীদের সাহায্য করার জন্যে টাকার দরকার হওয়ায় সি. আই. এ. গোপনে কলম্বিয়ার কোকেন সম্রাটদের কাছ থেকে মোটা টাকার ঘুষ খেয়েছে।

মেডিলিন শহরে পা দিতে না দিতে রানাকে খুন করার চেষ্টা হলো। জানা গেল, লা ব্লাংকা অর্থাৎ হোয়াইট লেডি রানাকে খুন করার নির্দেশ দিয়েছিল। রানার সৎ পরামর্শে কান না দিয়ে নিজের মৃত্যু নিজেই ডেকে আনলো হোয়াইট লেডি।

তথ্য ও ইতিহাস জানার জন্যে আলিজান আকরাম নামে বৃদ্ধ এক ভদ্রলোকের সাহায্য নিলো রানা। ভদ্রলোক ইহুদি ছিলেন, পরে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন। সি. আই. এ.-র বেঈমানী ও হেনেরিক মুলারের খোঁজ পাবার আশায় মেডিলিনে আসার পর লিলিয়ানও তাঁর সাহায্য পেয়েছিল। লিলিয়ানের কাছ থেকে আগেই জেনেছে রানা, রলফ মুয়েলারকে হেনেরিক মুলার বলে সন্দেহ করে সে। রলফ মুয়েলারের ছেলে ববি মুয়েলারকে বিয়ে করে লিলি, তারপর সি. আই. এ.-র কুকীর্তি ফাঁস করার জন্যে ববি মুয়েলারকে সি. আই. এ.-র একটা অ্যাসাইনমেন্টে কাজে লাগায়। নিজের অ্যাসাইনমেন্টে ব্যর্থ হয় লিলিয়ান, রানার সাহায্য প্রার্থনা করে সে। রানা তাকে মেক্সিকান দূতাবাসে লুকিয়ে রেখেছে। কলম্বিয়ায় আসার আগে ববি মুয়েলারের সাথে দেখা করতে যায় রানা, ওর হাতে খুন হয়ে যায় লোকটা।

হোয়াইট লেডি মারা যাবার পর রানা জানলো, ভিক্টর লজেনের কাছ থেকে টাকা খেয়ে ওকে খুন করার নির্দেশ দিয়েছিল মেয়েটা। ভিক্টর লজেন হলো সাঁতেলা লজেনের ছেলে। সাঁতেলা লজেন আর হেনেরিক মুলার প্রায় একই সময়ে কলম্বিয়ায় আসে। বৈবাহিক সূত্রে

ওদের মধ্যে আত্মীয়তার সম্পর্ক আছে।

কলম্বিয়ায় ড্রাগ কার্টেল আইনরক্ষাকারী কর্তৃপক্ষ ও সরকারকে প্রায় পঙ্গু করে রেখেছে। কার্টেল-এর প্রথম সারির নেতা ভিক্টর লজেনকে অত্যাচারী সামন্ত প্রভুর মতো বিভীষিকা বললেও কম বলা হয়। কার্টেলের কোনো সদস্যের বিরুদ্ধে রায় দিলে বিচারক খুন হয়ে যান। কার্টেলের বিরুদ্ধে কোনো কাগজে কিছু লেখা হলে রিপোর্টার ও সম্পাদক চিরকালের জন্যে হারিয়ে যান। আইন বা সরকার ভিক্টর লজেনের নাগাল পায় না। নিজস্ব এয়ারলাইন আছে তার, আছে দৈনিক পত্রিকা ও রেডিও স্টেশন। একটা রাজনৈতিক দলেরও নেতা সে। তার সন্ধান পাওয়া সহজ নয় বুঝতে পেরে ড্রাগ এনফোর্সমেন্ট এজেন্সির সদস্য ও ঘনিষ্ঠ বন্ধু টমাস কালভিনকে সাথে নিয়ে থীম পার্কে এলো রানা, ভিক্টর লজেনের আধ্যাত্মিক গুরু জিম মরিসনের বিশাল স্ট্যাচু আর মিনি একটা প্লেন উড়িয়ে দিলো বোমা মেরে। রানার ধারণা, একের পর এক আঘাত করলে ভিক্টর লজেন প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে তৎপর হবে, তাহলেই তাকে ঘায়েল করার সুযোগ পাবে ওরা।

এরপর ভিক্টর লজেনের একটা প্রসেসিং ল্যাবে হানা দিলো ওরা। রানার সাথে পরিচয় হলো কর্নেল হার্নান্দেজ বেনিনের। ডি. এ. এস.-এ আছেন ভদ্রলোক, অত্যন্ত সৎ অফিসার, কার্টেলের বিরুদ্ধে আপোসহীন সংগ্রাম করছেন। ভদ্রলোকের একটাই দুর্বলতা, তিনি প্রচারবিমুখ নন।

বিশাল হাসিয়েনদায় হানা দিয়ে বিপুল কোকেন উদ্ধার করা হলো। কিন্তু ভিক্টর লজেনের কোনো সন্ধান করা গেল না। তবে জানা গেল, গর্ডন উইন্টার নামে একজন আমেরিকান পাইলট ভিক্টর লজেনের হয়ে

কাজ করে, তাকে ধরতে পারলে সমস্যার সমাধান হতে পারে।

গর্ডন উইন্টারকে ধরার জন্যে কালি শহরের মাঝখানে ফাঁদ পাতা হলো। চৌরাস্তায় ঠিক সময়েই হাজির হলো গর্ডন উইন্টার, তবে একা নয়। শুরু হলো বন্দুকযুদ্ধ। অবশেষে রানার হাতে ধরা দিতে বাধ্য হলো গর্ডন উইন্টার।

গর্ডন উইন্টার রানাকে ভিক্টর লজেনের কাছে নিয়ে যেতে পারবে কিনা, ভিক্টর লজেন শেষ পর্যন্ত পরাজয় স্বীকার করবে কিনা, বা হেনেরিক মুলার ওরফে রলফ মুয়েলারকে রানা ধরতে পারবে কিনা, এ-সব প্রশ্নের উত্তরের জন্যে কাহিনীর ভেতর ঢুকতে হবে আমাদের।

এক

ডি. এ. এস. অফিসে জড়ো হলো ওরা। অফিসটা ফেডারেল কোর্ট কমপ্লেক্স-এর ভেতর। লাশ গোনার পর দেখা গেল, গর্ডন উইন্টারকে ফাঁদ পেতে ধরতে গিয়ে ডি. এ. এস.-এর একজন লোক মারা গেছে, আহত হয়েছে দু'জন। শত্রুপক্ষের মারা গেছে পাঁচজন; আহত দু'জনের বাঁচার আশা নেই, অপর একজন বাঁচবে কি মরবে তা নির্ভর করছে কর্নেল বেনিনের ওপর। বাকি সবাই পালিয়েছে। নিরীহ পথ-

চারী বা ফেরিওয়ালা যারা হতাহত হয়েছে তাদের কথা ভেবে মন খারাপ করলেও, সরকারী অফিসাররা রানাকে বললো, কলম্বিয়ায় এ-ধরনের মৃত্যু এতো বেশি ঘটে যে কেউ কোনো গুরুত্ব দেয় না। মারা গেছে কিশোর ছেলেটা, নিজের জুতো পালিশ করার বাক্সের পাশে। মারা গেছে একজন বলিভিয়ান ট্যুরিস্ট, সন্দেহ করা হলো লোকটা সম্ভবত ড্রাগ ব্যবসার সাথে জড়িত ছিলো। একজন ট্যাক্সি ড্রাইভারও নিহত হয়েছে। এ-সবের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো চৌরাস্তায় জনসম্পত্তির ক্ষতি হয়েছে। ভিক্টর লজেনের অ্যারোভিয়াস অফিসের ক্ষয়ক্ষতিটাকে অফিসাররা ভয়ংকর বলে বর্ণনা করলো। চেহারায় উদ্বেগ নিয়ে পায়চারি শুরু করলেন কর্নেল বেনিন।

'আমাদের সাফল্যের কথা ভুলে যাওয়া হবে,' বললেন তিনি। 'আমার নিন্দায় মুখর হয়ে উঠবে প্রেস। আপনি কলম্বিয়ায় রয়েছেন, মিঃ রানা। এখানকার হালচাল সম্পর্কে আপনার কোনো ধারণা নেই। কার্টেলের পক্ষে না লেখার সাধ্য এখানে কারো নেই।'

'সংকট উত্তরণ একটা শিল্পকলা,' শান্ত সুরে বললো রানা। 'আগেই সাবধান হতে পারলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব। দেরি না করে ঘটনার ব্যাখ্যা দিয়ে এখুনি একটা বিবৃতি দিন আপনি। স্পষ্ট ও সত্যি হওয়া চাই। মিথ্যে বলবেন না। যদি কোনো প্রশ্নের উত্তর দেয়া সম্ভব না হয়, প্রসঙ্গটা তুলবেন না। নিরাপত্তার দোহাই দিন।'

'কিন্তু আপনার কথা কি বলবো আমি?'

'কিছুই বলবেন না। বলবেন, সবই আপনার নেতৃত্বে আপনার লোকজন করেছে। সত্যি কথাই বলা হবে।'

'আমার নেতৃত্বে আমার লোকজন,' ঠোঁটে বাঁকা হাসি ফুটিয়ে বললেন কর্নেল। 'কি করে জানবো সত্যি কথা বলছি আমি?' তিনি

আসলে বিবেকের দংশনে ভুগছেন, রানার কৃতিত্ব এতো তাড়াতাড়ি ভুলে যেতে পারছেন না।

সাথে সাথে জবাব না দিয়ে অফিস কামরার চারদিকে চোখ বোলালো রানা। এখানে নিয়মিত অফিস বসে, দেখে তা মনে হলো না। গোটা দেশ চষে বেড়াচ্ছেন কর্নেল বেনিন, কখন কোথায় বসবেন আগে থেকে কাউকে জানান না। তাঁর মতো আর যাদের আততায়ীদের হাতে খুন হবার ভয় আছে, তাদেরও অফিসে বসার নির্দিষ্ট কোনো ছক নেই। 'গর্ডন উইন্টারকে ধরার জন্যে যে ফাঁদটা পাতা হয় তার জন্যে আপনার অনুমতি নেয়া হয়েছিল,' বললো রানা। 'অপারেশনে আপনার লোকেরা অংশগ্রহণ করে। হতাহতও তারা হয়েছে। এ-সবই তো সত্যি, তাই না?'

'বোঝা যাচ্ছে, আপনি প্রচার পছন্দ করেন না,' গম্ভীর মুখে বললেন কর্নেল। 'সেক্ষেত্রে, আপনাকে আমি ব্যক্তিগতভাবে অভিনন্দন জানাই। আনঅফিশিয়ালি হলেও, কলম্বিয়া সরকার ও জনগণের পক্ষ থেকে জানাচ্ছি, আপনার প্রতি আমরা অত্যন্ত কৃতজ্ঞ, মিঃ রানা। কার্টেলের সহযোগী এই আমেরিকান লোকটাকে ধরার জন্যে অনেক দিন ধরে চেষ্টা করেও আমরা সফল হইনি।'

'সমস্ত কৃতিত্ব আপনার,' বললো রানা। 'আজকের অপারেশনে আপনিই হিরো।'

গম্ভীর হাসি ফুটলো কর্নেলের মুখে। 'এডিটর কথা দিয়েছে এক ঘণ্টার মধ্যে টেপটা ফেরত দেবে।'

'ক্যামেরাই সত্যি কথা বলবে। হাসিয়েনদায় আপনার সাফল্যের সরাসরি প্রতিক্রিয়া হলো চৌরাস্তার ঘটনা। কার্টেল আপনাকে ভয় করে, তাই আপনাকে মেরে ফেলতে চেয়েছে। বিবৃতিতে আপনি

আরো বলতে পারবেন, আততায়ীদের লিডার ধরা পড়েছে। কলম্বিয়ায় তার উপস্থিতি প্রমাণ করে ড্রাগ ব্যবসাতে বিদেশী এজেন্টরাও জড়িত।'

চেহারা উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো কর্নেলের, তারপর কি ভেবে উদ্বেগের সাথে তাকালেন টমাস কালভিনের দিকে। অফিস কামরার এক ধারে একটা চেয়ারে বসে পা দোলাচ্ছে সে। 'এ-ধরনের একটা ব্যাপার ফাঁস করা হলে মার্কিন সরকার কিভাবে নেবে, মিঃ টমাস? আমি আবার তাদের বিরাগভাজন হবো না তো?'

'গর্ডন উইন্টারকে আমরা বিশ্ব নাগরিক বলতে পারি,' বললো কালভিন। 'লোভ যে ভৌগোলিক সীমা বা জাতীয়তা মানে না, সে তার জ্বলন্ত প্রমাণ। ব্যাপারটা যদি এভাবে তুলে ধরা হয় তাহলে আমার সরকারের পক্ষে তা সহনীয় হবে।'

'তাছাড়া,' বললো রানা, 'এখুনি আমরা তার পরিচয় প্রকাশ করছি না। বলে দিন, জখমগুলো একটু সারলেই তাকে প্রেসের সামনে হাজির করা হবে।'

'কি বলছেন! সে তো আহতই হয়নি!' পিঠ বাঁকা করে কর্নেল বেনিন নিজেই একটা প্রশ্নবোধক চিহ্ন হয়ে দাঁড়ালেন। 'কথাটা মিথ্যে বলা হবে। বেশ বড় একটা মিথ্যে।'

'এখনো,' প্রথম শব্দটার ওপর জোর দিয়ে বললো রানা, 'আহত হয়নি সে।'

রানার দিকে এমন দৃষ্টিতে তাকালেন কর্নেল, যেন তাঁর সন্দেহ হচ্ছে মানসিকভাবে সুস্থ নয় ও। কালভিনের দিকে ফিরলেন তিনি। 'উনি কি বলছেন শুনছেন, মিঃ টমাস?'

'আমার বিশ্বাস, রানা বলতে চাইছে, কারো পক্ষে অনাহত হওয়া

সম্ভব নয়,' বললো কালভিন। 'বরং উল্টোটা ঘটা সহজ।'

রক্তপাতের ভালো সম্ভাবনা দেখতে পেয়ে উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন কর্নেল, তবে সতর্কতার সাথে নিশ্চয়তা দাবি করলেন। 'লোকটা আপনার দেশী। তার কষ্ট আর অপমান আপনি মেনে নেবেন?'

'প্রয়োজন হলে, হ্যাঁ,' বললো কালভিন।

রানা বললো, 'তবে বেশিরভাগ সম্ভাবনা ঘটনাটা আপনা থেকেই ঘটবে।'

'আত্মপীড়ন?' জানতে চাইলেন কর্নেল। 'কোনো দাগ থাকবে কি?'

'না,' বললো রানা। 'ঘটনাটা অপারেশনে থাকার সময় ঘটতে পারে।'

'অপারেশন? কিসের অপারেশন?' আকাশ থেকে পড়লেন কর্নেল বেনিন।

'সিনর উইন্টারের সাহায্য নিয়ে যে অপারেশনটা করতে যাচ্ছি আমরা।'

'সাহায্য?' হাঁ হয়ে গেল কর্নেল। 'গর্ডন উইন্টারের মতো লোক আমাদের সাহায্য করবে? অসম্ভব!'

'তার সুমতির প্রতি আবেদন জানাবো আমরা,' বললো রানা। 'তাতে সব সময় কাজ হয়।'

কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে থাকার পর গলা ছেড়ে হেসে উঠলেন কর্নেল। 'আপনি হাসির একটা অ্যাটম বোমা, মিঃ রানা। অদ্ভুত সব কথা বলেন। তবে, স্বীকার করছি, ভিক্টর লজেনকে খতম করতে হলে এ-ধরনের সাহায্য আমাদের পেতে হবে। সে একটা পাগল, আপনি জানেন। সেজন্যেই তাকে আমরা শতো চেষ্টা করেও নাগা-

লের মধ্যে পাইনি।'

'তার নাগাল পাবার জন্যে, আপনি বলতে চাইছেন, আরেক পাগলের দরকার, তাই না?' জিজ্ঞেস করলো কালভিন।

'ঠিক পাগল বলতে চাইনি,' সংশোধন করে-দেয়ার সুরে বললেন কর্নেল। 'বলতে চেয়েছি পাগলাটে। আর প্রতিভাবানরা যে এক-আধটু পাগলাটে হয় তা কে না জানে!'

ইন্টারোগেশন রুমে ঢুকে ওরা দেখলো, কর্নেলের সৌজন্যে খুব একটা ভালো অবস্থায় নেই গর্ডন উইন্টার। তার ট্রাউজার ছিঁড়ে গেছে, অদৃশ্য হয়েছে জুতো জোড়া। লম্বা, খাড়া নাকে সরু একটা লালচে দাগ, দু'পাশে রক্ত শুকিয়ে আছে। মুখ থেকে রক্ত নেমে যাওয়ায় সাদা চামড়ার ওপর লালচে তিলগুলো ফ্যাকাসে লাগছে। হাত দুটো স্থির রাখতে পারছে না, বারবার লাল চুল আর লাল গোঁফে উঠে যাচ্ছে।

বন্ধ জানালায় পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়ালো কালভিন, নরম কিন্তু জরুরী সুরে কথা বলতে শুরু করলো। ঠিক যে উইন্টারের দিকে তাকিয়ে বা সরাসরি তার উদ্দেশ্যে কথা বললো সে, তা নয়। ভাব দেখে মনে হলো সামনে উপস্থিত শ্রোতাদের একটা গল্প শোনাচ্ছে।

'গর্ডন উইন্টার। এল গুসানো নামেও ডাকা হয়। অর্থাৎ পোকা। মাঝখান থেকে কেটে ফেলো, ভেতর থেকে শুধু তিল বেরোবে। বিশ্বস্ত সূত্র থেকে আমরা জানতে পেরেছি, তরল যে-কোনো জিনিসই ঢক ঢক করে গেলে—মায় পেচ্ছাব পর্যন্ত। শুনেছি পুরনো মদের বোতলে যদি পোকা জন্মায়, তাও খেয়ে ফেলে।'

একটা সিগার ধরিয়ে বন্ধ দরজার পাশে হেলান দিলো রানা।

মাথার ওপর হাত তুললো কালভিন, জানালার গরাদ ধরে বলে চললো, 'প্রথম তার সম্পর্কে আমরা জানতে পারি·· উনিশ শো আটাত্তর সালে···ফুয়েলের অভাবে একটা ডিসি-থ্রি যখন নিরাপদে ফোর্স ল্যাণ্ডিং করে ফ্লোরিডায়। প্লেন থেকে বেরিয়ে এসে এক লোক পাশের হাইওয়েতে উঠে পড়ে, তার চেহারার বর্ণনার সাথে গর্ডন উইণ্টারের চেহারা হুবহু মিলে যায়। লোকটা ভোজবাজির মতো গায়েব হয়ে যাওয়ায় সিনিয়র অফিসাররা মস্ত এক ধাঁধায় পড়েছিল, মনে আছে আমার। তারা আরো ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল প্লেনের ভেতর উঁকি দিয়ে। প্রায় চল্লিশ পাউণ্ড হেরোইন ছিলো!' কপালে হাত চাপড়ালো কালভিন, চটাস করে শব্দ হলো। 'এক লোককে গ্রেফতার করা হলো, পরিত্যক্ত প্লেন থেকে হেরোইন ভর্তি একটা ব্যাগ নিয়ে পালাবার চেষ্টা করছিল সে। এল গুসানোর কিছুই হলো না, বেচারা পথিকের জেল হয়ে গেল। তার বউ অবশ্য তাকে বারণ করেছিল, কান দেয়নি সে। বউটা পাইলটকেও দেখেছিল, বলেছে পঞ্চাশ বছর পরও চেহারাটা মনে করতে পারবে।'

কালভিনের কথায় উইণ্টারের কোনো ভাবান্তর ঘটলো না। কালভিনের দিকে ভুলেও তাকালো না সে, তাকালো রানার দিকে। বললো, 'আপনি আমেরিকান নন। বুঝতে পারি যখন আপনি আমার মাথার ঠিক ওপরে দু'টো গুলি করলেন। যদি আমেরিকান হতেন, কি ঘটতো, জানেন? প্রথমত, আপনার মতো সাবধান করার চেষ্টা না করে সরাসরি মাথায় গুলি করতো সে। আর যদি কোনো বিশেষ কারণে আপনার মতো সাবধান করার জন্যে গুলি করতো, নির্ঘাৎ লক্ষ্যভ্রষ্ট হতো সে, এতোক্ষণে মরে ভূত হয়ে যেতাম আমি। কাজেই, শুধু যদি কৃতজ্ঞতা জানাবার জন্যেও হয়, আপনার পরিচয়টা আমার জানা দরকার।'

কথা না বলে রানা শুধু নিঃশব্দে কাঁধ ঝাঁকালো।

বাধাটাকে বাধা বলে গ্রাহ্য করলো না কালভিন, সে তার কথা বলে চলেছে, 'ফ্লোরিডার ওই এলাকাতেই বসবাস করছে বউটা, আমি তার ঠিকানা জানি। শেষবার দেখা হয়েছে গত বছর। স্বামী জেল থেকে বেরোবার পরপরই মারা যায়। স্বাভাবিক মৃত্যু, কিন্তু বউটার ধারণা তার মৃত্যুর জন্যে দায়ী হলো সেই লোকটা, যাকে সে প্লেন থেকে নেমে হাইওয়েতে উঠতে দেখেছিল। চেহারাটা মনে আছে কিনা জিজ্ঞেস করায়, সেই আগের উত্তরটাই দিয়েছে সে আমাকে, পঞ্চাশ বছরেও ভুলবে না। এখন আমার কাজ, তোমাকে তার সামনে হাজির করা। সে তোমাকে সনাক্ত করবে। ব্যস, জেলে যাবে তুমি। নিরানব্বুই বছর, কমপক্ষে। আইন তো তোমার জানাই আছে।'

'আপনার গাড়িটা জানালা দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়লো, এ যেন এখনো আমি বিশ্বাস করতে পারছি না,' রানাকে বললো উইন্টার। 'আহ্, শুধু যদি দরজাটা পেরোতে পারতাম, তাহলে আর আমাকে পেতো কে! পেছনে আরেকটা টাউন কার ছিলো, বুঝলেন।'

জানালার গরাদ থেকে হাত নামিয়ে এগিয়ে এলো কালভিন, নির্লিপ্ত চেহারা। উইন্টারকে পাশ কাটাতে গিয়ে কি ভেবে থামলো সে, তারপর ঠাস করে চড় মারলো তার গালে। টুল থেকে ছিটকে মেঝেতে পড়ে গেল উইন্টার।

কয়েক মুহূর্ত নড়লো না সে। রানার ভয় হলো, পোকাটাকে হয়তো সত্যি সত্যি মেরে ফেলেছে কালভিন। ব্যাপারটা ক্ষতিকর হবে। ওদের পরবর্তী কর্মসূচী নির্ভর করছে উইন্টার গোঙায় কিনা তার ওপর। রানার আশা পূর্ণ করে ফোঁস করে নিঃশ্বাস ছাড়লো সে, চোখ মেলে চকচকে পিতলের বোতামে নিজের প্রতিচ্ছবি দেখলো। তার দিকে

ঝুঁকে একটা কব্জি ধরলো কালভিন, সেটা ছাড়িয়ে নিয়ে নিজেই বসলো উইন্টার, তারপর দাঁড়ালো। টুলটায় বসতে যাবে, লাথি মেরে সেটাকে কামরার আরেকদিকে ফেলে দিলো কালভিন।

কারো দিকে না তাকিয়ে উইন্টার জিজ্ঞেস করলো, 'রুমাল-টুমাল কিছু আছে, নিজেকে আমার পরিষ্কার করা দরকার।' তার গায়ে ধুলো লেগে রয়েছে।

'তোমাকে পরিষ্কার করতে পারে এমন পদার্থ এখনো আবিষ্কার হয়নি,' বললো কালভিন। 'আমি চাই তুমি মনোযোগ দাও, গর্ডন।'

'তোমার প্রতিটি কথা শুনেছি আমি।'

'কোন্‌টা পছন্দ হয়নি তোমার?'

'মিথ্যেগুলো,' বললো উইন্টার। 'তোমরা, ডি. ই. এ. শুধু মিথ্যে গল্প বানাও।'

দ্বিতীয়বার উইন্টারের গায়ে হাত তুললো না কালভিন। আবেগ জড়িত প্রতিক্রিয়া আশা করেছিল সে, সেটা পেয়েছে। ভাগ্যের সহায়তা পেলে বাকিটুকু আপনা থেকেই ঘটবে। 'তুমি বোধহয় জানতে চাও, কালি শহরের মাঝখানে বন্দুকযুদ্ধ শুরু করায় ডি. এ. এস. তোমার বিরুদ্ধে কি করতে যাচ্ছে, তাই না?'

'না,' বললো উইন্টার। 'আমি শুধু জানতে চাই আমার কাছ থেকে কি ছাই চাও তুমি।'

এই প্রথম মুখ খুললো রানা, 'ভিক্টর লজেন।'

দু'বার চোখ মিটমিট করলো উইন্টার। তারপর এমন ভঙ্গিতে মাথা নাড়লো, ভেতরে যেন পানি ভরা আছে। 'আপনি ডি. ই. এ.-এর কেউ নন। ডি. ই. এ.-এর কোনো লোক ভিক্টর লজেন উচ্চারণ করার সময় ঢোক গেলে, তোতলায়। উঁহুঁ, আপনি অন্য কিছু।

ভাবছি··· ।'

'তোমার সাথে প্রথম যখন কথা হলো, তখনই আমি জানিয়েছি, উইন্টার ।'

'আপনি বলেছিলেন, মরার সময় হয়েছে ।'

'রজার ।'

মাথা ঝাঁকালো উইন্টার । ক্ষীণ হাসি ফুটলো তার ঠোঁটে । 'আপনি একজন পাইলট ?'

'প্রয়োজনে ।'

'তাহলে আমার ব্যাপারটা খানিকটা বুঝতে পারবেন,' বললো উইন্টার, যেন সে তার ভাইকে খুঁজে পেয়েছে । 'ওটাই আমার আসল পরিচয়, একজন পাইলট । যেখানে নিয়ে যেতে বলে, নিয়ে যাই । যা করতে ইচ্ছে করে, করি । আমি কাউকে অর্ডার করি না, কারণ বিদেশে কেউ আমাকে নেতাদের সারিতে দেখতে চায় না । আমি নেতাদের আদেশ পালন করি, কারণ তাতে ফুর্তির সাথে বেঁচে থাকা যায় । সব মিলিয়ে হিসেব করুন, যোগফল থেকে ভিক্টর লজেনকে পাবেন না ।'

'বলতে চাইছো তুমি এতো গুরুত্বপূর্ণ কেউ নও যে ভিক্টর লজেনের মতো লিডারের হদিশ জানবে । তবে আমরা জানি, কার্টেলের সাথে তোমার সম্পর্ক এতোই দূরের ও ক্ষীণ যে আটক করা কোকেন ছিনিয়ে নেয়ার জন্যে বেশ কয়েকবারই সশস্ত্র দল নিয়ে হামলা চালিয়েছ তুমি ।'

কাঁধ ঝাঁকালো উইন্টার । 'আমার দায়িত্ববোধ আছে ।' এবার হাসলো না সে ।

'আমার জানামতে,' বললো রানা, 'টেক্সাসে তোমার স্ত্রী ও একটা

বাচ্চা আছে। ওদের জন্যে আমরা কিছু করতে পারি।'

'আলোচনার এ-ধরনের মোড় পরিবর্তন আমার ভালো লাগছে না,' বললো উইন্টার। 'আমার স্ত্রী ও বাচ্চা ভালোই আছে। আমার চেয়ে ভালো আছে তারা।'

'উইন্টার, একটা জিনিস বোঝার চেষ্টা করো। মার্কিন সরকারের জন্যে তুমি একটা বিড়ম্বনা। তারা চায় না কলম্বিয়ায় তোমার বিচার হোক। বিচারের জন্যে তোমাকে যদি আমেরিকায় নিয়ে যাওয়া হয়, কি ঘটবে তা তো জানোই। জেল ভেঙে পালাতে পারবে, সে আশা নেই। তোমার একমাত্র উপায় আমাদের সাথে সহযোগিতা করা।'

'আপনি আমাকে জল্লাদ বাছাই করার পরামর্শ দিচ্ছেন, তার বেশি কিছু নয়।'

'সে সুযোগই বা ক'জন পায়?'

'ঠিক আছে, আপনাকে আমি বহন করবো, পাইলট,' দ্রুত বললো উইন্টার।

খুব তাড়াতাড়ি রাজি হয়ে গেল উইন্টার। আসলে দর কষাকষি শুরু করতে চায় সে। এতোদিন সে আইনকে ফাঁকি দিতে পেরেছে এই গুণটার জন্যে, পরিস্থিতির সাথে দ্রুত নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারে বলেই।

'তুমি আমাকে লজেনের কাছে নিয়ে যাচ্ছো,' বললো রানা। 'এখুনি। এই একটাই সুযোগ আছে তোমার।'

বাঁকা এক চিলতে হাসি ফুটলো উইন্টারের ঠোঁটে। 'কিভাবে তা সম্ভব বলে মনে করেন আপনি?'

'হেলিকপ্টারে করে সম্ভব,' বললো রানা। 'চালাতে পারবে তো, দুর্ঘটনা না ঘটিয়ে?'

'কিছু এসে যায় ?'

যথেষ্ট দ্রুত বা যথেষ্ট বুদ্ধিমানের মতো চোখা একটা উত্তর দিতে না পারায় মনটা খারাপ হয়ে গেল রানার।

পশ্চিম পাহাড়শ্রেণীর পিছনে ঢলে পড়ছে সূর্য, হেলিকপ্টার নিয়ে আকাশে উঠলো ওরা। প্রতিশ্রুতি মতো এইচইউ-টোয়েনটি থ্রি যোগান দিয়েছেন কর্নেল বেনিন, সাথে কো-পাইলট হিসেবে একজন লেফটেন্যান্ট। চালাচ্ছে উইন্টার, ওদের গন্তব্য সম্পর্কে একমাত্র তারই পরিষ্কার ধারণা আছে। কাউকা উপত্যকার ওপর দিয়ে উত্তর-উত্তর-পুব দিকে যাচ্ছে ওরা। তিন হাজার ফুট ওপরে রয়েছে চপার। দু'পাশে মাথা তুলে রয়েছে বিশাল পাহাড় প্রাচীর।

বিশ মাইলের মতো এগোবার পর নিচের উপত্যকা চওড়া হতে শুরু করলো, সমতল ভূমিতে চাষ করা হয়েছে আখ আর তামাক। পশ্চিম দিকে ঘুরে গেল চপারের নাক। এদিকে শুধু তামাক খেত দেখা গেল, খেতের পাশে বড় বড় দোচালা। খুব নিচু দিয়ে চপার চালালো উইন্টার, দোচালার খড়ের তৈরি চাল রোটরের বাতাসে মনে হলো উড়ে যাবে। রানা বুঝতে পারলো কো-পাইলট আর আরোহী-দের নার্ভ পরীক্ষা করছে লোকটা।

যদি ধরা পড়ে তার উদ্দেশ্য খারাপ, তবু তেমন কিছু করার নেই ওদের, এক গুলি করা ছাড়া। তবে, বেশি বাড়াবাড়ি করলো না উই-ন্টার। কেউ তেমন অস্বস্তিবোধ করছে না দেখে চপার নিয়ে আকাশের অনেকটা ওপরে উঠে এলো সে। সামনে একটা পাহাড়, সেটাকে টপকে যেতে হবে। আটচল্লিশ ফুট লম্বা ওজনদার রোটরের ডগা শব্দ করছে শুনে আপনমনে হাসলো উইন্টার। তার জানা আছে চপারটার

ম্যাক্সিমাম অলটিচ্যুড দশ হাজার ফুটের বেশি নয়। বাতাসের হালকা ভাব দেখে বুঝতে পারছে উচ্চতার শেষসীমায় পৌঁছে গেছে হেলিকপ্টার। ইন্সট্রুমেন্ট প্যানেলের দিকে একবারও তাকালো না।

হঠাৎ করে পাহাড়টার মাথায় উঠে এলো ওরা, তীব্র বাতাস কেটে পেরিয়ে এলো শেষ পাহাড়প্রাচীর, নামতে শুরু করলো পাহাড়ী একটা লেকের দিকে। এতোটা ওপর থেকেও গাঢ় নীল দেখালো লেকের পানি। ভূতলের আলোড়ন থেকে সৃষ্টি হয়েছে লেকটা। পাহাড়ী অববাহিকায় কয়েক মাইল জুড়ে গভীর নীল পানির বিস্তার, এতো সুন্দর দৃশ্য খুব কমই দেখেছে রানা।

আরো নিচে নেমে এলো প্লেন। লেকের তীরে কটেজ আর শ্যালে দেখা গেল। মাটিতে দাঁড়িয়ে ওগুলোর বেশিরভাগই নজরে পড়বে না, পাথুরে উত্থান আর গাছপালা এমন ভাবে আড়াল করে রেখেছে। ওরা লেকের ওপর দিয়ে এগোচ্ছে বলে দেখতে পেলো। চপার নামিয়ে পানির কাছাকাছি চলে এলো উইন্টার, পানিতে ঝাপটা দিলো রোটরের বাতাস।

বাঁক নিয়ে উত্তর দিকে ছুটলো চপার। ক্রমশ সরু হয়ে এলো লেক। পানির ওপর মাথাচাড়া দিয়ে থাকা বিশাল একটা পাথরের ওপর ইংরেজি এ অক্ষরের মতো একটা আকৃতি ওদের গন্তব্য। পাথুরে গা বেয়ে নেমে এসেছে সিঁড়িটা জেটি পর্যন্ত। জেটির ওপরই চপার নামালো উইন্টার। শেষবার রানাকে ইন্টারকমে জানিয়েছে সে, 'এখানেই কোথাও আছে আপনার লোক। আমি অন্তত জানি যে দু'দিন আগে ছিলো।'

চপার থেকে নেমেই সিঁড়ি বেয়ে ওপর দিকে ছুটলো ওরা। রানার সাথে পাঁচজন ডি. এ. এস. অপারেটর, একজনকে ওরা চপারের

কাছে রেখে যাচ্ছে। প্রতিরোধ আশা করছে ওরা, বাড়িতে লোক থাকলে এলোপাতাড়ি গুলি করা হবে। কিন্তু সিঁড়ির মাথায় ওঠার পরও কিছু ঘটলো না। দু'ভাগ হয়ে বিল্ডিঙের দু'পাশ দিয়ে এগোলো ওরা। গ্যারেজের ভেতর দিয়ে পিছনের দরজা, সেটাকে পাহারা দেয়ার ব্যবস্থা করে দু'জন অপারেটরকে সাথে নিয়ে একতলার দরজা পেরোলো রানা, তার আগে, উজি বি দিয়ে তালা ভাঙলো। তালা ভাঙার পর সাথে সাথে নয়, গ্রেনেড লঞ্চার দিয়ে টিয়ার গ্যাস ছাড়ার পর ভেতরে ঢুকলো ওরা।

ভেতরটা ফাঁকা। ফার্নিচারগুলো দামী ও সযত্নে রক্ষিত, কিন্তু খালি। কিচেনে সাজানো রয়েছে তৈজসপত্র, সব শুকনো। ক্লজিটে কাপড়চোপড় পাওয়া গেল, কিন্তু সবই গ্রীষ্মকালীন পোশাক, গত বছরে ব্যবহার করা হয়েছে।

তবে টেলিফোনটা জ্যান্তই রয়েছে, ওটার সাথে রেডিও ট্র্যান্সমিটার আর রিসিভারটাও। স্টাডিতে পাওয়া গেল আধুনিক একটা কমপিউটার, সাথে অ্যাড-অন মেমোরি বোর্ড। আবর্জনা ফেলার ড্রামে একটা বাতিল ডিস্ক পেলো রানা, আরো পেলো একটা সিগারেটের অবশিষ্টাংশ, দুই কি তিন ঘণ্টা আগে নেভানো হয়েছে বলে আন্দাজ করলো ও।

এ-সব আবিষ্কার আরো শাস্তি পাবার হাত থেকে রক্ষা করলো উইন্টারকে। ডিস্কটা পাওয়া গেছে বলে খুশি হলো রানা, ওর জানা আছে যোগ্য লোকের হাতে পড়লে নষ্ট একটা ডিস্ক থেকেও কিছু কিছু তথ্য উদ্ধার করা সম্ভব। শ্যালেতে কেউ একজন ছিলো, এটাও সুখবর। কে জানে, ভিক্টরই হয়তো ছিলো। উইন্টারকে দোষ দেয়া যায় না, কারণ কার্টেলের লিডাররা কখন কোথায় থাকবে কেউ তা

আগে থেকে বলতে পারে না।

তবে এ-সব কথা উইন্টারকে রানা বললো না। লাথি মেরে লেকের কনকনে ঠাণ্ডা পানিতে তাকে ফেলে দিলো ও, তার চারপাশে গুলি করলো কয়েকটা। আতংকে ও ঠাণ্ডায় চিৎকার জুড়ে দিলো উইন্টার। রানা তার ভয় দেখে উপলব্ধি করলো, মিথ্যে কথা বললে ধরা পড়ে যাবে। পানি থেকে তোলার পর বললো ও, 'আমি জানি তথ্য গোপন করছো তুমি। এমন একটা কিছু বলো, আমরা যাতে লজেনের কাছাকাছি পৌঁছুতে পারি। জলদি।'

'ঠিক আছে,' বললো উইন্টার। 'আপনাকে আমি সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করছি।'

দুই

বুয়েনস আয়ার্স, আর্জেন্টিনা। ২২শে এপ্রিল, ১৯৫৬।

ব্যাপারটা যে একদিন ঘটবে, হেনেরিক মুলার তা জানতেন। তাঁর নিরাপত্তার জন্যে হুমকি হয়ে দাঁড়াবে হয় কোনো বন্ধু বা কোনো স্বদেশী। সেজন্যেই জার্মান বলে দাবি করে এমন কোনো সংগঠনের সাথে খুব কমই যোগাযোগ রাখেন তিনি। কলম্বিয়া, ব্রাজিল, প্যারাগুয়ে, বলি-

ভিয়া আর চিলির কিছু কিছু এলাকায় জার্মানদের নানা রকম সংগঠন আছে, কখনও ও-সবের ধার দিয়ে যান না তিনি। সেরকম একটা জায়গা হলো বুয়েনস আয়ার্স। তবু, ঝুঁকি আর অস্বস্তিবোধ থাকলেও, মাঝে-মধ্যেই এখানে তাঁকে আসতে হয়।

ইউরোপিয়ানদের সাথে কতো মিল আমাদের, এই বলে গর্ববোধ করলেও আর্জেন্টাইনরা তাঁর সমস্ত ধন-সম্পদ কেড়ে নিয়েছে। জুয়ান পেরন সরকারের সাথে একটা সমঝোতায় এসেছেন তিনি, ফলে ধরে নেয়া চলে অজ্ঞাত পরিচয় নাগরিক হিসেবে আর্জেন্টিনার যে-কোনো অংশে স্বাধীনভাবে আসা-যাওয়া করার অনুমতি দেয়া হয়েছে তাঁকে। কিন্তু তার পরপরই, খোঁচানো শুরু হলো। তারা তাঁর আসল পরিচয় না জানলেও, ফেরারি আসামীর গন্ধ ঠিকই শুঁকে ফেলে। এখানকার স্প্যানিয়ার্ড, ইটালিয়ান আর ইহুদিগুলোর নাক খুব লম্বা। শিকারী কুকুরের মতো তারা, যে শিকার আহত হয়েছে তার গোড়ালির দিকে ওদের লক্ষ্য।

ব্ল্যাকমেইলিঙের শিকার হলেন মুলার সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষের সাহায্য চাইতে গিয়ে। জুয়ান পেরনের স্ত্রী ফার্স্ট লেডি হিসেবে বিপুল ক্ষমতার অধিকারী, যদিও তাঁকে কখনোই কোনো ঝুঁকি নিতে হয় না। মুলারের আবেদন শুনে সহানুভূতি জানালেন তিনি, ব্যক্তিগতভাবে নিশ্চয়তা দিয়ে বললেন, আর যাতে বিরক্ত করা না হয় সেদিকটা দেখবেন তিনি। বিনিময়ে মুলারের নামে জমা করা ন্যাশনাল ব্যাংকের টাকা ক'টা তাঁকে দিতে হবে। টাকা ক'টা মানে কয়েক মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

মুলার বুঝলেন, তাঁকে ধর্ষণ করা হয়েছে। টাকাগুলো যে দিতে হবে, তা-ও তিনি উপলব্ধি করলেন, কারণ না দিলে যেভাবে হোক কেড়ে

নেয়া হবে তাঁর কাছ থেকে। ওই টাকাগুলোই যে তাঁর শেষ সম্বল তা নয়, তবে এরপর তাঁকে হিসেব করে চলতে হবে। টাকার জোরে যে নিরাপত্তা পাওয়া যায় সেটা হারাবেন তিনি।

অতোগুলো টাকা ফার্স্ট লেডির দ্বারা ডাকাতি হয়ে যাবার কারণেই সাঁতেলা লজেনের সাথে ব্যবসায় নামলেন মুলার। বিশপ হুডালের কলেজে পরিচয় হয় দু'জনের, সেই থেকে নির্বাসিত জীবনের দুঃখ-কষ্ট একসাথেই ভোগ করছেন। দক্ষিণ আমেরিকায় আসার ব্যাপারেও সাঁতেলার প্রস্তাব মেনে নেন মুলার।

অপরাধ জগতের তথ্য ভাণ্ডার বলা যায় সাঁতেলাকে, যুদ্ধের আগে মার্সেইলেসে ড্রাগ ব্যবসা করারও অভিজ্ঞতা রয়েছে তার, নতুন করে ব্যবসায় নামার জন্যে দুটোই পুঁজি বলে গণ্য হলো।

কর্সিকান সাঁতেলার সব গুণই আছে, নেই শুধু দূরদৃষ্টি আর বিশেষ দক্ষতা, যার ফলে তার একার পক্ষে বড় কোনো নেটওঅর্ক গড়ে তোলা সম্ভব নয়। এখানেই অবদান রাখলেন মুলার। ইউরোপ আর দক্ষিণ আমেরিকায় এমন অনেক ব্যক্তিত্ব আছে যাদের সম্পর্কে গোপন তথ্য জানা আছে তাঁর। যুদ্ধের সময় জার্মানদের সাথে সহযোগিতা করেছে তারা, যুদ্ধের পর সাধু সেজে নাৎসীদের বিরুদ্ধে ঘৃণা ছড়াচ্ছে। ব্যবসার খাতিরে তাদেরকে ব্ল্যাকমেইল করার সিদ্ধান্ত নেয়া হলো।

ব্ল্যাকমেইল নামক অস্ত্রের হুমকি থেকে অপরাধী বা রাজনীতিক কেউ পুরোপুরি নিরাপদ নয়। গোপন তথ্যগুলো কোত্থেকে, কিভাবে ফাঁস হচ্ছে তা অনেকে আন্দাজ করতে পারলেও, সঠিকভাবে কেউ উৎসটা চিহ্নিত করতে পারলো না। এ-ব্যাপারে সতর্ক থাকলেন মুলার। নিজের চেহারা বদলে নিয়েছেন তিনি, বদলে নিয়েছেন জীবনযাপনের ছক, ফলে নিজের দুষ্কর্মের কথা গোপন রেখে অন্যের

গোপন তথ্য ফাঁস করার হুমকি দেয়া তাঁর পক্ষে সহজ হলো। তিনি জানেন, ঘনিষ্ঠ কোনো বন্ধু বা স্বদেশী ছাড়া আর কারো দ্বারা তাঁর পরিচয় ফাঁস হবার ভয় নেই।

লোকটা কে হতে পারে, তাকে দেখার আগে পর্যন্ত কোনো ধারণা ছিলো না মুলারের। বুয়েনস আয়ার্সে এলে ক্লারিজ হোটেলে ওঠেন তিনি, এবারও উঠলেন। বার-এ ঢুকছেন, দেখেই চিনে ফেললেন লোকটাকে। বার কাউন্টারে দাঁড়িয়ে আছে সে, অপেক্ষা করছে, গ্লাসটার দিকে এমনভাবে তাকিয়ে আছে যেন জানে না কিভাবে তার হাতে এলো ওটা। কিন্তু যখন চোখ তুললো, পরিচিত সেই ব্যাকুল উন্মাদের দৃষ্টি ফুটে উঠলো মুলারকে চিনতে পেরে। উনি তার অফিসার, ওনার কতো আদেশ বিশ্বস্ততার সাথে পালন করেছে সে। শিরদাঁড়া খাড়া হয়ে গেল তার, দৃঢ় পায়ে এগোলো, যেন আদেশ পাবার জন্যে উন্মুখ। 'গ্রুপেনফুয়েরার,' উঁচু গলায়, কিন্তু করুণ বিনয়ের সুরে বললো সে, যেন অনুমোদনের জন্যে আবেদন জানাচ্ছে। 'স্যার!'

এখনো এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব ভেবে স্প্যানিশ ভাষায় মুলার বললেন, 'মাফ করবেন।'

'স্যার, আমি আইখম্যান। ওবারস্টার্ম ব্যানফুয়েরার অ্যাডলফ আইখম্যান।'

সন্দেহ বা অস্বীকার করার উপায় নেই, উপলব্ধি করলেন মুলার। কথা বলার সময় আইখম্যানের কণ্ঠা ঘন ঘন ওঠানামা করলো, যেন আলগা একটা জিনিস চামড়ার ভেতর ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে। মাথায় আগের সেই চুল আর নেই, অনেক পাতলা হয়ে গেছে। তবে আগের মতোই নার্ভাস সে।

'কর্নেল,' বললেন মুলার আইখম্যানকে পাশ কাটিয়ে কোণের

টেবিলটার দিকে এগোলেন, জানেন প্রতিবারের মতো এবারও ওটা তাঁর জন্যে রিজার্ভ রাখা হয়েছে। 'আমার ধারণা, আমাকে তুমি অন্য কেউ বলে ভুল করেছো।'

'অবশ্যই,' বললো আইখম্যান, চারদিকে দ্রুত চোখ বোলালো, ব্যস্তভাবে পিছু নিলো মুলারের। 'ব্যাপারটা আমি বুঝি, স্যার।'

আদর্শ অধঃস্তন বলতে যা বোঝায়, চিরকাল তাই ছিলো আইখম্যান। তবে মাঝে-মধ্যে দিশেহারা বোধ করতো সে, তখন তাকে বিশ্বাস করা যেতো না। যদি বলা হতো ইউরোপের সমস্ত জিপসীদের মেরে ফেলো, চোখের পাতা না ফেলে আইখম্যান শুধু জানতে চাইতো কোথায় তাদের পাওয়া যাবে। 'বেশি বুঝতে চেষ্টা করো না,' মুলার বললেন। 'সেটা তোমার জন্যে বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে। বিপদে পড়তে পারে তোমার আশপাশের লোকজন।'

জড়োসড়ো হয়ে মুলারের সামনে বসে পড়লো আইখম্যান। দুঃস্থ মেয়েদের মতো ভীরু আর কাতর লাগলো তাকে। 'স্যার, প্লিজ, আমাকে ভুল বুঝবেন না। আপনার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ছাড়া আমার অন্তরে আর কিছু কখনো ছিলো না, আজও নেই। আপনি আমার মনিব ছিলেন। আমার কাজ সম্পর্কে একা শুধু আপনি জানতেন। আমি জানি, আপনি আমাকে ত্যাগ করবেন না। আপনার কাজ করার সময় শুধু একটা ঘটনা অন্যভাবে ঘটলে আমি খুশি হতাম। যেদিন আপনি আমাকে ব্লোবেল-এর সাথে ডুয়েল লড়তে বাধা দিলেন, মনটা খারাপ হয়ে গিয়েছিল। ঘটনাটা আপনার ঘটতে দেয়া উচিত ছিলো, স্যার। পিস্তলে ভালো হাত ছিলো ব্লোবেলের। আমাকে মেরে ফেলতো সে।'

ঘটনাটা মনে আছে মুলারের। সেদিন নাক গলিয়েছিলেন, আজ

সেজন্যে নিজেকে তিরস্কার করলেন। গ্লোবেল অবশ্যই খুন করতো আইখম্যানকে, কারণ কিভাবে পিস্তল ধরতে হয় তাই ভালো করে জানতো না সে। একজন ফ্যানাটিকের সাহস ছিলো আইখম্যানের, এক ধরনের নিষ্ফল হিস্টিরিয়া যা জার্মেনীকে বিধ্বস্ত করে দিয়েছে। যুদ্ধের শেষ দিকে ভুয়া পরিচয়-পত্র চকোলেটের মতো ছড়ানো হয় বার্লিনে, অল্প যে দু'চারজন তা নিতে রাজি হয়নি তাদের মধ্যে আইখ-ম্যানও ছিলো। সংশ্লিষ্ট সবাই এতোটাই বিব্রত বোধ করে যে বাধ্য হয়ে তাকে প্রাগে পাঠিয়ে দিতে হয়।

'বর্তমান জীবনে তুমি সুখী নও বলে মনে হচ্ছে, কর্নেল। এতোটাই খারাপ যে মরে যেতে চাও?'

মৃদু হেসে আইখম্যান বললো, 'এখানে আমি রিকার্ডো ক্লিমেণ্ট, স্যার। ভ্যাটিকান থেকে একজন প্রিস্ট পাসপোর্টের ব্যবস্থা করে দেন আমাকে, নামটা তাঁরই দেয়া। আর্জেন্টিনায় সপরিবারে বাস করছি আমি, বউ-বাচ্চা নিয়ে। মার্সিডিজ-বেঞ্জ অ্যাসেম্বলি প্ল্যাণ্টে কাজ করি। আপাতত সামান্য একজন মেকানিক, তবে আশা করি উন্নতি করবো।'

নিজের বোকামিটা টের পেলেন মুলার। পালাবার জন্যে ভ্যাটিকান রুট ব্যবহার করেছে ওবারস্টার্মব্যানফুয়েরার। হুডালের সাথে আলো-চনা করে আয়োজনটা মুলারই করেছিলেন। ভাগ্যই মুলারকে মার্সি-ডিজ ফ্যাক্টরীতে নিয়ে গিয়েছিল। ম্যানেজার লোকটা দক্ষিণ আমেরি-কার সব দেশে গাড়ি রফতানী করতো। মুলারের অনুরোধে যে-কোনো জিনিস রফতানী করতে রাজি ছিলো সে। উনিশ শো তেতাল্লিশ সালের শীতে রাশিয়ান সীমান্তে তিনি যা করেন, তার জন্যে লোকটা মুলারের প্রতি কৃতজ্ঞ ছিলো। সেজন্যে আজও রাশিয়ানরা তাঁকে

খুঁজছে। 'স্বপ্ন আর আশাগুলোকে বাঁচিয়ে রাখো, কর্নেল। তোমার এমপ্লয়ারকে আমি চিনি। কঠিন পরিশ্রমী লোক তিনি, মর্যাদাবান, অন্যের ভেতর এ-সব গুণ থাকলে তিনি ঠিকই চিনতে পারবেন।'

মাথা ঝাঁকালো আইখম্যান। 'আপনার কাছে আমি কোনো অনুরোধ নিয়ে আসিনি, গ্রুপেনফুয়েরার। আমি এসেছি, কারণ এক সময় আপনি আমার মনিব ছিলেন। আপনার সান্নিধ্য পাবার লোভটা সামলাতে পারিনি বলে এসেছি। জানি, এটা স্থায়ী হবে না।'

আপনমনে হাসলেন মুলার, ভাবলেন আইখম্যানের ভেতর তাহলে মানবিক দুর্বলতাও কিছু আছে।

তিন

ভিক্টর লজেনের বিরুদ্ধে একটানা তিন দিন ব্যাপক তৎপরতা চললো। গর্ডন উইন্টারের সাহায্য নিয়ে ডি. এ. এস. তার চারটে আস্তানায় হানা দিলো। পপ্যায়ান শহরের বাইরে একটা বাড়িতে প্রথমবার হানা দিয়ে আরেকটা প্রসেসিং প্ল্যান্ট পাওয়া গেল, স্থানান্তর করার আগের মুহূর্তে উদ্ধার করা হলো সেটা। দ্বিতীয় আস্তানায় পাওয়া গেল ট্রাক ভর্তি কোকেন, তবে কোনো ইকুইপমেন্ট বা কেমিকেল

পাওয়া গেল না। উপকূলীয় শহর বারাঙ্কুইলায় হানা দেয়ার জন্যে দীর্ঘ আকাশ পথ পাড়ি দিতে হলো, একটা ভল্টের বৈশিষ্ট্য নিয়ে তৈরি করা বাড়িটার ভেতর প্রায় কিছুই পাওয়া গেল না। শুধু খবরের কাগজে জড়ানো তিন কিলোগ্রাম কোকেন পাওয়া গেল, একটা ব্যবহার করা কনডমের পাশে। দুটোই মনে হলো ভুল করে ফেলে যাওয়া হয়েছে।

শেষ আস্তানায় হানা দিয়ে আরো হতাশ হলো দলটা। ট্যুরিস্টদের শহর মেলগার-এ ওদেরকে নিয়ে এলো উইন্টার, বোগোটা থেকে বেশি দূরে নয়। অ্যাপার্টমেন্ট ভবনটায় কাউকেই পাওয়া গেল না। ভবনটার সাথে ধনী বা কুখ্যাত কারো সম্পর্ক আছে কিনা তাও জানা গেল না, পাওয়া গেল শুধু একটা নোটবুক। এটাও সম্ভবত ভুল করে ফেলে যাওয়া হয়েছে। কাজে লাগতে পারে এমন কয়েকটা ফোন নম্বর পাওয়া গেল নোটবুকে, অন্তত কালভিনের তাই ধারণা।

ইতিমধ্যে ভিক্টর লজেনের অ্যারোভিয়াস এয়ারলাইনের সমস্ত তৎপরতা বন্ধ করার জন্যে ইঞ্জাঙ্কশন দাবি করে কোর্টের কাছে আবেদন জানিয়েছেন কর্নেল বেনিন। কোর্ট থেকে বলা হয়েছে, ড্রাগ পরিবহনের অভিযোগ মিথ্যে প্রমাণিত না করা পর্যন্ত অ্যারোভিয়াসের কোনো প্লেন টেক-অফ করতে পারবে না।

কিন্তু ভিক্টর লজেনকে কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না। এমন হতে পারে যে তার আখড়াগুলোয় হানা দেয়া হচ্ছে দেখে গা-ঢাকা দিয়েছে সে, কিংবা তার সর্বশেষ ঠিকানা জানা নেই উইন্টারের, অথবা জানা থাকলেও চেপে যাচ্ছে।

শেষটাই সন্দেহ করলো রানা। উইন্টারকে বিশ্বাস করার কোনো কারণ দেখলো না ও। পাইলট হিসেবে অত্যন্ত দক্ষ সে, কলম্বিয়ার

এয়ার রুট সম্পর্কে অভিজ্ঞ, বাতাসের বাউণ্ডুলে মতিগতি সম্পর্কে ভালো ধারণা রাখে, মানচিত্রে নেই এমন অনেক এয়ারফিল্ডের খবর তার জানা। আখ খেতের কয়েক হাত ওপর দিয়ে একশো দশ নটে হেলিকপ্টার চালায় সে, রানাকে আতংকিত করে তোলে।

সময়ের সাথে সাথে নিজের স্বভাব-চরিত্র ফিরে পেয়েছে উইণ্টার। শুধু যে পাইলট হিসেবে বেপরোয়া সে তা নয়, নিজের রোমাঞ্চকর জীবন-কাহিনী বর্ণনা করার ব্যাপারেও তার কোনো ভয়-ডর নেই। ইণ্টারকমে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বক বক করে সে, কো-পাইলটকে নিজের বীরত্বের কাহিনী শোনায়। রানা ধারণা করলো, ঠিক যে কথাটা ওরা শুনতে চায় সেটা না বলার জন্যে এতো সব কথা বলে চলেছে সে।

মেলগার থেকে ফেরার পথে খোশ মেজাজে রয়েছে উইণ্টার, গাছের মগডাল থেকে কয়েক ইঞ্চি ওপর দিয়ে হেলিকপ্টার চালাচ্ছে, অনুসরণ করছে আঁকাবাঁকা গিরিখাদ, আতংকিত করে তুলছে নিচের উপত্যকায় বিচরণরত গরু-ছাগলের পালগুলোকে। 'শুনবেন,' ইণ্টারকমে রানাকে উদ্দেশ্য করে বললো সে, 'কেন আপনারা ভিক্টর লজেনকে ধরতে পারবেন না? কারণটা হলো, সে হিউম্যান নয়। ভিক্টর লজেন একটা পশু, ইয়েস স্যার।'

'আমারও তাই বিশ্বাস।'

'না, আমি বলতে চাইছি পশুদের মতো তার একটা আলাদা সেন্স আছে। কি ঘটবে, আগে থেকে টের পেয়ে যায়। আমি আপনাকে ভুরি ভুরি প্রমাণ দিতে পারি।'

'কি রকম?'

'তার কিছু কিছু আচরণ উদ্ভট পাগলামি বলে মনে হলেও, পরে দেখা গেছে তার পাগলামির জন্যেই একটা বিপর্যয় এড়ানো গেছে।

একটা উদাহরণ দিই। বিরাট একটা পার্টি দিচ্ছে সে। একশোর মতো লোক হয়েছে পার্টিতে। খানাপিনা চলছে, চমৎকার সময় কাটছে সবার। হঠাৎ করে লজেন বললো, চলো। কারো কোনো প্রশ্নের উত্তর দিলো না, কোনো কারণ ব্যাখ্যা করলো না। পার্টি ভেঙে গেল, ফিরে গেল সবাই। পরদিন তারা জানতে পারলো, পার্টি ভেঙে যাবার খানিক পরই হানা দিয়েছিল পুলিশ। যারা ফিরে যায়নি তারা কেউ গ্রেফতার হয়েছে, কেউ অপমানিত।'

'ব্যাপারটা কাকতালীয় হতে পারে, কিংবা ষড়যন্ত্র,' বললো রানা।

'কিন্তু ভূমিকম্প?' জিজ্ঞেস করলো উইন্টার। 'তাও কি ষড়যন্ত্র করে ঘটানো যায়?'

'কি ঘটেছিল?'

'সান সালভাদরের বড় ভূমিকম্পটার কথা মনে পড়ে আপনার?' জানতে চাইলো উইন্টার।

এক সেকেণ্ড পর রানা বললো, 'পড়ে।'

'লজেন ছিলো ওখানে। সব কিছু ভূমি ধসে চাপা পড়ে যাবার আধ ঘণ্টা আগে পর্যন্ত। দিবানিদ্রা থেকে উঠে, চোখ কচলাতে কচলাতে বললো, যাবার সময় হয়েছে। রওনা হয়ে গেলাম আমরা। শহর ছাড়ার জন্যে চপার বাঁক নিচ্ছে, ছ'হাজার ফুট ওপরে আমরা, এই সময় এয়ারপোর্টের কণ্ট্রোল টাওয়ার সাহায্য চেয়ে বার্তা পাঠালো, তাদেরকে যেন উদ্ধার করা হয়। কি যে দুঃখজনক!'

আগ্রহের সাথেই শুনলো রানা। প্রকৃতি আগেই আভাস দেয়, এটুকু অন্তত বিশ্বাস করে ও। প্রকৃতির পূর্বাভাস অনেক সময় ওর অনুভূতিতেও ধরা পড়ে। গভীর রাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল, জানে বিপদ হবে। নির্জন রাস্তা দিয়ে হাঁটছে, শির শির করে উঠলো ঘাড়ের পিছনটা

-ডাইভ দিলো রানা, স্নাইপারের বুলেট একটুর জন্যে ছুঁতে পারলো না ওকে। এ-ধরনের ঘটনা বহুবার ঘটেছে ওর জীবনে।

'যে-লোক সব সময় নেশা করে থাকে, তার বেলায় এটা ঘটে কিভাবে?'

'সব সময় নেশা করে বলেই তো ব্যাপারটা তার কাছে ধরা পড়ে,' জবাব দিলো উইণ্টার।

অদ্ভুত ব্যাপার, কথাটা রানা বিশ্বাস করলো। ওর তাইওয়ানিজ ওস্তাদ আফিম খায়। মার্শাল আর্ট-এর শ্রেষ্ঠ যে-ক'জন ব্যক্তিত্বকে চেনে ও, তাদের অনেকেই নেশাখোর। এমন হতে পারে মস্তিষ্কের ডান ও বাম অংশের মাঝখানের ব্যারিয়ারটাকে ছোটো করে ফেলে ড্রাগ, ফলে কৌশলটা কাজ করে। অব্যবহৃত টেপ আর খালি মাথা এখানে সমার্থক, দুটোতেই ভালোভাবে বার্তা রেকর্ড করা যায়। ড্রাগ যে একটা অবলম্বন তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তবে ড্রাগ যাদের জন্যে দরকারী তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয় ওটার সাথে আরো যে-সব খারাপ উপসর্গ দেখা দেয়, তার জন্যে। 'সান সালভাদরে কি করছিলে তুমি?' উইণ্টারকে জিজ্ঞেস করলো রানা।

'অদ্ভুত এক দল লোকের সাথে কথা বলছিল লজেন,' বললো উইণ্টার। 'একজনেরও চোখ দেখা যায়নি। রঙিন চশমা খুললে তাদের অনেককেই আপনি হয়তো চিনতে পারতেন।'

'কারা তারা?'

'সবাই কনডর-এর লোক, হিটার। লজেনকে তারা পছন্দ করে। বড়সড় একটা বিদেশী সাহায্য নিয়ে কথা বলছিল সে। কয়েক মিলিয়ন ডলার। ওই টাকায় লেটেস্ট ইকুইপমেণ্ট কিনতে পারবে তারা, লোক-জনের আরো বেশি ক্ষতি করতে পারবে। সাহায্যটা পেলে ফোর্ট

লডারডেল-এ নিজেদের একজন লোককেও পাবে, যদি চাওয়া হয়। এল সালভাদরের প্রকৃত নাগরিক তোমরা, তোমাদের হয়তো সত্যি ওটা দরকার।'

'টাকার বিনিময়ে কি আশা করছিল ভিক্টর?'

'বিবেচনা,' বললো উইণ্টার। 'সমর্থন। তার সাথে হয়তো একটা ট্র্যান্সশিপমেণ্ট পয়েণ্ট।'

রানা বললো, 'নিকারাগুয়েতে, সমোজা-র আমলে ভালোই সুবিধে করে নেয় সিনর সাঁতেলা। তার এক আত্মীয়, মুয়েলার, ওখানে দোকান খোলে।'

'নিকারাগুয়াতে এখনো তৎপর ভিক্টর,' জানালো উইণ্টার, বুঝতে পারলো রানার আগ্রহ বাড়াতে পেরেছে। 'ঠিক কার সাথে ব্যবসা করছে জানতে পারিনি, তবে ধনী কোনো রাজনীতিক হবে বলেই আমার বিশ্বাস। ডানপন্থী কোটিপতি আর বামপন্থী কোটিপতির মধ্যে পার্থক্য কি দেখান আমাকে, আমি আপনাকে উড়ন্ত খরগোশ দেখাবো।'

কথাটা মনে গেঁথে রাখলো রানা, সময় ও সুযোগ মতো ন্যাশনাল সিকিউরিটি এজেন্সিকে জানাতে হবে। কনডরদের সম্পর্কে ওয়াশিংটনে কেউ তেমন মাথা ঘামায় না, কারণ ডানপন্থী ইণ্টেলিজেন্স গ্রুপ হিসেবে পরিচিত তারা, মার্কিনীদের পক্ষে কাজ করে। কনডরদের ডেথ-স্কোয়াডও বলা হয়। 'মুয়েলারদের সম্পর্কে কি জানো তুমি?' হঠাৎ করে জানতে চাইলো রানা।

'আপনাকে তো আমি আগেই বলেছি, কিছুই না।'

'ওরা ছিলো দুই ভাই,' বললো রানা। 'ববি আর রলফ। কলম্বিয়া থেকে সরে নিকারাগুয়াতে যায় ওরা, সত্তর দশকের দিকে।'

'হবে হয়তো একজোড়া খচ্চর, তা না হলে নিকারাগুয়াতে যায়!

আপনি কখনো গেছেন ওখানে ?'

'না।'

'আহ্, মানাগুয়া শহরটা যদি দেখতেন! বছর পনেরো আগে কাত হয়ে পড়ে যায় ওটা—আরেক ভূমিকম্পে। পরে কেউ আর ওটাকে খাড়া করার চেষ্টা করেনি। গোটা দেশটাই বরবাদ হয়ে গেছে। অর্ধেক দায়ী বিদ্রোহীরা, বাকি অর্ধেকের জন্যে আপনি প্রকৃতিকে দায়ী করতে পারেন।'

'তা সত্ত্বেও কিছু লোক মনে করে জায়গাটা মন্দ নয়,' বললো রানা।

'গোমূর্খ লোকের অভাব নেই দুনিয়ায়। শুনতে চান তো বলি নিকারাগুয়া কেমন জায়গা। ওদের মিষ্টি পানিতেও হাঙর আছে।'

'আইলাস দ্য মেইজে মুয়েলারদের কোকেন ব্যবসা ছিলো,' বললো রানা। 'তুমি জানো না দেখে অবাক হচ্ছি আমি।'

'সত্তরের দশকে, তাই না ?' হিসেব কষার জন্যে খানিকটা বিরতি নিলো উইণ্টার। 'জনাব, আপনি সুদিনের কথা বলতে চাইছেন! বিলাসবহুল স্যুইটে উলঙ্গ নৃত্যানুষ্ঠানে ব্যবসার চুক্তি হতো। বিজনেস আর প্লেজার, কোনো পার্থক্য ছিলো না। হুমকি না, বোমাবাজি না। সবাই প্রফুল্ল। ইহুদি তরুণরা মায়ামি সৈকতে কোটি কোটি ডলারের ব্যবসা বাগাতো। একটা সময় গেছে বটে। আপনি বলছেন, মুয়েলাররা তখন নিকারাগুয়ায় ? তো কি হলো ?'

'কোকেন ব্যবসাটা জোরেশোরে কবে শুরু করলো লজেন ?'

'বছর দশেক আগে, আমার ধারণা।'

'কোকেন ব্যবসাকে আড়াল করার জন্যে আইনসম্মত ব্যবসা, যেমন ব্যাংকিং, অ্যাড-ফার্ম ইত্যাদিতে ঢুকলো কবে ?'

'কিছুদিন পরই।'

যোগাযোগটা এখানেই কোথাও হবে, ভাবলো রানা। সময়টা মেলে, দুই পরিবারের মধ্যে রক্তের সম্পর্ক ছিলো, ছিলো পেশাগত দক্ষতা। হঠাৎ মনে পড়লো রানার, হণ্ডুরাস আর নিকারাগুয়াতে কণ্ট্রা বিদ্রোহী-দের টাকা আর অস্ত্র যোগান দেয়ার সময় মুয়েলাররা তাদের মায়ের নাম ব্যবহার করেছিল। নিজেদের তারা রলফ আর ববি ডেল বলে পরিচয় দিতো। 'ডেল ভাইদের সম্পর্কে কি জানো তুমি?'

এক মুহূর্ত কিছু বললো না উইণ্টার, তার মাথার পিছনে ফ্লাইট হেলমেট স্থির হয়ে থাকলো। তারপর বললো, 'অনেক আমেরিকানের নাম থাকে ডুরান ডুরান, সে-ধরনের কারো কথা বলতে চাইছেন?'

'রলফ আর ববি ডেল,' বললো রানা। 'যে-কোনো কারণেই হোক মুয়েলার নামটা ত্যাগ করে তারা।'

দীর্ঘ নিস্তব্ধতা নামলো, উইণ্টার যেন দম বন্ধ করে বসে আছে। এক সময় একটা শব্দ হলো ইণ্টারকমে, সেটা যান্ত্রিকও হতে পারে।

রানা বললো, 'ওদের সম্পর্কে বলো, উইণ্টার।'

'আমি শুনেছি ওরা নাকি···ফ্রিডম ফাইটারদের সাহায্য করছিল,' ভেবেচিন্তে জবাব দিলো উইণ্টার।

'তা আমি জানি।'

'তাহলে আমি যা জানি, আপনিও তাই জানেন।'

'উঁহুঁ,' বললো রানা। 'তবে জানবো।'

রানা কি বাড়াবাড়ি করে ফেললো? পরে ওর মনে হয়েছে, উইণ্টারের জীবনটাকে ওভাবে ঝুঁকির মধ্যে ফেলা উচিত হয়নি। আসলে ঠিক সে-সময় সঙ্গত কারণেই প্রচণ্ড রেগে ছিলো ও।

কো-পাইলটকে বললো, 'ওভার টু ইউ।' তারপর স্ট্র্যাপ, বাঁধন ইত্যাদি সহ চেয়ার থেকে হ্যাঁচকা টানে তুলে আনলো উইন্টারকে, ফেলে দিলো হেলিকপ্টারের দরজা দিয়ে নিচে। ঝুলতে থাকলো সে, চপার নিয়ে এক হাজার ফুট ওপরে উঠে এলো কো-পাইলট। এই উচ্চতায় ছ'মিনিট থাকলো ওরা।

প্রথম পনেরো সেকেণ্ডের মাথায় উইন্টার জানালো, মুখ খুলতে রাজি আছে সে। তাতেও সন্তুষ্ট হলো না রানা। সত্যি কথা শুনতে চায় ও। আতংকে চিৎকার জুড়ে দিলো উইন্টার, সেটার মাত্রা লক্ষ্য করে রানা বুঝলো লোকটার স্বভাব বেশ খানিকটা বদলেছে। কো-পাইলটের সাথে চোখাচোখি হতে হাসলো ও, টেনে তুলে আনলো উইন্টারকে।

এরপর তাৎপর্যপূর্ণ কথাবার্তা হলো ওদের মধ্যে। কাঁপুনি ধরে গেছে উইন্টারের। দু'জনের সম্পর্ক যে বদলে গেছে, হাড়ে হাড়ে টের পেলো সে। আগে সে ধারণা করেনি, প্রয়োজনে রানা তাকে খুন করতে পারে। এখন বিশ্বাস করে।

জানা গেল, ববি ডেলকে চেনে উইন্টার। সান সালভাদরের কনডর মিটিং-এ উপস্থিত ছিলো ববি। না, তার স্ত্রী (লিলিয়ান) সাথে ছিলো না। ববির স্ত্রী আছে, সে নারী, শুনে বিস্মিত হলো উইন্টার। তার ভাষায়, ববি ডেল অন্য রকম রুচির মানুষ।

বিভিন্ন ক্ষেত্রে ঠিক কি ধরনের ভূমিকা বা অবদান রাখতো ববি ডেল উইন্টার কোনো দিনই তা বুঝতে পারেনি। সাথে একজন দেহরক্ষী নিয়ে মিটিঙে হাজির হয় সে—সালভাডোরান, সন্দেহ নেই। ভিক্টর তার প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধা দেখায়। এটা একটা ব্যতিক্রম বলা যায়, খুব কম লোককেই শ্রদ্ধা করে ভিক্টর।

মিটিঙে তারা উইন্টারকে থাকতে দেয়নি। কি নিয়ে আলোচনা হয় জানতে পারেনি সে। মিটিঙে ছিলো একজন পানামানিয়ান, তিনজন সালভাডোরিয়ান-একজন অচেনা লোক (সম্ভবত কন্ট্রা বিদ্রোহীদের নেতা-টেতা হবে), কঠোর প্রকৃতির একজন আর্জেন্টাইন, দু'জন কিউবান, একজন আমেরিকান। আমেরিকান লোকটার অদ্ভুত চেহারা এখনো পরিষ্কার মনে আছে উইন্টারের, দেখে মনে হবে লোকটা আবর্জনা খেয়ে বেঁচে আছে।

'লোকটার কি কালো চুল, গলার কাছে ঝুলে আছে চামড়া?' জিজ্ঞেস করলো রানা।

'আপনি তাকে চেনেন?'

'তার সাংকেতিক নাম কি শকুন?'

'আমরা গোপন তথ্য বিনিময় করিনি,' বললো উইন্টার। 'তবে নামটা অর্থবহ। কনডর মানেই তো শকুন। ব্যাপারটা আসলে কি, সে-ই কি সংগঠনটাকে খুঁজে বের করে?'

'হতে পারে।'

'দেখে কিন্তু তাকে অতোটা যোগ্য বলে মনে হয়নি আমার। আমি হয়তো তাকে ভুল বুঝেছি।'

উইন্টার প্রথম বা শেষ ব্যক্তি নয়, ডেভিড গোল্ডব্লাটকে আরো বহু লোক ছোটো করে ভেবেছে। ডেভিড গোল্ডব্লাট ওরফে কনডর ওরফে শকুন পশ্চিম গোলার্ধের বহু অপরাধের সাথে জড়িত। বে অভ পিগস, চিলি, এল সালভাদর, সব জায়গায় সে তার কলংকের চিহ্ন রেখেছে লিলিয়ানের বস্ ছিলো সে, পরে ববিরও বস্ হয়।

ডেভিড গোল্ডব্লাট মানে সি. আই. এ.। বিশেষ অ্যাসাইনমেন্ট নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের ভাবমূর্তি মারাত্মকভাবে নষ্ট করছে সে, এই সময়ে

তাকে ধরে ফেলে রানা। তাকে খুন করেনি বলে নিজের ওপর এখনো রেগে আছে ও। সুযোগ পেয়েও নেয়নি ও। 'তুমি বলেছো, এই লোকগুলোকে চাঁদা দিচ্ছিলো লজেন।'

কাঁধ ঝাঁকালো উইন্টার, যার কোনো অর্থ করা গেল না। 'চাঁদা বোধহয় কঠিন একটা শব্দ।'

কর্নেল বেনিন আর কালভিন বলেছে, সি. আই. এ.-র ভেতর ঢুকে পড়েছে কার্টেল। 'তুমি কি করে জানলে, সত্যি সত্যি টাকাটা দিয়েছে ওদেরকে লজেন?'

'সে নিজেই আমাকে বলেছে,' জানালো উইন্টার। 'লজেন আমাকে বললো, আই বট মাইসেলফ সাম ওভারসাইট।'

'ঠিক এই ভাষায়?'

'সত্যিকার ভালো ইংরেজি জানে সে। যুক্তরাষ্ট্রের কলেজ থেকে একজোড়া ডিগ্রী নেয়া আছে তার।'

'হিপ্পি হবার পরের ঘটনা?'

'হ্যাঁ, বোধহয়।'

'আরিজোনা ইউনিভার্সিটি থেকে।'

'হ্যাঁ।'

রানা ভাবলো, কে জানে সন্দেহ না করে লজেন কিংবদন্তীর আর কোন্ অংশ বিশ্বাস করেছে উইন্টার। সে নিজের চোখে দেখেছে ও নিজের কানে শুনেছে, এগুলো ছাড়া আর কিছু বিশ্বাস করা উচিত হবে না। 'লজেন আর ববি ডেল সম্পর্কে আর কি জানো তুমি?'

'আর কিছু জানি না।'

'তুমি সহযোগিতা করছো না, উইন্টার। আমাদের লেফটেন্যান্ট পাইলট হিসেবে অত্যন্ত ভালো। উপযুক্ততা প্রমাণ করতে না পারলে

তোমাকে আমরা সাথে রাখবো না।'

খোলা দরজা দিয়ে নিচে তাকালো উইন্টার। মেঘের ভেতর ঢুকেছে চপার, এই ঘন কালো মেঘ দু'দিন ধরে মুড়ে রেখেছে বোগোটা আর আশপাশের মালভূমিগুলোকে। নিচে রয়েছে আলু, তামাক, আর আখ খেত। এতো ওপর থেকে কাউকে ফেলে দিলে, ভিজে মাটিতে সেঁধিয়ে যাবে দেহটা। ধরে নেয়া হবে, আরেকজন ককেরস, এটার গায়ে শুধু ফ্লাইট স্যুট। 'শুনুন, ব্যাপারটার কোনো গুরুত্ব নেই,' বললো উইন্টার। 'এই ডেলের সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই।'

'তার সাথে এখন আর কারো কোনো সম্পর্ক নেই। সে মারা গেছে। শুধু তার পরিবারের জন্যে মৃত্যুটা একটা বিষয়। ভিক্টর লজেন ওই পরিবারের একজন সদস্য।'

'কাকে কবর দেয়া হলো?' স্বগতোক্তি করলো উইন্টার, যেন হঠাৎ করে ঘটনাটা মনে পড়ে গেছে তার। 'ওটা তাহলে ববি ডেলের লাশ ছিলো। প্রায় একমাস আগের ঘটনা।'

'একটু ভুল হলো।'

'তিন কি চার হপ্তা আগে,' বললো উইন্টার। 'আমার মনে পড়ছে। সান্তা মারিয়া থেকে লজেনকে নিয়ে গেলাম আমি।'

'তাহলে মুয়েলার এস্টেটেও গেছো তুমি?'

'ওখানে আট শো গজ লম্বা একটা ল্যাণ্ডিং স্ট্রিপ আছে, হাসিয়েনদা থেকে মাইলখানেক দূরে। বিশ্বাস করবেন, ওটা মটার ইমপ্লেইসমেন্ট দিয়ে ঘেরা?'

'শুনেছি জায়গাটা নাকি ভারি সুরক্ষিত।'

হেলমেটের ভেতর মাথা ঝাঁকালো উইন্টার। 'সবখানে ফিফটি-ক্যালিবার বুলেটপ্রুফ কাঁচ দেখতে পাবেন, এমনকি শাওয়ারেও।'

'ওখানে গিয়ে কাদের দেখলে তুমি ?' জানতে চাইলো রানা।

'গোটা পরিবারকে,' বললো উইন্টার। 'ভিক্টরের বুড়ো মা-বাবা। বোন। আর, অবশ্যই ডেলরা। মা, ভাই, বড়ো কর্তা। দু'জনকেই ওদের রলফ বলে ডাকা হয়।'

'ওদের সম্পর্কেই জানতে চাই আমি।'

'ছেলেটা, রলফ, তার ভাই, যে মারা গেছে, দেখতে ববির মতো নয়। প্রায় কালোই বলা যায় তাকে, মা-মামাদের রঙ পেয়েছে। ঠিক অলস বলবো না, তবে একটু ঢিলেঢালা। চোয়ালে বেশ বড় একটা কাটা দাগ আছে, বোধহয় আড়াল নিতে দেরি করায় আহত হয়েছিল।'

ব্যাপারটা মিলে যাচ্ছে, ভাবলো রানা। হণ্ডুরাস আর নিকারাগুয়াতে কণ্ট্রাদের সাথে যুদ্ধ করছিল রলফ ডেল। রানার ধারণা ছিলো, ছোকরা বোধহয় এতোদিনে মরে গেছে। নিজেদের কেলেংকারী ঢাকার জন্যে, যেটা শিগগিরই প্রকাশ না পেয়ে পারে না, তাকে সি. আই. এ.-র মেরে ফেলারই কথা। 'আর বুড়ো কর্তা ?'

'জার্মান ভদ্রলোকের কথা বলছেন ?' জিজ্ঞেস করলো উইন্টার।

জার্মান। নাৎসী। গেস্টাপো প্রধান। 'হ্যাঁ,' বললো রানা।

'ভদ্রলোক হ্যালো বললেন অদ্ভুত ভারি গলায়,' এমন অবাক হয়ে তাকালো উইন্টার, যেন বিস্ময়ের ঘোরটা এখনো কাটিয়ে উঠতে পারেনি সে। 'তবে তাঁর সাথে আলাপ করার সৌভাগ্য আমার হয়নি। আমার অবস্থান তো আর বৃত্তের ভেতর ছিলো না। লক্ষ্য করলাম, বেশিরভাগ সময় দুই বুড়ো ফিসফাস করছেন—তিনি আর সাঁতেলা। ওদেরকে দেখে আমার মনে হলো, যেন এ দুনিয়ার মানুষ নন। বিশেষ করে জার্মান ভদ্রলোকের মধ্যে কি যেন একটা আছে···ঠিক সম্মোহনী শক্তি

নয়, তবে একটা ভয়ানক অলৌকিক ব্যাপার, ভদ্রলোক যেন যমদূত, গা ছমছম করে। কেউ যেচে পড়ে তাঁদের সাথে কথা বললো না। এমনকি ভিক্টরও তার মুখ বন্ধ রাখলো। সবচেয়ে বেশি নাড়া দিয়েছে আমাকে জার্মান ভদ্রলোকের চোখ দুটো। এই চোখ জীবনে খুব বেশি আপনি দেখেননি, জঙ্গলের বাইরে তো কখনোই দেখেননি। ঠিক যেন একটা সাপের চোখ।'

'আমি শুনেছি, ববিকে কবর দেয়া হয়ে গেলে তাড়াতাড়ি করে এস্টেট ছেড়ে চলে যান তিনি।'

'হতে পারে,' বললো উইন্টার। 'বুড়িকে আমি মাল-পত্র গুছিয়ে স্যুটকেসে ভরতে দেখেছি। তবে, কি জানেন, আপনার বন্ধু, বুড়ো জার্মান, তাঁর কোথাও বা কারো কাছ থেকে সরে যাবার দরকার করে না। সবাই বরং তাঁর কাছ থেকে সরে যায়, কারো যদি নিজের মঙ্গল বোঝার ক্ষমতা থাকে।'

'মনে হচ্ছে তুমি খুব প্রভাবিত হয়েছো।'

'দুর্লভ বলবো? মোটকথা, এ-ধরনের মানুষ সচরাচর দেখতে পাওয়া যায় না। আপনি যখন কোনো লোককে চপার থেকে ফেলে দিতে যান, আপনার চেহারা আর চোখ কেমন হয়? তাঁর মধ্যে ঠিক সেই জিনিস দেখেছি আমি, ভাবটা স্থির হয়ে আছে চেহারায়।'

রানা হাসলো না। বুঝতে পারলো, এই লোককেই খুঁজছে ও। হেনেরিক মুলারকে পাওয়া গেছে। এখনো তার হদিশ পাওয়া যায়নি, তবে অস্তিত্ব জানা গেছে।

চার

এল ডোরাডো এয়ারপোর্টের সামরিক হ্যাঙ্গারে টমাস কালভিনের একটা মেসেজ পেলো রানা। কমার্শিয়াল ফ্লাইটে চড়ে আসছে সে, রানা যেন কোথাও না যায়।

মেসেজটার অন্তর্নিহিত অর্থ বুঝতে না পারলেও, যোগ্য পেশাদার-দের ওপর সব সময় আস্থা রাখে রানা, বিশেষ করে জানা আছে উপ-যুক্ত কোনো কারণ ছাড়া কালভিন কিছু করে না। কলম্বিয়ার পরিবেশ গরম হতে শুরু করেছে, কখন কি ঘটে যায় কিছুই বলা যায় না। কাল-ভিন হয়তো কোনো খবর পেয়ে রানাকে নড়াচড়া করতে নিষেধ করে দিয়েছে।

বৃষ্টির মধ্যে ল্যাণ্ড করেছে ওদের চপার। অপেক্ষার সময়টাও বৃষ্টির মধ্যে কাটলো। বেশ খানিকক্ষণ পর ল্যাণ্ড করলো ডি. এ. এস.-এর প্লেনটা, সিঁড়ি বেয়ে একা নেমে এলো কালভিন। ধূসর রঙের একটা রেইনকোট পরে আছে সে, নিতান্ত গরীব ছাড়া সবাই এটা পরে বোগোটায়। 'রানা, দোস্ত, এই শালার বৃষ্টি···।' শুরু করলো সে।

'সমস্যাটা কি, টমাস?' প্রসঙ্গ তুললো রানা।

ডে-রুমের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে গা ঝাঁকিয়ে পানি ঝাড়লো কালভিন। 'লজেন আড়াল থেকে বেরিয়ে এসেছে,' বললো সে, চেহারায় খুশির কোনো ভাব নেই

'কেউ তাকে দেখেছে ?'

'কেউ নয়, হাজার হাজার লোক।'

'বুঝলাম না।'

'ওখানে তোমার থাকা উচিত ছিলো,' তিক্তকণ্ঠে বললো কালভিন। বোগোটায় টুর্নামেন্ট শুরু হতে যাচ্ছে, লজেনের টিমও অংশ নেবে। আজ রাতে তারা মেডিলিন থেকে রওনা হলো। খেলোয়াড়দের নিয়ে টেক অফ করবে প্লেন, এই সময় কালো একটা হেলিকপ্টার দেখা গেল আকাশের কোণে। প্লেনের পঞ্চাশ গজের মধ্যে ল্যাণ্ড করলো সেটা। দরজা খুলে বেরিয়ে এলো লজেন। সাদা গামা ইউনিফর্ম পরে ছিলো সে—খাকি শার্ট, নীল প্যান্ট, বেরেট। ক্যাপটেনের সাথে হ্যাণ্ডশেক করলো, টিমের সাফল্য কামনা করে মদ খেলো, ফিরে গেল চপারে। সব মিলিয়ে নব্বুই সেকেণ্ড ছিলো। সে কে, লোকজনকে শুধু এইটুকু বোঝার সুযোগ দেয়ার পর চলে গেল। যাবার সময় আকাশ থেকে রাজনৈতিক বক্তব্য ছাপা কিছু প্রচারপত্র ছড়িয়ে গেল।'

'কেউ অনুসরণ করেনি ?'

'সময় পেলে তো,' বললো কালভিন। 'ফোন করে কর্তৃপক্ষকে জানানো হলো, কিন্তু ততোক্ষণে মেডিলিন ছেড়ে বহুদূর চলে গেছে সে।'

'চপারটা সম্পর্কে কিছু জানা গেছে ?'

'রাডারে একটা ব্লিপ ধরা পড়েছে, উপত্যকা ধরে দক্ষিণ-দক্ষিণপুব দিকে যাচ্ছে। স্ক্রীনের একেবারে নিচের দিকে ছিলো ব্লিপটা, মাঝে

মধ্যেই হারিয়ে যাচ্ছিলো। তিরিশ মাইল পর আর দেখা যায়নি।'

দক্ষিণ-দক্ষিণপুব, ভাবলো রানা। মনে পড়লো, মুয়েলার এস্টেটটা ওদিকেই। তবে কালভিনের সাথে ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করলো না। জিজ্ঞেস করলো, 'তোমার মনে হয়নি, লজেন কি যেন বলার চেষ্টা করছে আমাদের?'

'বিদ্রূপ করছে?'

মাথা ঝাঁকালো রানা।

'আসলে পাল্টা আঘাত হানছে, রানা,' বললো কালভিন। 'লিফলেটে কি ঘোষণা করা হয়েছে জানো? এক্সট্রাডিশন চুক্তি বাতিল করার দাবিতে একদিনের হরতাল আহ্বান করেছে সে, হরতালের সময় বিক্ষোভ মিছিল আর সমাবেশও হবে। এয়ারলাইন বন্ধ করার জন্যে সরকারকেও নানা ধরনের হুমকি দিয়েছে।'

'কি ঘটবে বলে মনে করো?' জানতে চাইলো রানা। 'হরতাল ডেকে রাস্তায় দাঙ্গা-হাঙ্গামা বাধাবে সে?'

'রাজনীতিকরা তাই আশংকা করছেন। ডি. এ. এস. বলছে, হতে পারে।'

'সরকার কিভাবে নিচ্ছে ব্যাপারটা?'

'ঠিক জানা নেই,' বললো কালভিন। 'কর্নেল বেনিন বলছেন, তাঁরা লজেনকে রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে মেনে নিতে রাজি নন।'

'এক্সট্রাডিশন চুক্তিটা কোন পর্যায়ে আছে জানো?'

ভিজে রেনকোটের ভেতর অস্বস্তির সাথে নড়ে উঠলো কালভিন। 'আমাকে বলা হয়েছে, চুক্তিটা পুরোপুরি অনুমোদন করেছে কোর্ট। বাকি আছে শুধু প্রেসিডেন্টের সই।'

'চমৎকার,' বললো রানা। 'আমরা এখন কি করবো?'

'ফিরে যাবো মেডিলিনে।'

'ভেবো না তাকে আমরা রাস্তা-ঘাটে দেখতে পাবো। অতো বোকা সে নয়।'

'তুমি বলতে চাও ফুটবল টিমটাকে বিদায় জানাতে আসা বুদ্ধিমানের কাজ হয়েছে তার?'

'ঠিক সময়মতো পালিয়ে যেতে পারায় ব্যাপারটাকে তোমার ব্রিলিয়াণ্ট বলতে হবে।' এক সেকেণ্ড চিন্তা করলো রানা। 'তবে তোমার কথাই ঠিক। মেডিলিনেই ফিরে যাওয়া উচিত আমাদের। যেখানেই থাকুক সে, শহর থেকে খুব বেশি হলে দু'ঘণ্টার পথ।'

'দু'ঘণ্টার পথ মানে কয়েক শো মাইলও হতে পারে,' বললো কালভিন।

'পারে।'

মেডিলিনের আশপাশে বেশ কয়েক জায়গায় হানা দিয়েও ডি. এ. এস. লজেনের কোনো হদিশ করতে পারেনি। পরে জানা গেছে, যেখানে তাকে আশা করা হয়নি ঠিক সেখানেই ছিলো সে। উইণ্টারের কথা অনুসারে, শান্ত পরিস্থিতিতেও মাঝে মধ্যে দু'একদিন পরপর আস্তানা বদল করে লজেন। এখনকার যে পরিস্থিতি, হয় সে সারাক্ষণ চলার মধ্যে থাকবে, নয়তো এমন কোথাও গা-ঢাকা দেবে যেখানে খোঁজার কথা কেউ ভাববে না।

লজেন কোথায় থাকতে পারে সে-ব্যাপারে রানার একটা ধারণা আছে, তবে উইণ্টারের কাছ থেকে উদ্ধার করা তথ্য কালভিনকে জানাবার কোনো ইচ্ছে ওর নেই। এ-ব্যাপারটায় ড্রাগ এনফোর্সমেণ্ট এজেন্সির কোনো ভূমিকা নেই। ভূমিকা আছে শুধু রানার।

তদন্তটা কোন্‌দিকে এগোচ্ছে বুঝতে অসুবিধে হয় না। মুলার আর

লজেন কাছাকাছি, এক হতে যাচ্ছে। দু'জনে যদি মেডিলিনের আশ-পাশে কোথাও ঘাঁটি গাড়ে, ঘাঁটিটা কোথায় হবে আন্দাজ করতে পারে রানা। তবে সেখানে যেতে হলে প্রস্তুতি নিয়ে যেতে হবে। কয়েক ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হবে ওকে, কারণ সামরিক এয়ারক্রাফট লাগবে ওর। কো-পাইলট, লেফটেন্যান্ট নাসাউ ওর পিছনে থাকবে হেলিকপ্টার নিয়ে।

ঠিক হলো, ওদের সাথে উইন্টারও মেডিলিনে যাবে। রানা আর নিজেকে ছাড়া কাউকে বিশ্বাস করতে রাজি নয় কালভিন। উইন্টারকে মেরে ফেলা হতে পারে, এই ভয়টা ছাড়ছে না তাকে। তাছাড়া, অন্য কারণও আছে। উইন্টারের দৈহিক ও মানসিক সুস্থতা বজায় রাখার জন্যে প্রতিদিন নিয়মিত খানিকটা করে কোকেন সরবরাহ করছে ওরা। ড্রাগে অভ্যস্ত সে, হঠাৎ করে সাপ্লাই বন্ধ হয়ে গেলে মারাত্মক প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে। তবে যতোটা তার দরকার তারচেয়ে অনেক কমই দিচ্ছে ওরা। রানা এখন এটাকে পুঁজি করে সুযোগ নিতে চাইছে।

'সাপ্লাই বন্ধ করে দিলে মারা পড়বে লোকটা,' আপত্তি জানালো কালভিন। 'এমন অসুস্থ হয়ে পড়বে যে কোনো কাজেই লাগবে না।'

'আমরা কেন সাপ্লাই বন্ধ করবো,' বললো রানা। 'তাকে বুঝিয়ে দেয়া হবে, তার সাপ্লাই সে নিজেই বন্ধ করছে। কার্টেল সম্পর্কে এমন কিছু নেই যা সে জানে না, টমাস। বাধ্য করা না হলে একবারও মুখ খোলেনি ব্যাটা। চপার থেকে যখন ফেলে দিলাম, তখন যদি তুমি ওর চেহারা দেখতে! চিৎকার করছিল, কিন্তু একটুও ভয় পায়নি।'

'তুমি তাকে চপার থেকে ফেলে দিতে যাচ্ছিলে?'

মৃদু হেসে রানা বললো, 'বেরিয়ে যাবার সময় দরজার ফ্রেম ধরে

ফেলে সে।'

'যীশু, যীশু। তাকে আমাদের দরকার, রানা। উইন্টারের কিছু হলে কর্নেল বেকায়দায় পড়বেন।'

'কর্নেল বেনিনের বৃহস্পতি এখন তুঙ্গে,' বললো রানা। 'কাল রাতে টেলিভিশনে সেই টেপটা দেখলাম। এককথায়, অপূর্ব। সাড়ে তিন মিনিটে অবিশ্বাস্য বিজয় ছিনিয়ে এনেছেন তিনি।'

'দেখে যা মনে হচ্ছে, তাঁর অবস্থা অতোটা ভালো নয়,' বললো কালভিন। 'প্রচার মাধ্যমে হয়তো ভালোই করছেন, কিন্তু তাঁর জন্যে দুশ্চিন্তায় আছি আমি। নিজেকে নিয়ে তাঁর চিন্তা-ভাবনা বদলে গেছে। ব্যক্তিগত নিরাপত্তার দিকটা আগের মতো খেয়াল করছেন না।'

'ভদ্রলোক বোকা নাকি! তিনি জানেন না ভিক্টর পাল্টা আঘাত হানছে?'

'তিনি একা নন, অনেক লোকই বোকার মতো আচরণ করছে,' বললো কালভিন। 'কোনো তদন্তে আকস্মিক অগ্রগতি হলে এরকম ঘটে। সবাই ভাবছে, যুদ্ধে আমরা জিতে গেছি। অথচ যুদ্ধ এখনো শুরুই হয়নি।'

'উইন্টারকে কোকেন দেয়া বন্ধ করে দাও, টমাস। কার্টেলের বিরুদ্ধে কিছু যদি করতে চাও, এছাড়া পথ নেই।'

'তুমি ভাবছো কুকুরটাকে হাড্ডি যোগান দিতে ভালো লাগছে আমার?'

'কোকেনের জন্যে তোমার পায়ে গড়াগড়ি থাক সে।'

মাথা নাড়লো কালভিন। তার মাথা নাড়ার অর্থই হলো অনিচ্ছার সাথে রাজি হওয়া। 'ঠিক আছে। তবে কাজটা আমি করছি শুধু এই

জন্যে যে একটা কিছু দিয়ে বুঝ দিতে না পারলে ওয়াশিংটন আমাকে ডেকে পাঠাবে।'

'সত্যি নাকি?'

'আমি বার্ন-এর জঙ্গলে শিকার করছি,' বললো কালভিন। এড-ওয়ার্ড বার্ন হলেন ড্রাগ এনফোর্সমেণ্ট এজেন্সির স্থানীয় ডিরেক্টর। 'যতোক্ষণ তাজা মাংস আনতে পারবো ততোক্ষণ সব ঠিক থাকবে। সাপ্লাই বন্ধ, আমারও হাত-পা নাড়া শেষ।'

'বার্নকে আমি পছন্দ করি না,' বললো রানা।

'রানা, তাঁর সাথে মাত্র একবার দেখা হয়েছে তোমার। মানুষ হিসেবে তিনি ভালো।'

'তোমার এই বার্নই তো জ্যাক মরিসকে দায়িত্ব দিয়ে ফিল্ডে পাঠিয়েছিল,' বললো রানা। 'বয়স কম, ভালো করে পরীক্ষাও করা হয়নি। এরজন্যে কাকে তুমি দায়ী করবে? আমেরিকায় হলে ছোকরা হয়তো দলবদল করতো না, কিন্তু বিদেশে, বিশেষ করে কলম্বিয়ার মতো নরকে সে যে বিপথে যেতে পারে এটা বার্নের বোঝা উচিত ছিলো।'

কাঁধ ঝাঁকালো কালভিন। 'কেউ আমরা নির্ভুল নই।'

কথাটা ঠিক, এমনকি লালচুলো পাইলটদের জন্যেও। কোকেন দেয়া বন্ধ করা হয়েছে, এই খবরটা ভালোভাবে নিলো না উইণ্টার। ঘণ্টা-খানেক গুম হয়ে থাকলো সে, তারপর সবাইকে একঘেয়েমিতে ভরে তুললো অর্থহীন হুমকি দিয়ে। ডে-রুম কাউচে বসে ঘুমোবার চেষ্টা করলো রানা, তন্দ্রার মধ্যেও শুনতে পেলো উইণ্টার প্রলাপ বকছে। প্লেনে চড়ার আগে তিন ঘণ্টার মতো সময় পাওয়া গেল চোখ বোজার।

বোগোটায় বৃষ্টিকে ফেলে এলো প্লেন, উঠে এলো মেঘের ওপরে। প্লেন সিধে হবার পর নেভিগেটরের সীটে বসে রেডিও অন করলো

রানা। সব ক'টা স্টেশন থেকে প্রচার করা হলো ফুটবল টিমের মাঝখানে লজেনের উপস্থিত হবার নাটকীয় ঘটনাটা। বেসরকারী ব্যবসায়ে সরকারী নাক গলানোর ব্যাপারে তার অভিযোগ টেপ থেকে বাজিয়ে শোনানো হলো। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকেও কলম্বিয়ার অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে নাক গলানোর জন্যে অভিযুক্ত করেছে সে। দাবি জানিয়েছে, এক্সট্রাডিশন চুক্তি এই মুহূর্তে বাতিল করতে হবে। হুমকি দিয়ে বলেছে, তা না হলে ফল ভালো হবে না। হুমকি দিলেও, কি করতে পারে সে বা করার কথা ভাবছে, সে-সম্পর্কে কোনো আভাস দেয়নি।

পাহাড়শ্রেণীর শেষ মাথায় পৌঁছে নিচের দিকে নামতে শুরু করলো প্লেন, ককপিট থেকে আরোহীদের মধ্যে ফিরে এলো রানা। বেল্ট বাঁধা শেষ করেছে মাত্র, সাথে সাথে প্রায় ডিগবাজি খেতে শুরু করলো প্লেন। প্রচণ্ড ঝড় আর বৃষ্টির মধ্যে পড়েছে ওরা। এখন যদি একটা বজ্র ছুটে এসে আঘাত করে প্লেনে, জীবনপ্রদীপ নিভে যাবে, ভাবলো রানা। সাধারণ আরোহীদের অবশ্য বলা হয়, আধুনিক ইকুইপমেন্ট থাকায় বজ্রপাতে প্লেনের কোনো ক্ষতি হবে না। তবে এই পেশায় যারা জড়িত তারা অন্যরকম জানে।

অন্যরকম জানে, স্বভাবতই, গর্ডন উইন্টারও। তবে এই ঝুঁকি নিয়েই সে তার পুরো পরিণত বয়সটা কাটিয়েছে। কিন্তু আজকের পরিস্থিতি ভিন্ন। আজ অন্য লোকের হাতে প্লেনের কন্ট্রোল, সে একজন আরোহী মাত্র। তার নিত্য প্রয়োজনীয় কোকেনও অন্য লোকের হাতে। এ-সব ব্যাপারগুলো তাকে অস্থির করে রেখেছে। নাক টানছে ঘন ঘন, হাঁসফাঁস করছে। মেডিলিনের দিকে যখন নামতে শুরু করলো প্লেন, উইন্টারের অবস্থা দাঁড়ালো হিস্টিরিয়াগ্রস্ত রোগীর মতো। এক পুরিয়া কোকেনের জন্যে কাঙালের মতো অনুনয় করলো

সে। চাইলো, কিন্তু পেলো না। প্রতিবার প্রত্যাখ্যান করা হলো তাকে।

যতো নিচে নামলো ওরা, ঝড় আর বৃষ্টি ততোই বাড়তে থাকলো। এরকম আবহাওয়া সবাইকেই অস্থির করে তোলে। রানাও অস্বস্তি-বোধ করছে। দু'বার দমকা বাতাসের মধ্যে পড়ে প্লেনটা এমন ঝাঁকি খেলো, ভয় হলো বুঝি সরাসরি পাহাড়ে গিয়ে আছাড় খাবে ওরা। ফিউজিলাজের চারদিকে বিদ্যুতের লোভী জিভ লকলক করতে লাগলো, রানার চোখে রেখে গেল সাদা-নীল আঁকাবাঁকা ছাপ।

বিদ্যুৎঝড় আর বৃষ্টির মধ্যে প্লেনটা যখন খাবি খাচ্ছে, নির্দেশ এলো মিলিটারী ল্যাণ্ডিং ফিল্ডের আশা ছেড়ে দিয়ে মেডিলিনের বাইরে কমার্শিয়াল এয়ারপোর্টের দিকে চলে যাও। ঝড়টা ওদিকে কিছুটা কম। অন্তত এরচেয়ে বেশি হবার আশংকা নেই। তাছাড়া অধিকতর দীর্ঘ রানওয়েতে ভুল-ভাল কম হবে।

দিক পরিবর্তনটাও নার্ভাস করে তুললো রানাকে। ডে-রুমে ঘুমোবার সময় একটা স্বপ্ন দেখেছে ও, স্বপ্নের পটভূমিটা ছিলো খোলামেলা একটা জায়গা, যেখানে নিজেকে অসহায় বলে মনে হয়েছে রানার। এয়ারপোর্টে প্লেনটা নিরাপদেই ল্যাণ্ড করলো, কিন্তু স্বপ্নের ভেতর থাকার সময়কার সেই নিরাপত্তার অভাব বোধটা আবার ফিরে এলো ওর মনে।

টার্মিনাল ভবনে ঢুকলো ওরা, অ্যারোভিয়াস-এর স্টলটা দেখতে পেলো রানা, সেই সাথে অনুভূতিটা আরো জোরালো হয়ে উঠলো। স্টলের টিকেট কাউন্টার বন্ধ, তবে সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে দু'জন খুনে। স্টলের সামনে প্রতীক চিহ্ন হিসেবে এমবস করা রয়েছে গামা।

দুটো পিস্তলের কথা ভেবে নয়, রানা উদ্বিগ্ন হলো ভিক্টর লজেনের

কলম্বিয়া জুড়ে মাকড়সার জালের মতো বিছিয়ে থাকা নেটওঅর্ক-এর কথা ভেবে। শুধু এই একটা এয়ারপোর্ট নয়, লজেনকে দেশের সব ক'টা এয়ারপোর্টে ইন্টেলিজেন্স অপারেটর পাঠাতে হয়েছে। তার অতোগুলো আস্তানায় হানা দিয়েও সত্যিকার কোনো ক্ষতি করা সম্ভব হয়নি। হয়তো অনেক লোককে হারিয়েছে সে, আরো অনেক লোকের সাথে এই মুহূর্তে যোগাযোগ করতে পারছে না, কিন্তু টাকা ঢেলে হলেও নিজের কাজ সারার ব্যবস্থা করতে পারছে। সে যদি খুব বেশি টাকা ঢেলে থাকে, সেই সাথে মাসুদ রানা নামের বেয়াদব লোকটার চেহারার বর্ণনা দিয়ে থাকে, অল্প কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে ওদের দলটা।

আগেও এ-ধরনের ঘটনা ঘটেছে। কলম্বিয়ায় পা ফেলার সাথে সাথে চিহ্নিত করা হয় রানাকে। কিংবা হয়তো তারও কয়েক সেকেণ্ড আগে। এই একই টার্মিনাল ভবনে।

তারপর ইলেকট্রনিক দরজা পেরিয়ে ট্যাক্সি নেয় ও, পিটার পিনেল নামে এক ড্রাইভার ওকে শহরে নিয়ে যায়। কি কারণে যেন রানা ভাবতেও পারলো না সেই একই ঘটনা আজও ঘটবে না। দরজা দিয়ে বেরিয়ে আসতেই দূর থেকে ক্লার্ক গ্যাবল-এর গোঁফ আর গ্যারি কুপার-এর কান দেখে মনটা খুশি হয়ে উঠলো ওর। বাজি রেখে বলতে পারে ও, পিটার পিনেলের কিছুই বদলায়নি, শুধু টি-শার্টটা ছাড়া, তাতে বড় বড় অক্ষরে ছাপা রয়েছে, 'শিট হ্যাপেন্স'।

পিটার পিনেল গাড়ি চালায় ভালো, তার '৬৪ মডেলের শেভ্রলে আর ভি-এইট এঞ্জিন অত্যন্ত মজবুত আর শক্তিশালী। ওরা যে এসকর্ট পাবে হ্যারেরা ফিল্ডে, আধ ঘণ্টা দূরের পথ সেটা।

'সেই একই হোটেল, সিনর?' জানতে চাইলো পিনেল। পুরনো

আরোহীকে পেয়ে ভারি খুশি সে।

'শহরে নিয়ে চলো, পিনেল, বকশিশসহ পঞ্চাশ ডলার পাবে। কালি ফরটি-থ্রি, একটা ওয়্যারহাউসে যাচ্ছি আমরা। পুরনো থিয়েটারের কাছে। ঝুঁকি আছে, পিনেল।'

'গতবারের চেয়ে বেশি, সিনর?'

'বিশ মিনিটের আগে পৌঁছুতে পারলে সত্তর ডলার পাবে।' রানা জানে, পিনেলকে যেভাবে গাড়ি চালাতে বলছে ও, সেটা ভিক্টর লজেনের সম্ভাব্য আক্রমণের চেয়ে কম বিপজ্জনক হবে না। তবে এছাড়া উপায়ও নেই। হয় ভাড়াটে খুনিদের তাড়া খেয়ে টার্মিনাল ভবনের ভেতর চক্কর খাও, নয়তো পালাও, দুটোর একটাকে বেছে নিতে হবে। দ্বিতীয়টা পছন্দ করলো ও।

পিনেল ওকে নিরাশ করলো না। যীশুকে স্পর্শ করলো সৌভাগ্যের আশায়, প্রেরণা পাবার জন্যে স্যালুট করলো চে গুয়েভারাকে। বিরতি না দিয়ে হর্ন বাজালো সে, একরাশ ধোঁয়া উড়িয়ে টার্মিনাল চত্বরে গাড়ি ঘোরালো, অসংখ্য খুদে বর্শার মতো পানি ছড়ালো চাকাগুলো। পুরনো একটা ফোক্সওয়াগেনের পিছনটা তুবড়ে দিলো শেভ্রলে, ধাক্কা দেয়ার হুমকি সৃষ্টি করে পার্কিং লটে পিছু হটতে বাধ্য করলো আরেকটা গাড়িকে, ঘণ্টায় পঁচাশি মাইল গতিতে উঠে এলো হাইওয়েতে।

'মেরে ফেলবে, নির্ঘাৎ মেরে ফেলবে!' শিউরে উঠে চোখ মিট মিট করলো উইন্টার।

'সিনর, আপনি উপভোগ করছেন না?' বিস্মিত হয়ে জানতে চাইলো পিনেল।

'স্পীড একশোয় তোলো,' উইন্টারের কথা ভেবে নির্দেশ দিলো রানা।

'আমার বিরুদ্ধে এটা একটা ষড়যন্ত্র!' রুদ্ধশ্বাসে বললো উইন্টার। 'শান্ত হও,' বললো কালভিন। 'তুমি দুঃস্বপ্ন দেখছো।'

দু'হাতে মাথার চুল খামচে ধরে দুই হাঁটুর মাঝখানে মাথাটা লুকিয়ে ফেললো উইন্টার। ঠিক সেই মুহূর্তে পানিভর্তি একটা গর্তে পড়লো গাড়ি, শূন্যে উঠে পড়লো ওরা।

'লোকটা কার্টেলের টাকা খেয়ে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছিল, বললো উইন্টার। 'সবাই আমরা মারা যাচ্ছি। কলম্বিয়ার সব ক'টা বন্দুকের নল আমাদের দিকে তাক করা হয়েছে, ফ্রিওয়েতে উঠলেই গুলি খেয়ে মারা যাবো।'

কিন্তু ফ্রিওয়েতে ব্যাপারটা ঘটলো না। ফ্রিওয়ে ছাড়িয়ে আসার পর, দু'মিনিটের মধ্যে, দূরে শহরের আলো দেখা গেল।

'ভিক্টর সম্পর্কে এবার কিছু বলো, উইন্টার,' হঠাৎ তাগাদা দিলো রানা।

'তার সম্পর্কে জানার কথা আপনার একটাই,' রাগের সাথে জবাব দিলো উইন্টার। 'ভিক্টর লজেন আপনাকে খুন করতে যাচ্ছে। তার হাতে আমরা সবাই মারা পড়বো। এভাবে প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়ানো মানে আরো তাড়াতাড়ি মৃত্যু ডেকে আনা। দয়া করে আমার কথা শুনুন।'

'তুমি লজেন হলে এই পরিস্থিতিতে কোথায় যেতে?'

'পানামায়,' বললো উইন্টার, জানালা দিয়ে থুথু ফেললো সে। 'সাংকেতিক ভাষায় রেডিও মেসেজ পাঠাতাম। অমুক শালাকে মারো, তমুক শালাকে মারো। ভিডিও গেমের মতো নিরাপদ।'

'কিন্তু লজেন তা যায়নি। এখনো সে কলম্বিয়ায় রয়েছে। তার নিজস্ব সবগুলো জায়গায় খোঁজ নিয়েছি আমরা। যে-সব জায়গায়

ছিলো বলে খবর পাওয়া গেছে, সেগুলোও চেক করা হয়েছে। আমরা জানি, একটা চপার আছে তার। নিশ্চয়ই পাইলটও আছে। তার-মানে, অন্তত কয়েকজন লোক আছে তার সাথে।'

'কমকরেও বারোজন,' বললো উইন্টার, যেন এতোক্ষণে কাজ করছে তার হিসেবী মাথা। 'তার সাথে সব সময় তিনজন গার্ড থাকে, পালা করে ডিউটি দেয় তারা, তারমানে মোট ছ'জন। ছ'জনের মধ্যে কেউ যদি কোনো নিরামিষ রান্নায় দক্ষ না হয়, তাহলে আরেকজনকে ধরুন। ইবানো-কে বাদ দেবেন না। হেড-নকার অর্থাৎ খুনীদের লিডার ইবানোকে বাদ দিয়ে এক পা-ও কোথাও যায় না লজেন। সাধারণত একজন রেডিওম্যানও সাথে থাকে। তারপর ধরুন, পাইলট। আরো লোক থাকতে পারে, পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করে।'

'তার একটা বড়সড় ঘাঁটি দরকার।'

'জানি কি ভাবছেন,' আকস্মিক উৎসাহের সাথে বললো উইন্টার। 'আপনার মনের কথা আমি ধরতে পেরেছি! এই গাড়ি থেকে বের করুন আমাকে। আমার হাতে একটা প্লেন ছেড়ে দিন। যেখানে আপনি যেতে চান, পৌঁছে দেবো আমি।'

'কি নিয়ে আলাপ করছো তোমরা?' জানতে চাইলো কালভিন।

'একটা আইডিয়া নিয়ে, টমাস।'

'তোমার ভেতর একটা সতর্কতা দেখছি, রানা,' মৃদু অভিযোগের সুরে বললো কালভিন। 'জঙ্গলে বহুবছর ধরে আছো তুমি অথচ তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে তুমি একটা নবিশ।'

হাসলো রানা। কালভিনকে সব কথা বলতে যাচ্ছিলো ও। বিপদকে পিছনে ফেলে নিরাপদ আশ্রয়ে প্রায় পৌঁছে গেছে ওরা। ডি. এ. এস.-এর সেফ হাউসটা আর সিকি মাইল দূরে। সামনে একটা চৌরাস্তা।

বাঁকটার ওপর নজর রাখছে রানা, হঠাৎ শেভ্রলের পিছনটা আলোকিত হয়ে উঠলো। ঝট্ করে ঘাড় ফেরালো ও। একজোড়া হেডলাইট, দ্রুতগতিতে কাছে চলে আসছে।

এই সময় ব্রেক কষলো পিনেল।

'পিনেল!'

'সিনর!' পিনেলও চিৎকার করলো, তবে তার আতংকের কারণ পিছনের হেডলাইট নয়। শেভ্রলের দু'দিক থেকে ধেয়ে আসছে দুটো ইয়ামাহা মোটরসাইকেল। চেহারা আর আকৃতি দেখে মনে হলো, ঘণ্টায় একশো সত্তর মাইল বেগে ছুটতে পারে ওগুলো।

টপস্পীডে ছুটে আসছে মোটরসাইকেল আরোহীরা। রানার নির্দেশ পেয়ে আবার গাড়ি ছাড়লো পিনেল। শেভ্রলে এক মুহূর্তের জন্যে দাঁড়িয়ে পড়ায় শত্রুরা দিক বদলেছিলো, আবার সেটা চলতে শুরু করায় দ্বিতীয় বার দিক বদলের সুযোগ পেলো না, কারণ ইতিমধ্যে একেবারে কাছে চলে এসেছে তারা। বাম দিকের মোটরসাইকেল ঘষা খেলো শেভ্রলের নাকের সাথে, কেউ যেন হ্যাঁচকা টান দিয়ে শূন্যে তুলে নিলো সেটাকে। ডান দিকেরটা ওদের পিছন দিয়ে বেরিয়ে গেল।

খানিক দূর গিয়ে থামলো সেটা, বাঁক ঘুরলো, আবার ফিরে আসছে। এই সময় প্রথম মোটরসাইকেল থেকে শুরু হলো গুলিবর্ষণ। কি অস্ত্র ব্যবহার করছে শত্রুরা বোঝা গেল না, তবে বুলেটগুলো এলো প্রচণ্ড শক্তি নিয়ে ঘন ঘন। শেভ্রলের পিছনের কাঁচ বিস্ফোরিত হলো। ডান দিকের জানালা চুরমার হয়ে গেল। চেষ্টা করলে আরো কিছু দেখার হয়তো সুযোগ পেতো রানা, কিন্তু গাড়ির মেঝেতে হঠাৎ করে ভিড় বেড়ে গেছে।

'ব্রেক করো, পিনেল!' নির্দেশ দিলো রানা। 'গাড়ি ঘুরিয়ে ধাক্কা দাও ওটাকে!'

সাথে সাথে সাড়া দিলো পিনেল। পেভমেন্টে বাড়ি খেলো শেভ্রলের পিছনটা, স্যাঁৎ করে বাঁক ঘুরলো। ঘোরাটা সম্পূর্ণ হবার আগেই প্রথম মোটরসাইকেলের সাথে ধাক্কা খেলো গাড়ি। কর্কশ শব্দ হলো, রী রী করে উঠলো রানার গা। পিছনের ভাঙা জানালা দিয়ে দোমড়ানো মোচড়ানো চাকা দেখতে পেলো ও।

প্রায় দাঁড়িয়ে পড়েছে রানা, গুলি করছে, সেই সাথে চিৎকার, 'গো! গো! গো!' কারণ দ্বিতীয় বাইকটা ওদের পিছনে চলে এসেছে, সেটার পিছনে সেই গাড়িটা—গতি কমাবার কোনো লক্ষণ নেই। বাইক আর গাড়ি, দুটো থেকেই গুলি আসছে।

ঝাঁকি খেয়ে সামনের দিকে ছুটলো শেভ্রলে। গাড়ির ট্রাঙ্ক আর বাম দিকটায় গুলি লেগেছে। ছুটছে ওটা, ওদেরকে ধাওয়া করে আসছে শত্রুরা। পরপর পাঁচটা গুলি করলো রানা। বুঝলো, লক্ষ্য ব্যর্থ হয়নি। অনুসরণরত গাড়িটা, ওটা একটা মার্সিডিজ, ফুটপাতে উঠে গেল, কাঁচ ভেঙে ঢুকে পড়লো একটা শো-রুমের ভেতর। উইণ্ডশীল্ড বলে কিছু নেই ওটার।

প্রায় সেই একই মুহূর্তে অনুভব করলো রানা, পরিস্থিতি বদলে যাচ্ছে। সামনে কোনো রাস্তা নেই, শেভ্রলে কোন্‌দিকে যাচ্ছে বোঝা যাচ্ছে না। দ্বিতীয় মোটরসাইকেলটা পাশে চলে এসেছে, গুলি করছে বিরতিহীন। ধাতব আবরণে আঘাত করছে বুলেট, ভেতরে ঢুকে কেড়ে নিচ্ছে তাজা প্রাণ।

কিসের সাথে যেন ধাক্কা খেলো শেভ্রলে। দ্বিতীয় ধাক্কাটা আরো বড় কিছুর সাথে লাগলো। রানার পায়ের ওপর নেতিয়ে পড়লো

কে যেন। তাকে ঠেলে সরিয়ে দিলো রানা, আর ঠিক সেই মুহূর্তে ঝাঁকি খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো গাড়ি। লাফ দিয়ে ফুটপাতে পড়লো রানা। পড়েই এক গড়ান দিয়ে সিধে হলো ফায়ারিং পজিশনে। চারটে গুলি করলো কোনো বিরতি ছাড়াই।

শেষ গুলিটা বাইক থেকে ফেলে দিলো ড্রাইভারকে, বাইকটা পিছলে যাবার ভঙ্গিতে ছুটে গেল আরেকদিকে। সেটাকে লক্ষ্য করে আরো দুটো গুলি করলো রানা। বাইক থেকে ছিটকে পড়লো দুটো শরীর, তারপরও মেশিনটা ছুটছে। রাস্তার উল্টোদিকের একটা পাঁচিলে ধাক্কা খেলো সেটা, থামলো, সেই সাথে থেমে গেল চৌরাস্তার সমস্ত নড়াচড়া।

এতোক্ষণে মানুষের আওয়াজ শোনার সময় পেয়েছে রানা। ককে-রসরা সবাই স্থির ও চুপচাপ। একবার মনে হলো, রাস্তার উল্টোদিকে, দূর প্রান্তের ছায়ার ভেতর, কে যেন খোঁড়াতে খোঁড়াতে মার্সিডিজটা থেকে দূরে সরে গেল। সঠিক বলতে পারবে না।

ধীরে ধীরে দাঁড়ালো ও। কোনো গুলি হলো না দেখে সাহস করে শেভ্রলের দিকে এগোলো। গাড়ির ভেতর চিৎকার করছে একজনই, উইন্টার। আক্রমণের পর থেকে সেই যে শুরু করেছে, তারপর আর মুহূর্তের জন্যেও থামেনি সে। যদিও কোথাও জখম হয়েছে বলে মনে হলো না। স্টিয়ারিঙ হুইলটাকে বুকের সাথে জড়িয়ে রেখেছে পিনেল, যেন ঘুমোচ্ছে সে। নড়ছে না একচুল, কারণ বাঁচার কোনো আশা নেই তার। সবচেয়ে বেশি গুলি খেয়েছে কালভিন। মাথায়, গলায়, আর বুকে। বুকে লেগেছে দুটো গুলি।

পাঁচ

অপারেশন থিয়েটারে তিন ঘণ্টা ধরে কাটাছেঁড়া করা হলো টমাস কালভিনকে। তার মৃত্যুর খবর পেয়ে রানা উপলব্ধি করলো, ভিক্টর লজেনকে জীবিত ধরতে হবে ওর, ঠিক কালভিন যেমন চেয়েছিল। কালভিনের আশা ছিলো, লজেনকে ধরে যুক্তরাষ্ট্রে নিয়ে যাবে সে, সেখানেই তার বিচার করা হবে। রানা এখন অন্য কিছু চাইতে পারে না। ওর ব্যক্তিগত শিকার, রলফ মুয়েলার ওরফে হেনেরিক মুলারের ব্যাপারটা একটু পরে দেখলেও চলবে।

বাকি হতাহতদের ব্যাপারটা মেনে নেয়া সহজ। বিপদ আছে জেনেই রানার পথ অনুসরণ করেছিল পিটার পিনেল, তার ধারণা ছিলো একটা ভালো কাজ করছে সে। সুস্থ হয়ে ওঠার পর নিজেকে লোকটা তিরস্কার করবে না বলেই রানার ধারণা। তার ডান চোখের পাশটা জখম হয়েছে, ফলে শেষ পর্যন্ত হয়তো একটা চোখ হারাতে হবে। পাঁজরের একজোড়া হাড় ভেঙেছে, সেটা তেমন কিছু না। হাতে তৈরি হয়েছে একটা ফুটো, সেটাও মেরামতযোগ্য। পেটের অগভীর গর্ত থেকে বের হয়েছে একটা বুলেট।

চোখ বাদ দিয়ে, স্থায়ী কোনো ক্ষতি ছাড়াই সেরে উঠবে সে। জ্ঞান ফেরার পর খুশি হয়ে উঠলো ড্রাইভার, জানতে পারলো, যতোদিন না আবার গাড়ি নিয়ে রাস্তায় নামতে পারছে ততোদিন দৈনিক পঁচাত্তর ডলার করে পেতে থাকবে। রানা তাকে আরো বললো, রঙটা পছন্দ করতে পারলেই আরেকটা নতুন গাড়ি কিনে দেয়া হবে তাকে।

একই করিডরের শেষ মাথার একটা কামরায় রাখা হয়েছে উইন্টারকে, কড়া পাহারায়। তার গায়ে আঁচড়টিও লাগেনি, ব্যাপারটা তা নয়। হাতের সবচেয়ে মাংসল জায়গায় একটা বুলেট খেয়েছে সে। একজন পাইলটের জন্যে সমস্যা হলেও, এমন নয় যে সেটা কাটিয়ে উঠতে পারবে না। তার সবচেয়ে বড় অভিযোগ হলো, তাকে পেইনকিলার দেয়া হচ্ছে না। চিৎকার করে জানালো সে, 'আমার সাথে অমানবিক ব্যবহার করা হচ্ছে।'

হলে দাঁড়িয়ে ডাক্তারের সাথে কথা বলছে রানা, এই সময় এলো ওরা। ডাক্তার জানতে চাইছিলেন, টমাস কালভিনের আরো মূল্যবান কোনো অঙ্গ বিজ্ঞানের কল্যাণে দান করা যায় কিনা। জবাবে রানা বললো, হ্যাঁ, অবশ্যই—টমাস বেঁচে থাকলে প্রস্তাবটায় খুশি হতো। হঠাৎ বেল বাজার শব্দের সাথে খুলে গেল এলিভেটরের দরজা, ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো একদল লোক।

খুনি আর গুণ্ডাদের মতোই চেহারা তাদের। বন্ধুকে হারিয়ে চরম হতাশায় ভুগছে রানা, লোকগুলোকে খুনি ধরে নিয়ে তৎপর হতে যাচ্ছিলো, তারপর লক্ষ্য করলো লোকগুলোর মধ্যে কর্নেল হার্নান্দেজ বেনিনও রয়েছেন। আরো একজন চিনতে পারলো ও। এডওয়ার্ড বার্ন, ড্রাগ এনফোর্সমেণ্ট এজেন্সির স্থানীয় ডিরেক্টর। মোট তিনজন লোককে ঘিরে আছে বাকি সবাই, পরিষ্কার বোঝা যায় নিরাপত্তা

বেষ্টনী তৈরি করে রেখেছে তারা। শেষ ভদ্রলোককে চিনলো না রানা। ছোটোখাটো মানুষ, রোগা-পাতলা, সুন্দর পোশাক পরে আছেন।

কালভিনের প্রাপ্য, কিন্তু গ্রহণ করতে হলো রানাকে—ওর পিঠে চাপড় মারলেন কর্নেল বেনিন, শরীরটা ঝাঁকি খাওয়ায় হাতের ব্যথাটা বেড়ে গেল রানার। কিছু বুঝে ওঠার আগেই ওকে বুকের মধ্যে চেপে ধরে আলিঙ্গন করলেন কর্নেল। চোখে পানি নিয়ে প্রিয় বন্ধু টমাসের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করলেন তিনি। রানার সাথে তৃতীয় ব্যক্তির পরিচয় করিয়ে দিলেন। ভদ্রলোক ইবানো ভাপুর, জাস্টিস ডিপার্টমেন্টের অ্যাসিস্ট্যান্ট মিনিস্টার। কার্টেলের দ্বারা সংঘটিত সর্বশেষ হত্যা-কাণ্ডের বর্ণনা নিজের কানে শোনার জন্যে সশরীরে হাজির হয়েছেন।

একটা স্টাফ রুমে বসলো ওরা, অতিরিক্ত লোকদের বাদ দিয়ে। স্প্যানিশ ভাষায় সংক্ষেপে ঘটনার বর্ণনা দিলো রানা, অ্যাসিস্ট্যান্ট মিনিস্টার ভালো ইংরেজি জানেন না। সবিনয় ভদ্রতার সাথে নিঃশব্দে শুনে গেলেন তিনি, মাঝে-মধ্যে গম্ভীরভাবে মাথা ঝাঁকালেন। তাঁর মাথায় ঘন কালো চুল, বাঁ গালে বিউটি স্পট অর্থাৎ কালো একটা তিল। তাঁর স্যুটটা জ্যাক মরিসের চেয়ে দামী।

রানা থামতে বড় করে নিঃশ্বাস ফেললেন ইবানো ভাপুর, অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে যাওয়ায় দুঃখ প্রকাশ করলেন। বললেন, 'এই বর্বরোচিত হামলার পরিণতিতে আমরা একজন সাহসী বন্ধুকে হারালাম।'

এডওয়ার্ড বার্ন তিক্তকণ্ঠে বললেন, 'তোমাদের আসলে এয়ারপোর্টের ভেতরই থাকা উচিত ছিলো, মাসুদ। ওখানে থাকলে তোমাদেরকে প্রোটেকশন দেয়া সম্ভব হতো।'

'এয়ারপোর্টের ভেতরও অস্ত্র ছিলো,' বললো রানা। 'আর আমার নাম রানা। আপনি যদি কখনো অন্য নামে ডাকেন—ঝট করে সরে

যাবেন।'

'প্লিজ,' অ্যাসিস্ট্যান্ট মিনিস্টার অনুরোধ করলেন। 'নিজেদের মধ্যে আমরা ঝগড়া করতে চাই না। পরস্পরের সাথে সহযোগিতা না করলে লাভবান হবে শত্রুপক্ষ।'

'গুড,' বললো রানা।

এডওয়ার্ড বার্ন কিছু বললেন না। নামটা আমেরিকান হলেও, তিনি আসলে কিউবান, নোটারি পাবলিক-এর কাছে আবেদন করে নাম বদলেছেন, স্বভাবতই সি. আই. এ.-র পরামর্শে। সি. আই. এ.-তে গোপনে নাম লেখাবার আগে মায়ামি সৈকতে পেশী দেখিয়ে খ্যাতি বা কুখ্যাতি যাই বলা হোক, যথেষ্টই কামিয়েছিলেন। রানা তাকে বিশ্বাস করে না, অনেক কারণের একটা হলো আজ পর্যন্ত যতো কিউবানের সাথে পরিচয় হয়েছে ওর, তাদের মধ্যে একজনও বিশ্বস্ততার প্রমাণ দিতে পারেনি। কিউবানরা সব সময় দুটো উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করে। তার একটা হলো, স্বদেশের স্বাধীনতা অর্জন। সি. আই. এ. সব সময় তাদেরকে সেই প্রতিশ্রুতি দিয়ে আসছে, ওটা তারা ওদেরকে পাইয়ে দেবে।

'মিনিস্টার দুঃসময়ে এসেছেন বটে, কিন্তু সঙ্গে করে সুসংবাদ নিয়ে এসেছেন,' বললেন কর্নেল। 'যে ট্রাজেডিটা ঘটে গেছে, সমাজের বিভিন্ন স্তরের লোককে তা প্রচণ্ডভাবে নাড়া দিয়েছে। ফলে সরকারও সিদ্ধান্ত নিয়েছে, কার্টেলের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেয়া হবে। এটা যে শুধু কথার কথা নয়, সেটা প্রমাণ করার জন্যে সরকার ভিক্টর লজেনকে যুক্তরাষ্ট্রে পাঠাতে রাজি হয়েছে, সেখানেই তার বিচার করা হবে।'

'ভেরি গুড,' বললো রানা, ব্যাপারটা আসলেও তাই। 'এবার তাকে খুঁজে বের করুন।'

'করবো বৈকি,' বললেন এডওয়ার্ড বার্ন।

'অবশ্যই খুঁজে বের করবো,' রাজি হলেন কর্নেল।

'কিন্তু কখন?' জিজ্ঞেস করলো রানা। 'লোকজনকে কিনে ফেলার চেষ্টা করবে সে। চেষ্টা করবে খুন করার। তারপর দেখা যাবে সিদ্ধান্ত পাল্টে গেছে।'

আহত হলেন কর্নেল। এডওয়ার্ড বার্ন রেগে গেলেন। তবে মন্ত্রী ভদ্রলোক, যিনি অপমান হজম করতে অভ্যস্ত, কূটনীতির ভাষায় জবাব দিলেন, 'আমরা খুন হয়ে যেতে পারি, মিঃ রানা, কিন্তু একজন ক্রিমিনালের কাছে বিক্রি হয়ে যাবো না বা তার ভয়ে সিদ্ধান্ত পাল্টাবো না। ভিক্টর লজেনকে খুঁজে বের করার জন্যে সরকারের সব ক'টা ডিপার্টমেন্ট সম্ভাব্য সব কিছু করবে।'

রাজনীতি ভালো বোঝে না রানা, তবে জানে মার্কিন অনুরোধে সাড়া দিয়ে কলম্বিয়া সরকার কেন লজেনকে যুক্তরাষ্ট্রে পাঠাতে রাজি হয়েছে। হরতালের ডাক দিয়ে রাজনীতিতে একটা বিশেষ ভূমিকা নিতে চাইছে লজেন, সরকার যেটা পছন্দ করতে পারছে না। সরকারের জন্যে একটা হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে সে। টমাস কালভিনের মৃত্যু স্রেফ একটা অজুহাত এনে দিয়েছে। 'ধন্যবাদ, মিঃ ইবানো ভাপুর,' বললো রানা। 'তবে আমার পরামর্শ হলো, লজেনকে ধরার যে প্ল্যানই গ্রহণ করা হোক, সেটা যেন আপনি আর আপনার মিনিস্টার ছাড়া আর কেউ না জানতে পারে। তা না হলে লজেনকে ধরা সম্ভব হবে না।'

মাথা নত করে বাউ করলেন অ্যাসিস্ট্যান্ট মিনিস্টার। 'পরিপূর্ণ গোপনীয়তা রক্ষার ব্যাপারে আপনার সাথে আমি সম্পূর্ণ একমত, মিঃ রানা।'

'সেক্ষেত্রে,' বললো রানা, 'অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা ইন্টেলিজেন্স

রিপোর্ট আপনাকে আমি জানাতে চাই, মিঃ ভাপুর। আপনাকে, আর কর্নেল বেনিনকে।'

রানার বাম দিকে বাদামী স্যুটের ভেতর বসবাস করছে একজন চির শত্রু। এডওয়ার্ড বার্নের নাকের ফুটো, এতো চওড়া যে একেকটায় দুটো করে আঙুল ঢুকে যাবে, আরো চওড়া হলো। ওয়াশিংটনে হলে কি করতেন বলা যায় না, হয়তো রানাকে গ্রেফতারের নির্দেশ দিয়ে বসতেন। কিন্তু কলম্বিয়ান অফিসারদের সামনে রানাকে শুধু হুমকি দিলেন তিনি, 'আমি ব্যবস্থা করছি, তোমাকে যাতে রাত নামার আগেই কলম্বিয়া থেকে বহিষ্কার করা হয়।'

'বলুন, চেষ্টা করবেন। আরো নির্ভুল হতে চাইলে বলুন, ব্যর্থ চেষ্টা করবেন।'

আর কিছু বললেন না বার্ন। অ্যাসিস্ট্যান্ট মিনিস্টারের দিকে ফিরে বাউ করলেন তিনি, সামান্য কম ঝুঁকলেন কর্নেলের উদ্দেশ্যে, তারপর রানার দিকে কটমট করে একবার তাকিয়ে গট গট করে বেরিয়ে গেলেন কামরা থেকে।

এডওয়ার্ড বার্ন বেরিয়ে যাবার পর রানার দিকে সবিস্ময়ে তাকালেন ইবানো ভাপুর। 'ব্যাপারটা বুঝলাম না।'

'আমার ধারণা,' বললো রানা, 'মার্কিন দূতাবাসের ইকোনমিক সেক্রেটারিদের সাথে বড় বেশি মেলামেশা করেন সিনর বার্ন। আমার জানা তথ্য হলো, সেক্রেটারিদের সাথে লজেনের অদৃশ্য একটা বন্ধন আছে। তার কাছ থেকে টাকা খেয়েছে তারা, সম্ভবত মধ্য আমেরিকায় যুদ্ধ বাধানোর চাঁদা হিসেবে। এই কারণে লজেনের ভক্ত হতে হয়েছে তাদের।'

দ্রুত, সতর্কতার সাথে কর্নেলের দিকে ফিরলেন অ্যাসিস্ট্যান্ট মিনি-

স্টার, কর্নেলও দ্রুত ও সাবধানতার সাথে জবাব দিলেন, 'আমার ধারণা, মিঃ রানার অনুমান মিথ্যে নয়।'

'আমার যদি ভুল হয়ে থাকে, ক্ষমা চাই,' বললো রানা। 'তবে, ভুল বোঝাবুঝির জন্যে কোনোভাবেই আপনাকে সে দায়ী করতে পারবে না।'

কথাটা শুনে খুশি হলেন অ্যাসিস্ট্যান্ট মিনিস্টার। মৃদু হাসলেন তিনি। 'এবার আপনার প্রসঙ্গে একটা প্রশ্ন, মিঃ রানা। আপনি কি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্ব করছেন না?'

মাথা নাড়লো রানা। 'আপনি স্বরাষ্ট্র দফতরের লোক হলে জানতে পারতেন। আমি কলম্বিয়ায় এসেছি আপনার সরকারের অনুমতি নিয়ে, বাংলাদেশী একজন নাগরিক হিসেবে, যদিও আমার সরকারের অনুরোধে সাড়া দিয়ে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে যে আমার উদ্দেশ্য ও পরিচয় সম্পূর্ণ গোপন রাখা হবে। সবাই জানে, আমি একজন ক্যানাডিয়ান ট্যুরিস্ট, অনেকেই জানে আমি মার্কিন একটা ইন্টেলিজেন্স সংস্থার প্রতিনিধিত্ব করছি।'

'বুঝলাম,' ইবানো ভাপুর হাসলেন। 'কলম্বিয়ায় আপনার আসার উদ্দেশ্যটা···।'

'সংক্ষেপে, বাংলাদেশে কলম্বিয়ার যে কোকেন ঢুকছে, আমরা সেটা বন্ধ করতে চাই। আরো একটা উদ্দেশ্য আছে আমার, তবে সেটার কথা জানতে পারবেন উদ্দেশ্যটা পূরণ হলে। শুধু এটুকু বলি, আমার দ্বারা আপনার দেশের কোনো ক্ষতি হবে না।'

'শুনে আশ্বস্ত বোধ করছি, মিঃ রানা,' বলে কর্নেলের দিকে দ্রুত তাকালেন অ্যাসিস্ট্যান্ট মিনিস্টার, যেন জানতে চান তাঁর আশ্বস্ত বোধ করাটা উচিত হয়েছে কিনা।

কর্নেল বেনিন তাড়াতাড়ি বললেন, উনি খুব কাজের লোক, স্যার।

ওনার কৃতিত্ব সম্পর্কে এখন যদি বলতে শুরু করি, উনি লজ্জা পাবেন। আপনাকে পরে এক সময় জানাবো।'

প্রসঙ্গটা বদলাবার জন্যে রানা বললো, 'ভিক্টর লজেন কোথায় আছে তা বোধহয় আমি জানি।'

'ইয়েস?' আগ্রহের সাথে রানার দিকে ঝুঁকে পড়লেন ইবানো ভাপুর।

'আমাকে একটা হেলিকপ্টার আর কিছু সশস্ত্র লোক দেয়া হলে তাকে আমি ধরতে পারি। কাল এই সময় আমার সামনে তাকে দেখতে পাবেন আপনারা। আমার শুধু দরকার, তার অবস্থান সম্পর্কে নিশ্চিত হবার জন্যে নিরাপদ একটা সূত্র।'

চোখ মিটমিট করলেন অ্যাসিস্ট্যান্ট মিনিস্টার। কর্নেলের দিকে তাকালেন না। 'আমি কি ধরে নেবো, আপনি একজন সন্ধানদাতার সাহায্য চাইছেন?'

'আপনি ঠিক ধরেছেন, অ্যাসিস্ট্যান্ট মিনিস্টার,' বললো রানা।

'সেই সাথে আপনি আবেদন করছেন, তথ্য পাবার পর অপারেশন টায় আপনি যাতে অংশগ্রহণ করতে পারেন?'

ঠিক তাই চাইছে রানা। অপারেশনে থাকতে হবে ওকে, কারণ হেনেরিক মুলারের কাছে পৌঁছুনোর আর কোনো উপায় নেই। 'জ্বী,' বললো ও। 'সিকিউরিটি হতে হবে নিশ্ছিদ্র। কারো জানা চলবে না কোথায় আমরা যাচ্ছি। লজেনকে আটক করা সম্ভব হলে, পুলিশ বা আধা সামরিক বাহিনীর লোকজন তাকে গ্রেফতার করতে পারে, আপনারা যেমন বলেন।'

অস্বস্তিবোধ করছেন অ্যাসিস্ট্যান্ট মিনিস্টার। বিদেশী একজন স্পাই-কে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় যদি কলম্বিয়ায় কাজ করার অনুমতি দিয়ে থাকে,

তার বাধা দেয়ার কোনো অধিকার নেই। অনিচ্ছাসত্ত্বেও মাথা ঝাঁকালেন তিনি। 'কিন্তু আপনি যদি ভিক্টর লজেনকে ডেলিভারি দিতে ব্যর্থ হন?'

'সেক্ষেত্রে সময় ছাড়া আর কিছুই আপনারা হারাচ্ছেন না,' বললো রানা।

মাঝখান থেকে কর্নেল বেনিন বললেন, 'কিন্তু আমরা হয়তো আপনাকে হারাবো। আপনার ব্যর্থতা মানে আপনার মৃত্যু, এটুকু অন্তত পরিষ্কার, তাই না, মিঃ রানা? লজেনকে আপনি চেনেন।'

'বন্ধুর জন্যে মানুষ আত্মত্যাগ করে না?' পাল্টা প্রশ্ন করলো রানা। এ-ধরনের ভাবাবেগের মূল্য দেয় কলম্বিয়ানরা, কথাটা বলার সেটাও একটা কারণ।

হাসপাতাল থেকে সামান্য দূরে ডি. এ. এস. হেডকোয়ার্টার। ওখানে পৌঁছে মেরিল্যাণ্ড, ফোর্ট মীডি-তে ফোন করলো রানা। ন্যাশনাল সিকিউরিটি এজেন্সির সাথে কথা হয়ে আছে, বিপদের সময় তারা ওর কাজকর্মের দায়-দায়িত্ব স্বীকার করবে না, তবে অন্য সময় যোগাযোগ করা যাবে, এমনকি টেকনিক্যাল সাপোর্ট চাইলে তা-ও বিবেচনা করা হবে। তাছাড়া, ডি. ই. এ.-র এডওয়ার্ড বার্ন ফোনের ডায়াল ঘোরাবার আগেই কিছু একটা করা দরকার রানার।

মেরিল্যাণ্ড সাড়া দিলো, তবে সতর্কতার সাথে। এন. এস. এ. হেডকোয়ার্টার থেকে রানাকে জানানো হলো, আলোচ্য এলাকাটা কাভার করার জন্যে প্রচলিত ভোরটেক্স ফটোগ্রাফিক লিঙ্ক-কে পজিশনে আনা যাবে না। একমাত্র বিকল্প হলো, নতুন ও পরীক্ষাধীন রাডার-ইমেজ স্যাটেলাইট। ওটা থেকে যে ফটো আসছে তা সন্তোষ-

জনক নয়, তবে কমপিউটার গ্রাফিক্স, যা ফটোরই নামান্তর, রাতের অন্ধকারে বা খারাপ আবহাওয়ায়ও চমৎকার আসে।

মেসেজ পাঠিয়ে ফিরতি ডাকের জন্যে অপেক্ষা করছে রানা, এই সুযোগে অপারেশনের আয়োজন সম্পর্কে কর্নেলের সাথে কথা বলে নিলো। কর্নেল আর অ্যাসিস্ট্যাণ্ট মিনিস্টারকে হেলিকপ্টারে করে নিয়ে এসেছে লেফটেন্যাণ্ট নাসাউ, কাজেই পরিবহন কোনো সমস্যা হবে না। হেলিকপ্টার এই মুহূর্তে প্রস্তুত হয়েই আছে, তৈরি হয়ে আছে ডি. এ. এস.-এর একটা স্কোয়াডও। সবশেষে কর্নেল বললেন, 'অবশ্য আপনার টার্গেট যদি ঠিক থাকে।'

রানা ধরে নিলো আড়িপাতা যন্ত্রের সাহায্যে মেরিল্যাণ্ডের সাথে ওর কথাবার্তা সবই শুনেছেন কর্নেল, তবে কোড করা বার্তাটুকু বোঝেননি। 'টার্গেট সম্পর্কে নিশ্চিত হবার ব্যবস্থা করেছি, মিঃ বেনিন,' বললো ও। 'লোকেশন জানার জন্যে স্যাটেলাইটের সাহায্য চেয়েছি আমি।'

ধূর্ত হাসি দেখা গেল কর্নেলের ঠোঁটে। 'স্বর্গ থেকে একটা ক্যামেরা কি-ই বা আপনাকে জানাতে পারবে?'

মুচকি হাসি হেসে রানা বললো, 'কি দিয়ে তারা ব্রেকফাস্ট করছে।'

কথাটা কর্নেল বিশ্বাস করলেন না, কারণ নিতান্ত হালকা সুরে তা বলা হলো। তবে অনুকূল পরিবেশে, একটা আধুনিক স্যাটেলাইট প্রায় আক্ষরিক অর্থেই এ-ধরনের প্রত্যাশা পূরণ করতে পারে। এন. এস. এ.-র ক্ষমতা সম্পর্কে না জানার ফলে কলম্বিয়ার একজন কর্নেল যদি নার্ভাস হাসি দেন, ক্ষতি নেই। অবিশ্বাসীরাই মত পাল্টাবার পর সাচ্চা বিশ্বাসী হয়ে ওঠে।

সেটা ঘটতেও বেশি সময় লাগলো না। দু'ঘণ্টারও কম সময়ের মধ্যে নিজের ফোনে খবরটা পেলেন কর্নেল। আবিষ্কারের পদ্ধতিটা

যেন আকস্মিক বিদ্যুৎচমকের মতো। সব কিছু উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো।

রাডার ইমেজ থেকে মুয়েলার এস্টেট সম্পর্কে কৌতূহলোদ্দীপক কয়েকটা ব্যাপার জানা গেছে। জানা গেছে, বিল্ডিংগুলো, গোটা হাসিয়েনদাই, খালি পড়ে আছে। হাসিয়েনদা সহ চারপাশটা মনে হয়েছে, পরিত্যক্ত। তবে, পশ্চিম প্রান্তে কিছু নড়াচড়া ধরা পড়েছে।

ওখানে, মাটি থেকে বেশ খানিকটা ওপরে, ল্যাণ্ডিং স্ট্রিপ আর পাহাড়ী চাতালের মাঝখানে, কয়েকটা বিল্ডিং আছে। সম্ভবত লোক-জনও আছে। প্রধান ভবনের কাছাকাছি দেখা গেছে একটা হেলি-কপ্টার। ল্যাণ্ডিং স্ট্রিপটাও খালি নয়, হালকা একটা প্লেন রয়েছে। গ্রাফিক্সে দুটো মনুষ্যমূর্তিও দেখা গেল, বাড়ির বাইরে পাহারা দিচ্ছে। কিন্তু তকিমাকার আকৃতি দেখে অনুমান করা হলো, ভবনগুলোয় বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্যে জেনারেটরও আছে।

এইটুকুই জানার দরকার ছিলো রানার। ফোনটা যখন এলো, তার আগেই রেডিওরুমে কর্নেলকে ডেকে নিয়েছে রানা। ওর সাথে একটা ডিকোডার যন্ত্র রয়েছে। মেসেজটা দু'জনে একই সাথে বুঝলো।

'টেকনোলজিতে কি জাদু!' সবিস্ময়ে বললেন কর্নেল। 'এ ধরনের সুবিধে পাওয়ার জন্যে একটা হাত হারাতেও আপত্তি নেই আমার।'

'আপনি বললে ব্যাপারটা নিয়ে আমি এন. এস. এ.-র সাথে কথা বলতে পারি,' বললো রানা। 'আপনার অনুরোধ তারা সহানুভূতির সাথে বিবেচনা করবে বলেই আমার ধারণা, বিশেষ করে যদি কথা দেন সুবিধেটা পেলে তা কার্টেলের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হবে।'

'আপনি দেখছি সিরিয়াস,' গম্ভীরস্বরে বললেন কর্নেল। 'লক্ষ্য করেছি অবিশ্বাস্য কিছু বলার সময় আপনাকে ভারি সিরিয়াস দেখায়।'

'আমি ওদেরকে বললে কাজ হবে, ব্যাপারটা সেরকম কিছু নয়,'

বললো রানা। 'ওরা যদি সুবিধেটা আপনাকে দেয়, আপনার প্রতি সন্তুষ্ট বলেই দেবে। মাঝখান থেকে আমার শর্ত হলো, নেগোসিয়েশন-এর ফি বাবদ, বর্তমান অপারেশনের কম্যাণ্ডিং অফিসারের পদটা আমাকে ছেড়ে দিতে হবে।'

ব্যাপারটা পছন্দ হলো না কর্নেলের, তবে তিনি জানেন যে দুনিয়াটা এমন এক জায়গা যেখানে বিনা শর্তে কিছুই পাওয়া যায় না। সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে দু'আঙুলে ধরে গোঁফ মোচড়াতে শুরু করলেন তিনি। 'তারমানে কি, মিঃ রানা, আপনি বলতে চাইছেন, আপনার সাথে আমাকে বা অন্য কোনো সিনিয়র কলম্বিয়ান অফিসারকে রাখতে চান না?'

'ঠিক ধরেছেন।'

আরো গম্ভীর হলেন কর্নেল বেনিন। 'কারণটা কি জানতে পারি?'

'কারণটা হলো, আমাকে একটা প্রশ্নের উত্তর পেতে হবে। উত্তরটা শুধু লজেন জানে।'

'উত্তরটা নিশ্চয়ই খুব গুরুত্বপূর্ণ।'

'হ্যাঁ, আমার কাছে,' বললো রানা।

'আপনার কাছে, আর ন্যাশনাল সিকিউরিটি এজেন্সির কাছে।'

'তারাও আগ্রহী।'

অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর কর্নেল বললেন, 'উত্তরটা আর কারো জানা চলে না, বলতে চাইছেন।'

নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকালো রানা।

আবার কিছুক্ষণ চিন্তা করলেন কর্নেল। তারপর বললেন, ঠিক আছে, মিঃ রানা।'

'আমাকে এখুনি রওনা হতে হবে, কর্নেল,' বললো রানা।

'হ্যাঁ,' সায় দিলেন কর্নেল। 'এক্সট্রাডিশন অর্ডার সম্পর্কে যে-কোনো মুহূর্তে খবর পেয়ে যাবে লজেন। হয়তো এরইমধ্যে জেনে ফেলেছে সে।' কাঁধ ঝাঁকালেন তিনি। 'কলম্বিয়ার হালচাল তো আপনি জানেনই।'

ছয়

যুক্তরাষ্ট্র থেকে রওনা হবার আগে লিলিয়ানের কাছ থেকে মুয়েলার এস্টেটের বিশদ বর্ণনা পেয়েছিল রানা, তা না পেলে ওখানে ঢোকার কথা চিন্তাও করতো না ও। লিলির বর্ণনা থেকে একটা ব্যাপার পরিষ্কার হয়ে গেছে, হেনেরিক মুলারের এলাকায় একবারই মাত্র ঢোকার চেষ্টা করা যেতে পারে; কারণ দ্বিতীয়বার সে-চেষ্টা করলে মারাত্মক ঝুঁকি নেয়া হয়ে যাবে।

হাঁটাপথে এস্টেটে পৌঁছানো সহজ কাজ নয়। মেডিলিন আর কালি শহরের মাঝখানে ইংরেজি ভি অক্ষরের আকৃতি নিয়ে একটা পাহাড়ী উপত্যকা আছে, জায়গাটা ওখানে। হাইল্যাণ্ড থেকে গড়িয়ে নামছে একটা ঝর্নাধারা, পশ্চিম দিকে রওনা হয়ে কাউকা নদীর উত্তর-দক্ষিণ প্রবাহে মিলিত হবার সময় চওড়ায় বেড়ে গেছে। ওখানে একটা গ্রাম

আছে, নাম লস আগুয়াস দে পিউরিফিকেশন, বাস করে আদিবাসী ইণ্ডিয়ানরা।

এলাকার আদিবাসীদের চাষবাস করার সুযোগ করে দিয়েছেন রলফ মুয়েলার, রুগ্ন আত্মীয়স্বজনদের দিয়েছেন ওষুধ আর চিকিৎসা-সুবিধে, রক্ষা করতে সাহায্য করেছেন তাদের সংস্কৃতি আর ঐতিহ্য। তাঁর প্রশ্রয় পেয়ে ইণ্ডিয়ানরা কোকা পাতাও ব্যবহার করতে পারছে অবাধে। এরমানে হলো, কোকা পাতার একটা বাজার তৈরি করেছেন তিনি, নিজেকে ওদের কাছে প্রিয় করে তুলেছেন, সেই সাথে প্রাচীন কৃষি পদ্ধতি টিকিয়ে রেখেছেন। বিনিময়ে ওদের কাছ থেকে নাক আর কানের সহযোগিতা ছাড়া আর কিছু চান না তিনি।

কোনো আগন্তুক এলাকায় ঢুকলে, সাথে সাথে খবরটা প্রচার হয়ে যায়। এলাকার কর্তৃপক্ষ বিক্রি হয়ে গেছে, রলফ মুয়েলারকে তারা স্থিতিশীলতার প্রতীক হিসেবে গণ্য করে। ইণ্ডিয়ানরা তাঁর ভক্ত। লা ভায়োলেনশিয়া যখন তুঙ্গে, তখনো পাশের শহর আর মুয়েলার এস্টেটে সবাই শান্তিতে ঘুমাতে পারে। উদারনৈতিক রাজনৈতিক আন্দোলন অনুপস্থিত, বামপন্থী রাজনৈতিক কর্মীদের হাঙ্গামা বাধাবার নেই কোনো সুযোগ। জাতীয় নির্বাচনে ভোটাররা ভোট দেয় নির্বিঘ্নে, যাকে দিতে বলা হয় তাকেই।

এ-সব কথা ভেবেই সিকিউরিটির ব্যাপারে কঠিন হতে হয়েছে রানাকে। কলম্বিয়া সরকারের কোনো প্রতিনিধিই আপোসের ঊর্ধ্বে নয়। কর্পূরের মতো অদৃশ্য হতে শুধু সামান্য একটা বেফাঁস শব্দ দরকার লজেনের।

শেষ মুহূর্তে হেলিকপ্টারের টেইল রোটরে যান্ত্রিক গোলযোগ দেখা দেয়ায় রওনা হতে দেরি হলো ওদের। আকাশে উঠে উপত্যকা ধরে

দক্ষিণে যাচ্ছে ওরা, ঘড়িতে বাজে এগারোটা। যেখানে সম্ভব, ফসলের ডগা ছুঁয়ে উড়লো চপার, সম্পূর্ণ মৌনব্রত পালন করলো রেডিও। ওদের উপস্থিতি প্রকাশ করার জন্যে থাকলো শুধু জেট-টারবাইন এঞ্জিনের গর্জন।

শব্দটা মারাত্মক, তবে মুয়েলার এস্টেট থেকে দূরে থাকলে কোনো সমস্যা নেই। খুব কাছাকাছি যাবার প্ল্যানও রানা করেনি। এয়ার-স্ট্রিপের কাছে শুধু যে মর্টার এমপ্লেইসমেণ্ট আছে তাই নয়, উইণ্টারের কাছ থেকে জানা গেছে মাঝে-মধ্যে কমাণ্ড পোস্টে হাতে বহনযোগ্য রকেট লঞ্চারও মোতায়েন রাখে লজেন, নির্ভর করে তার উদ্বেগ আর ভয়ের মাত্রার ওপর। শোনা যায়, রহস্যময় কোনো উৎস থেকে সে নাকি যুক্তরাষ্ট্রের তৈরি স্টিংগার গ্রাউণ্ড-টু-এয়ার মিসাইলও হাত করেছে।

সে-কারণেই এই সাবধানতা, উপত্যকার কিনারা ধরে বিশাল একটা বৃত্ত তৈরি করলো রানার হেলিকপ্টার। আট হাজার ফুট ওপরে উঠলো চপার, পাহাড়ের প্রথম সারিটা টপকালো, উচ্চতা কমিয়ে নেমে এলো সাড়ে সাত হাজার ফুটে, পৌঁছুলো শুকনো একটা টেবিল-ল্যাণ্ডের ওপরে—এটার পিছনেই মুয়েলার এস্টেট।

উঁচু সমতল ভূমিতে কোনো লোকবসতি নেই, যদিও জায়গাটা এতো বেশি উঁচু নয় যে মানুষের বেঁচে থাকার জন্যে অনুপযোগী। আরো পশ্চিমে পাহাড়ের গায়ে কিছু মাটি থাকায়, রোদ আর বৃষ্টির সহায়তা পেয়ে সামান্য ঘাস আর অন্যান্য চারা গজিয়েছে। টেবিল-ল্যাণ্ডের এদিকটায় কিছু কুঁড়েঘর দেখা গেল, ক্রমশ ওপর দিকে উঠে গেছে, পরবর্তী পাহাড়ী ঢালের দিকে। তবে পুব দিকটা ঠিক যেন চাঁদের পিঠ—পাথুরে জমি আর বেঢপ বিকৃত ক্যাকটাস ছাড়া দেখার কিছুই

নেই।

কাঁটাঝোপ আর পাথরের মাঝখানে নামলো ওরা। পাহাড়ের পাশ দিয়ে চলে গেছে পায়ে-চলা পথ, ট্রেইল থেকে পঞ্চাশ গজ দূরে হেলিকপ্টার নামালো লেফটেন্যান্ট নাসাউ, চারদিকে ধুলোর পাহাড় উঠলো। লোকজন নিয়ে তাড়াতাড়ি নেমে পড়লো সে। লোকটা তার কাজ বোঝে। প্রায় চোখের নিমেষে ঢেকে ফেলা হলো চপারটাকে। ট্রেইল থেকে চপারের কাছে যদি কেউ আসতে চায়, তাকে যুদ্ধ করে এগোতে হবে, ছড়িয়ে পড়ে এমনভাবে পজিশন নিলো লোকগুলো।

রানার নির্দেশ পরিষ্কার বুঝে নিয়েছে লেফটেন্যান্ট। উঁচু জমি ছেড়ে কোথাও যাবে না সে। পিছনে থাকবে হেলিকপ্টার আর দু'জন পাহারাদার, রানার বেতার সংকেত পাবার অপেক্ষায়।

'কিন্তু যদি কোনো বেতার সংকেত না আসে?' জিজ্ঞেস করলো লেফটেন্যান্ট, বাস্তববাদী লোক সে।

'সেক্ষেত্রে তোমরা বেস-এর সাথে যোগাযোগ করবে, বলবে সাহায্য দরকার,' জানালো রানা। 'কোনো অবস্থাতেই সরাসরি এস্টেটে ঢুকবে না।'

'আমি ঠিক বুঝলাম না,' লেফটেন্যান্ট ইংরেজিতে বললো।

'আমার সংকেত না পাবার অর্থ হবে, কিছু একটা বিপদ হয়েছে, লেফটেন্যান্ট। এরপর তোমরা যদি এস্টেটে ঢুকতে চেষ্টা করো, দামী চপারটা হারাতে হতে পারে, মারা যেতে পারে আরোহীরা। আর যদি এখানে থাকো, চোখ রাখো উপত্যকার ওপর, জানতে পারবে আকাশ পথে কেউ পালাবার চেষ্টা করলো কিনা।'

মুহূর্তের জন্যে আড়ষ্ট হয়ে উঠলো লেফটেন্যান্টের শরীর। 'পিছু ধাওয়ার অনুমতি আছে কি?'

'অবশ্যই।'

মনের মতো উত্তর পেয়ে একগাল হাসলো লেফটেন্যান্ট নাসাউ। 'ইয়েস, স্যার!'

সাতজন লোককে নিয়ে পাহাড় থেকে নামতে শুরু করলো রানা। প্রথম কয়েক শো গজ ট্রেইল ধরে এগোলো ওরা, রানার ধারণা এদিকে কারো সামনে পড়ার ভয় নেই। যদি পড়ে, আটক করে হেলিকপ্টারের কাছে পাঠিয়ে দেয়া হবে বেঁধে রাখার জন্যে। আর যদি বন্দুকযুদ্ধ শুরু হয়, সরাসরি খুন করার জন্যে ট্রিগার টেপার নির্দেশ দিয়ে রেখেছে রানা।

ঢাল বেয়ে দ্রুত নামছে ওরা। শক্ত ঘাসের চাপড়া লাফ দিয়ে পার হলো, কাঁটাঝোপ এড়াবার জন্যে এঁকেবেঁকে ছুটলো। আরেক ঢালে চলে এলো ওরা, এদিকে ইউক্যালিপটাসের কচি চারা দেখা গেল, বাতাসে পুদিনার গন্ধ। মাত্র একবারই থামলো ওরা, হাত তুলে একটা কোকা ঝোপ দেখালো সার্জেন্ট বুলি।

এতো যার কুখ্যাতি আর প্রভাব, দেখতে সেটা ভীরু আর শান্ত প্রকৃতির। অনেকটা লম্বা হতে পারলেও, সযত্নে লালিত কোকা ঝোপকে সাধারণত ছ'ফুটের বেশি উঁচু হতে দেয়া হয় না, পাতা কাটার সুবিধের কথা ভেবে। ফলগুলো উজ্জ্বল লাল। পাতাগুলো, সমস্ত ঝামেলার উৎস, ক্রমশ সরু হয়ে গেছে, লম্বায় এক কি দেড় ইঞ্চির বেশি নয়, ইণ্ডিয়ান-দের হাতের মতোই সবুজ। কয়েকটা পাতা মুখে দিয়ে চিবাতে চিবাতে কাজে যায় তারা, তাদের এই পবিত্র ও দরকারী ঝোপ যে আধুনিক পদ্ধতির মাধ্যমে মারাত্মক বিষে পরিণত হয়ে গোটা দুনিয়াকে রসাতলে নিয়ে যাচ্ছে, সে-ব্যাপারে বিন্দুমাত্র সচেতন নয়।

একান্ত প্রয়োজন ছাড়া ইণ্ডিয়ানরা তাদের খেতে আসে না, তবু

পরবর্তী পনেরো মিনিট চোখ-কান খোলা রেখে সাবধানে এগোলো ওরা। আরো পাঁচশো ফুট নেমে ট্রেইলটাকে চোখের আড়ালে হারিয়ে ফেললো রানা, এখানে আবার হঠাৎ করে বদলে গেল গাছপালার ধরন, শুরু হলো একদিকে বাঁশ ঝাড় অপর দিকে ভুট্টা খেত।

স্বচ্ছ, দ্রুতগতি ঝর্নাটা দেখেই বুঝলো রানা, টার্গেটের কাছাকাছি চলে এসেছে ওরা। এখানে দলটাকে ভাগ করলো ও। ল্যাণ্ডিং স্ট্রিপ দখল করার জন্যে পাঠালো তিন জনকে, দক্ষিণ-পুব দিকে। প্লেনটার পাশে নিশ্চয়ই গার্ড আছে, সম্ভবত একজনের বেশি নয়। ভিক্টর লজে-নকে পালিয়ে যাবার সুযোগ দেয়া হবে না।

বাকি পাঁচজনকে নিয়ে ঝর্না পার হলো রানা, খেতের পাশ দিয়ে সরু পথ ধরে এগোলো। একটা ওক গাছের নিচে এসে থামলো ওরা। গাছে ওঠা কোনো সমস্যা হলো না, চোখে পেনট্যাক্স স্কোপ লাগাতেই সিনেমার মতো উজ্জ্বল ছবি ফুটে উঠলো।

দৃশ্যটা অস্ট্রিয়ান বলা চলে। অবশ্যই বাভারিয়ান নয়, কারণ নিখুঁতভাবে অতীতকে পুনর্গঠন করা প্রায় অসম্ভব একটা কাজ। ঢেউ খেলানো বিস্তীর্ণ তৃণভূমি, মাঝে-মধ্যে ছড়িয়ে আছে গাছপালা, স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ ঝর্না কলকল ছলছল করে বয়ে চলেছে বিল্ডিংটার পাশ ঘেঁষে, রাজরাজড়ার হান্টিং লজের মতো দেখতে সেটা।

অস্ট্রিয়ানরা মজবুত ও নিরেট জিনিস পছন্দ করে, এখানেও তার ব্যত্যয় ঘটেনি। একবার চোখ বোলালেই বাড়িটাকে পাথুরে বলে চেনা যায়। গেটগুলো খিলান আকৃতির, আকারে বিশাল, যেন নরকের প্রবেশদ্বার। তিনতলার জানালাগুলো লম্বাটে, ভেতরে নির্জনতা আর অন্ধকার যেন জমাট বেঁধে আছে। বিল্ডিংটার সীমানার বাইরে খোলা জায়গাটা লক্ষ্য করলো রানা।

লিলিয়ানের কথা অনুসারে, বাড়িটাকে লজ বলতো ববি মুয়েলার। একবারই মাত্র এখানে আসার সুযোগ হয়েছে তার, অসুস্থ বাবাকে দেখার জন্যে সস্ত্রীক এসেছিল ববি।

দিনটার কথা পরিষ্কার মনে আছে লিলিয়ানের। থক থক করে সারাক্ষণ কাশছিলেন রলফ মুয়েলার। কেমন যেন ভয় ভয় করছিল লিলির, কাছে গিয়ে দাঁড়াবার সাহস পাচ্ছিলো না। ব্যাপারটা লক্ষ্য করলেও, না দেখার ভান করেন মুয়েলার।

আশ্চর্য হলেও সত্যি, ববি বিয়ে করায় খুশি হয়েছিলেন মুয়েলার। তাঁর রাগ করার কারণ ছিলো, ববি তাঁকে না জানিয়েই বিয়েটা করে ফেলে। তাঁর খুশি হবার কারণটা সম্ভবত এই ছিলো যে বংশ রক্ষা হবে। এক সময়, কাশতে কাশতে, নিজেই এগিয়ে আসেন মুয়েলার, লিলির একটা হাত ধরেন, দু'বারের চেষ্টায়। কেন বলতে পারবে না লিলি, প্রথমবার ভয়ে হাতটা ছাড়িয়ে নিয়েছিল সে। পুত্রবধূকে ঝর্নার কাছে নিয়ে আসেন তিনি, ইণ্ডিয়ান জেলেদের মাছ ধরা দেখেন। জেলেরা তাঁকে উপহার দিতে চাইলে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন। বলেন, তারা যেন তাঁর সাথে নিয়মিত দেখা করে। যে-কোনো সমস্যা শোনার জন্যে সব সময় তৈরি থাকবেন তিনি।

সেই শেষ, এরপর আর কখনো লজে আসেনি লিলি। পরে অবশ্য আরো দু'বার বৃদ্ধ ভদ্রলোককে দেখেছে সে, একবার নিচের হাসি-য়েনদায়, দ্বিতীয়বার নিকারাগুয়াতে। নিজের পেশায় দক্ষ বলে, দেখার মতো চোখ আছে বলেও, লজের ভেতর ও বাইরে সিকিউরিটির আয়োজন সম্পর্কে ভালোই ধারণা পেয়েছিল সে।

একে একে সব মনে পড়ে গেল রানার। দক্ষিণের মাঠটায় গিজ গিজ করছে মাইন, যেগুলো মেইন সুইচ বা রিমোট কন্ট্রোলের সাহায্যে

অ্যাকটিভেট করা যায়। প্রধান ভবন থেকে পুল পর্যন্ত রয়েছে ইনট্রুশন-ডিটেকশন পেরিমিটার। লজের প্রতিটি দরজা জানালার ওপর নজর রাখছে থারমাল ও মোশন সেনসর।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যটাই জানা নেই রানার, ভিক্টর লজেন এখানে আছে কিনা। তবে একজন লোককে দেখতে পেলো ও। গোলাপি বেদিং স্যুট পরে পুলের পাশে একটা লন চেয়ারে লম্বা হয়ে আছে লোকটা। কয়েক মিনিট এক চুল নড়লো না সে, তবু তার দিকে স্কোপটা তাক করে অপেক্ষায় থাকলো রানা। আরো কিছুক্ষণ পর, হঠাৎ প্রায় ঝট করে উঠে দাঁড়ালো সে, চেয়ার থেকে তোয়ালেটা নিয়ে হাঁটতে শুরু করলো লজের দিকে। চুল আর নাকের দৈর্ঘ্য লক্ষ্য করে রানা উপলব্ধি করলো, লোকটা ভিক্টর লজেন।

কেয়ারি করা ফুল বাগানের ভেতর দিয়ে এগোলো লোকটা। হঠাৎ একটা ম্যাগনোলিয়া ঝোপের সামনে দাঁড়ালো সে। তার দাঁড়াবার ভঙ্গি আর মুখের ভাব দেখে রানার মনে হলো, সে যেন ঝোপটার সাথে কথা বলছে। অনুমান করা কঠিন কিছু নয়, ঝোপের ভেতর সম্ভবত মাইক্রোফোন আছে। কিন্তু রানার ধারণাকে মিথ্যে প্রমাণিত করে দু'ফাঁক হয়ে গেল ঝোপটা, ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো মানুষের একটা কাঠামো। তার হাতে একটা অস্ত্রও রয়েছে, অটোমেটিক রাইফেল। গভীর মনোযোগের সাথে কমাণ্ডারের নির্দেশ শুনলো সে, মাথা ঝাঁকালো, অটল দাঁড়িয়ে থেকে দেখলো ঘুরে দাঁড়িয়ে লজের দিকে চলে গেল তার কমাণ্ডার।

হাসিয়েনদায় ক'জন আছে, কোন্ শ্রেণীতে তারা পড়ে, আন্দাজ করার চেষ্টা করলো রানা। বাগানের মালিও দেখা যাচ্ছে সশস্ত্র। আরো আছে নিরামিষ রান্নায় পারদর্শী রাঁধুনি (হিটলারেরও ছিলো)।

আপাতত পুলিশের লিডার সবচেয়ে বড় সমস্যা হয়ে দেখা দিতে পারে। লোকটা নাকি সব রকম অস্ত্রেই দক্ষ, তার হাত দুটোও নাকি হাতিয়ার বিশেষ।

যান্ত্রিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার কথাও বিবেচনা করলো রানা। ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতির ওপর অতিরিক্ত ভরসা রাখার একটা প্রবণতা আছে মানুষের। জেনারেটর আর ব্যাক-আপ টিম কোথায় আছে জানা থাকায় ওগুলোর ব্যবস্থা করা কঠিন হবে না। জেনারেটর অচল করা গেলে স্ট্যাটিক ডিফেন্স আর কোনো কাজে আসবে না।

সমস্যা হলো অ্যালার্ম সিস্টেমকে ফাঁকি দিয়ে জেনারেটরের কাছে পৌঁছুনো। বড় জেনারেটরটা পুল পাম্প হাউজের সাথেই আছে, একটা সাপ্লাই শেডে। লিলির ধারণা, বড়টার সাথে আরো ছোটো কয়েকটা জেনারেটরের সংযোগ আছে, সেগুলো লজের নিচে কোথাও, সম্ভবত কোনো সেলার-এ, থাকার কথা। তারমানে, সংযোগটা কেটে দেয়া সম্ভব।

স্কোপে চোখ রেখে চারদিকটা আরেকবার ভালো করে দেখে নিলো রানা। তারপর নিচে নেমে অ্যাসানইমেন্টটা বুঝিয়ে দিলো সবাইকে।

ডান দিকে, হাতে তৈরি এমব্যাঙ্কমেন্টের ওপর, হেলিপ্যাড। গাছপালার আড়ালে প্লেনটা দেখা না গেলেও, রানা জানে ওটাকে নাগালের কাছাকাছি কোথাও রাখবে লজেন। এলাকাটা শত্রুমুক্ত করার জন্যে সার্জেন্ট বুলিকে পাঠালো রানা, সাথে মাত্র একজনকে নিলো সে। প্রধান ভবনের তিনশো গজের বাইরে থাকতে হবে ওদেরকে, নির্দেশ দিলো রানা। যদি গুরুতর বাধার সামনে পড়ে, গুলি করবে খুন করার জন্যে। হেলিকপ্টারকে অবশ্যই নষ্ট করে দিয়ে আসতে হবে। কোনো বাধা না পেলে, কাজ সারতে হবে চুপিসারে। কোনো অবস্থা-

তেই বাড়ির সীমানায় পা রাখা চলবে না।

হেলিকপ্টার আর লজের মাঝখানে, ঘন ঝোপের আড়ালে দু'জন লোককে রাখালো রানা। যুদ্ধ শুরু না হলে নিজেদের জায়গা ছেড়ে নড়বে না তারা। শত্রুরা আক্রমণ করলে আড়াল থেকে গুলি করবে তারা। তাছাড়া আর কি করতে হবে, তাদের নিজেদের ওপর নির্ভর করবে।

লোকজনকে পজিশনে বসিয়ে দিয়ে রওনা হলো রানা। প্রথম দুশো মিটার কোনো সমস্যা হলো না। ঝোপ আর লম্বা ঘাসের নিচে মাটি খুব নরম। এরপর সামনে মাইনফিল্ড পড়লো। শুনেছে, দিনের বেলা নাকি কখনোই ওগুলো অ্যাকটিভেট করা থাকে না। তথ্য ভুল হলে, আরেকটু পরই মারা যাবে রানা। তথ্য সঠিক হলে, অনুপ্রবেশ করার এটাই যে একমাত্র পথ তাতে কোনো সন্দেহ নেই। দেখেশুনে পা ফেলার চেষ্টা করা যেতে পারে, কিন্তু তাতে মাঠটা পেরোতে সময় লাগবে কয়েক ঘণ্টা। নিজের নিরাপত্তার জন্যে সময় দিতে আপত্তি নেই ওর, কিন্তু বেশিক্ষণ খোলা জায়গায় থাকাটা ঝুঁকির ব্যাপার।

রানার একবার মনে হলো, বিশ্বস্ততা ও ভালোবাসার পরীক্ষাটা হয়ে যাচ্ছে। মাইনফিল্ড সম্পর্কে লিলি যদি নিজের অজান্তে ভুল তথ্য দিয়ে থাকে, আর রানা এখন যদি মারা যায়, তাহলে? প্রমাণ হবে, লিলিকে রানা বিশ্বাস করতো। কিন্তু লিলি যদি ইচ্ছে করে ভুল তথ্য দিয়ে থাকে, যদি বেঈমানী করে থাকে, তাহলে? প্রমাণ হবে, রানাকে সে ভালোবাসে না।

যতোটা সম্ভব আড়াল নিয়ে এগোলো রানা। ছোট্ট একটা নালার উঁচু কিনারা ধরে বেশ খানিকটা সামনে বাড়ার সুযোগ হলো। ঘাস যথেষ্ট লম্বা হলেও, কোথাও কোথাও ঘাসের কোনো অস্তিত্বই নেই।

একটা আম গাছের আড়াল পেয়ে আরো দশ গজ এগোলো ও। আড়াল থেকে বেরোতেই চৌকো একটা ঘর দেখতে পেলো। হামাগুড়ি দিয়ে এগোলো রানা, জানে ওই শেডেই বড় জেনারেটরটা আছে।

মাটিতে মাঝে মধ্যে শুধু ঘাসের চাপড়া লক্ষ্য করলো রানা। ডগা-গুলো শুকিয়ে আছে দেখেই ধরা পড়েছে চোখে। নির্ঘাৎ মাইন চাপা দেয়া হয়েছে ওগুলো দিয়ে। বেশ কয়েকটার ওপর দিয়ে হয়তো হেঁটে এসেছে ও। বিপদের আশংকা দেখা না দিলে ওগুলোকে পুরোপুরি জ্যান্ত বা বিস্ফোরণের জন্যে প্রস্তুত করা হয় না।

দশ মিনিটের মধ্যে মাইন ফিল্ডকে পিছনে ফেলে এলো রানা। পুলের পিছনে খোলা জায়গাটায় থাকার সময় সেনসরগুলো যদি ওর অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন না হয়ে থাকে, নিজেকে নিরাপদ ভাবা যেতে পারে। ক্যামেরা বা মনিটরগুলোর ব্যাপারে করার কিছু নেই ওর। করার কিছু নেই যদি হেলিপ্যাডে বিপদ ঘটে থাকে।

সাপ্লাই শেডের পিছনে একটাই জানালা, সেটা বন্ধ, তবে ইলেক-ট্রনিক সেনসর দিয়ে সুরক্ষিত নয়। ব্যাগ থেকে কাটিং টুল বের করে ফ্রেম থেকে লোহার পাত আর রড কেটে নিলো রানা, ভেতরে ঢুকতে এক মিনিটও লাগলো না। দু'মিনিটের মাথায় জেনারেটরের ফুয়েল লাইন প্রাইমাকর্ড দিয়ে বাঁধা শেষ করলো। ডিটোনেটর দিয়ে অ্যাকটি-ভেট করলে, প্রাইমাকর্ড অর্থাৎ সি-ফোর ফিউজ ফুয়েল লাইন বিচ্ছিন্ন করে দেবে।

জানালা গলে মাটিতে না নেমে, ছাদে উঠে এলো রানা। ছাদের কিনারা ধরে পুলের কাছাকাছি চলে এসেছে, গুলির প্রথম শব্দটা কানে ঢুকলো।

জেনারেটরটা বিস্ফোরিত করা গেল না। ছাদ থেকে নামতে যাবে

রানা, পুলের পাশের কেবিন থেকে দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এলো লোমশ এক লোক। শর্টস পরে আছে সে। চারদিকে চঞ্চল দৃষ্টিতে তাকালো, স্যাঁৎ করে সরে গিয়ে আড়াল নিলো ডাইভিং বোর্ডের পিছনে। হাতে একটা কেজি-নাইন রয়েছে, লজেন সংগঠনের বাকি সবার হাতে যেমন থাকে। পুলের কিনারা ধরে যাবার সময় নিজের অজান্তে অস্ত্রটা রানার দিকে তাক করলো সে।

ওপর দিকে মুখ তোলার কথা নয়, কিন্তু কি এক অজ্ঞাত কারণে হঠাৎ মুখ তুলে সরাসরি রানার দিকে তাকালো লোকটা। তাকালো, কিন্তু গুলি করার সুযোগ পেলো না। কেজি-নাইনের ট্রিগার টানতে যাবে, রানার গুলি খেয়ে ছিটকে পড়লো পুলের পানিতে। ছলাৎ করে শব্দ হবার আগে আরো একটা গুলি করলো রানা।

ব্যাপারটা একতরফা রইলো না, কারণ প্রায় সাথে সাথে রানাকে লক্ষ্য করেও গুলি হলো। ব্যাগটা নিচে ফেলে দিলো ও, টিনের ছাদে গুলির শব্দ কানে নিয়ে নিজেও লাফ দিলো।

কোত্থেকে আসছে গুলি, রানার কোনো ধারণা নেই। একটা গাছের আড়ালে থেকে ব্যাগটা কুড়িয়ে নিলো ও, ছুটলো কেবিন আর গ্যারেজের মাঝখানে ফাঁকা জায়গাটা ধরে।

কোনো বুলেট পিছু নেয়নি, যদিও কেবিন আর শেড লক্ষ্য করে এখনো গুলি করা হচ্ছে। এক মুহূর্ত থেমে ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করলো রানা। ওর মনে হলো, লজের দু'জায়গা থেকে গুলি করা হচ্ছে। দু'তলার মেইন রুম আর তিনতলার সিঁড়ির সাথে সরু জানালা থেকে। দু'জায়গা থেকেই গুলি করে রানাকে ফেলে দেয়া সম্ভব, কিন্তু এরই মধ্যে পাইন বন থেকে তাদেরকে লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়া শুরু হয়েছে, পাল্টা জবাব দিতে তারা ব্যস্ত।

লজের দিকে তাকিয়ে একটা হিসাব পাবার চেষ্টা করলো রানা। সতর্ক পাহারা না থাকলে তিনটে জায়গা দিয়ে লজের ভেতর ঢোকার চেষ্টা করা যায়। বড় চিমনি আর বিল্ডিংটার কোণ, দুটোর মাঝখানে সরু একটা ফাঁক রয়েছে, সেটা লক্ষ্য করে ছুটলো ও। প্রথম দশ ফুট ওর দিকে কোনো বুলেট ছুটে এলো না, তারপর দুই বা তিনটে অটোমেটিক রাইফেল গর্জে উঠলো, গুঁড়িয়ে দিলো গ্যারেজের দরজাটা।

ফিল্ডস্টোন চিমনিটা বিল্ডিঙের দেয়াল থেকে ছ'ইঞ্চির মতো বেরিয়ে রয়েছে। চিমনির কোণ থেকে উজির নলটা বের করে দিলো রানা, একনাগাড়ে গুলিবর্ষণ শুরু করলো, কাঁচ ভাঙার শব্দ শুনে বুঝলো জানালার দিকে স্থির ছিলো লক্ষ্য। জানালার পিছনে দাঁড়ানো লোকটা আর্তনাদ করে উঠলো। এক মুহূর্তের জন্যে আড়াল থেকে খোলা জায়গায় বেরিয়ে এলো রানা, কংকাশন গ্রেনেড অ্যাকটিভেট করলো, ছুঁড়ে দিলো বিধ্বস্ত জানালা লক্ষ্য করে।

গ্রেনেডটা সরাসরি কাউকে খুন করবে না, কারণ ওটা শুধু বিস্ফোরিত হবে, বিচ্ছিন্ন হয়ে ছড়িয়ে পড়বে না। শত্রুদের প্রাণ বাঁচানোর চেষ্টা করছে ও, কথাটা ভাবতেই খারাপ লাগলো ওর। ভিক্টর লজেনের মতো কসাইকে যারা সাহায্য করে তাদের জন্যে দয়া দেখানো বোকামি। তবু, নীতি বলে একটা ব্যাপার আছে।

বিস্ফোরণের শব্দ হতেই আবার আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো রানা, ছুটলো জানালার দিকে। এক লাফে ফাঁকটা গলে ভেতরে ঢুকলো ও। দাড়িওয়ালা একজনই লোক ছিলো জানালায়, এই মুহূর্তে মেঝেতে বসে কি যেন হাতড়াচ্ছে সে। কফি টেবিলের ওপর খোলা রয়েছে রঙচঙে একটা নকশা। লোকটার চোয়াল আর সম্ভবত ঘাড়টা লাথি মেরে ভাঙার জন্যে দেড় সেকেণ্ড সময় নিলো রানা।

দাড়িটা অদ্ভুতভাবে তেরছা হয়ে গেল, কাত হয়ে পড়ে গেল লোকটা। এতোক্ষণে দ্বিতীয় লোকটাকে লক্ষ্য করলো রানা। পরনে অ্যাপ্রন, মুখ থুবড়ে পড়ে আছে ফায়ারপ্লেসের সামনে, শিখাহীন আগুনের ওপর বমি করছে। তার নাগালের বারো ইঞ্চি বাইরে একটা অস্ত্র রয়েছে, এটাও কেজি-নাইন। মাথা ঝাঁকিয়ে বিস্ফোরণের ধকল সামলাতে চেষ্টা করছে লোকটা, লাথি মেরে তাকে অজ্ঞান করলো রানা।

কামরার চারদিকে তাকিয়ে ফার্নিচারগুলো চিনতে পারলো ও, লিলির কাছ থেকে পাওয়া বর্ণনা এখনো অম্লান হয়ে আছে স্মৃতিতে।

নষ্ট করার মতো সময় নেই, দেরি করলে কোকেন সম্রাটকে পালিয়ে যাবার সুযোগ করে দেয়া হবে। লম্বা কামরাটা থেকে বেরিয়ে সিঁড়ি বেয়ে ছুটলো ও। হলওয়েতে পা ফেলার আগে আরেকটা কংকাশন গ্রেনেড ছুঁড়লো। বিস্ফোরণের ধাক্কা থেকে বাঁচার জন্যে আড়াল নিলো ও। বিস্ফোরণের শব্দ একটু ঝাঁকি দিলো ওকে, উজ্জ্বল আলো ধাঁধিয়ে দিলো চোখ দুটো। অন্তত তিন সেকেণ্ড পরিষ্কার কিছুই দেখতে পেলো না রানা।

হলওয়ে ধরে এগোলো ও। করিডরে হাঁটু গেড়ে বসে রয়েছে এক লোক, আউটার ওয়াল-এর সরু জানালার দিকে মুখ। গ্রেনেডের বিস্ফোরণ তাকে দিশেহারা, উদভ্রান্ত করে রেখেছে। পিছন থেকে তার ঘাড়ে হাতের কিনারা দিয়ে কোপ মারলো রানা।

লোকটা বিশাল, পেশীবহুল শরীর, একবার গুঙিয়ে উঠে মুখ থুবড়ে পড়লো। এক পা এগিয়ে লোকটার অস্ত্রটা কুড়িয়ে নিলো রানা। এটাও কেজি-নাইন। এই সময় শব্দটা কানে ঢুকলো। হলওয়ের আরেক দিকে খুলে আবার বন্ধ হয়ে গেল একটা দরজা।

দোরগোড়ায় লোকটার শুধু অস্পষ্ট কাঠামো দেখতে পেলো রানা,

তবে সেটুকুই যথেষ্ট। সুইমিং ট্রাংক, স্যাণ্ডেল আর সানগ্লাস পরা লোকটা ভিক্টর লজেন। দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে, আবার সাথে সাথে বেরিয়ে যাবার সময় তার লম্বা চুল ঝাঁকি খেলো। দড়াম করে নিজের পিছনে দরজাটা বন্ধ করে দিলো সে।

এক নিমেষে দরজার কাছে চলে এলো রানা। দরজার পাশে পিঠ দিয়ে দাঁড়ালো, তালার দিকে তাক করলো উজির মাজল। দরজার পাশে না দাঁড়ালে, ওখানে দাঁড়িয়ে দরজার দিকে খানিকটা না ঘুরলে, আঘাতটা শুধু অনুভব করতো রানা, কোত্থেকে এলো দেখতে পেতো না। চোখের কোণ দিয়ে শুধু কি যেন নড়ে উঠতে দেখলো ও, হাত তুলে বাধা দিতে লোকটার ঘুসি খেলো বাহুতে।

প্রচণ্ড মার খেয়েও জ্ঞান হারায়নি বিশালদেহী লোকটা, হলঘরের মেঝে থেকে উঠে এসেছে সে পেছন পেছন। রানার হিসেবে একটু ভুল হয়ে গেছে, এ-ধরনের দশাসই বেজন্মাকে অচল করতে পারে শুধু একটা বুলেট। বাধা দিতে গিয়ে রানার হাত দুটো মুখের কাছে উঠে এলো, ওগুলো এখন আর কোনো কাজে আসবে না। মেঝে দিয়ে গড়িয়ে গেল কেজি-নাইন। উজিটা বুকের সাথে সেঁটে রয়েছে।

রানার চোখে নিঃশ্বাস ফেলছে লোকটা। এ নিশ্চয়ই সেই খুনেদের সর্দার, যার হাত দুটোকে হাতিয়ার বলা হয়। হাতিয়ার দুটো রানার মুখে ব্যবহার করছে সে। লোহার মতো শক্ত, বাঁকা আঙুল রানার চোখে ঢোকাতে চেষ্টা করলো। তাড়াহুড়ো করলো না, কারণ জানে রানার করার কিছু নেই, শুধু মাথা ঝাঁকানো ছাড়া। চোখ দুটোকে এই মুহূর্তে আঙুলের নাগালে না পেয়ে রানার মুখের মাংসে নখ ঢুকিয়ে দিলো সে, আরেক হাতের তালু দিয়ে চাপ দিলো চিবুকে। আক্রমণটা আরো মারাত্মক হতে পারতো, যদি না কংকাশন গ্রেনে-

ডের বিস্ফোরণ দুর্বল আর শ্লথগতি করে তুলতো লোকটাকে।

উপায় না দেখে নেতিয়ে পড়লো রানা, দেয়ালে ঘষা খেয়ে পড়ে গেল মেঝেতে। পড়েই সোজা ওপর দিকে লাথি চালালো। লোকটার উরুসন্ধিতে বাধা পেলো ওর পা। গুঙিয়ে উঠলো লোকটা, ছিটকে দূরে সরে গেল। এক সেকেণ্ড সময় পেলো রানা। সময় পেলো লোকটাও।

পরস্পরের দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে থাকলো ওরা। দু'জনেই আক্রমণাত্মক ভঙ্গি নিয়ে সামনের দিকে সামান্য ঝুঁকে আছে। লোকটা স্থির, অচঞ্চল, যেন একটা পাথরের স্ট্যাচু। রানা হাঁপাচ্ছে। ওজনের দিক থেকে টেনেটুনে তার অর্ধেক হবে রানা। গায়ের জোরে দৈত্যটার সাথে পারার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। দ্বিতীয়বার তার হাতে ধরা পড়া মানে নির্ঘাৎ মৃত্যু। কৌশলে জিততে হবে রানাকে।

লোকটাকে খেপিয়ে তোলা দরকার। তারপর দৌড় খাটাবে। উদ্দেশ্য ক্লান্ত করে তোলা। ছোবল মারার ভঙ্গিতে একটা ঘুসি মেরেই পিছিয়ে এলো রানা, পিছিয়ে আসবে তা আগে থেকে বুঝতে দেয়নি শত্রুকে। ঘুসিটা আসছে দেখেও নড়লো না লোকটা, ভেবেছিল ওটা হজম করবে প্রতিপক্ষকে আটক করার বিনিময়ে। এ-ধরনের পরিস্থিতিতে সাধারণত প্রতিপক্ষ একের পর এক ঘুসি মারতে থাকে, কাজেই নাগালের মধ্যেই পাওয়া যায় তাকে। ঘুসিটা হজম করার পর রানাকে নাগালের মধ্যে না দেখে রেগে গেল দৈত্য, বুঝতে পারলো তাকে বোকা বানানো হয়েছে। গর্জে উঠে সামনে এগোলো সে।

তৈরিই ছিলো রানা। লোকটা ঘুসি বাগিয়ে ছুটে এলো, স্যাঁৎ করে একপাশে সরে গিয়ে নিজেকে রক্ষা করলো ও, পাশ থেকে লাথি মারলো শত্রুর হাঁটুতে। হোঁচট খেতে খেতে নিজেকে কোনো রকমে

সামলে নিলো লোকটা। তাল ফিরে পেয়ে আবার রানার দিকে এগিয়ে এলো সে।

এবার রানা নড়লো না। প্রতিটা ঘুসি হাত দিয়ে ঠেকালো ও, লাথিগুলো লাগতে দিলো কোমরের ওপর দিকে। সুযোগের অপেক্ষায় থাকলো ও, সেটা পেতেই মোক্ষম একটা আঘাত করলো হাতের কিনারা দিয়ে লোকটার নিরাবরণ গলায়। ব্যথা পেয়ে পিছু হটছে লোকটা, পর পর তিনটে লাথি মারলো রানা তাকে। প্রথম ধাক্কায় দেয়ালের সাথে সেঁটে গেল শত্রু, দ্বিতীয় লাথিটা আংশিক ঠেকালো সে, নাক দিয়ে বাতাস ছেড়ে সিধে হয়ে গেল শরীরটা, শেষ লাথিটা পাঁজরের হাড়গুলোকে মেরুদণ্ডের সাথে চেপে ধরলো।

খেল খতম।

লজেনের দরজা ভাঙতে এবার কোনো বাধা পেলো না রানা। তালায় গুলি করে ভেতরে ঢুকলো ও, জানে শিকার হাতছাড়া হয়ে গেছে। বিশালদেহী খুনিটাকে সাহায্য করার জন্যে লজেন যদি থেকে যেতো, এতোক্ষণে প্রাণহীন মাংসে পরিণত হতো রানা। কিন্তু না, হোয়াইট গামার নেতা নিজের অবস্থানে অটল থাকেনি। পালিয়েছে সে।

বাড়িটার একপাশের জানালা থেকে কেবিন আর পুলটা দেখা যায়। সরাসরি জানালার সামনে না দাঁড়াবার বুদ্ধিটা এখনো রানাকে ত্যাগ করেনি। পাশে দাঁড়িয়ে পর্দা সরাতে যাবে, পর্দা ফুটো করে বেরিয়ে গেল দুটো বুলেট। লজেন বা তার কোনো লোক জানালার ওপর অস্ত্র তাক করে বসে আছে। কাঁচের ভাঙা টুকরো লাগলো রানার মুখে। কাঁধে একটা ধাক্কা অনুভব করলো ও, ফ্রেমের টুকরো কিনা বলতে পারবে না। তার আগে উঁকি দিয়ে বাইরেটা একবার দেখে নিয়েছে।

দেখলো পুলের ওপারে দ্রুত হাঁটছে এক লোক। খোঁড়াচ্ছে সে। লম্বা চুল আর সুইমিং ট্রাংক বলে দিলো লোকটা ভিক্টর লজেন। ওপর-তলা থেকে লাফ দিয়ে পড়ার সময় নিশ্চয়ই পায়ে আঘাত পেয়েছে সে। মাইনফিল্ডের দিকে যাচ্ছে, যেদিকে গোলাগুলি হচ্ছে না। মাইন-ফিল্ড পেরিয়ে পাহাড়ে উঠে যাবার মতলব।

খুশি হলো রানা। এক ছুটে মেইন রুমে চলে এলো ও, ক্লজিট খুলে মাইনফিল্ড অ্যাকটিভেট করলো। তারপর পিছনের দরজা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এসে দাঁড়াবার আদেশ দিলো লজেনকে।

সাত

'ডিড ইউ রিয়েলি আর্ম দিস ফিল্ড, ম্যান?'

মিথ্যে বলেনি গর্ডন উইন্টার। চমৎকার ইংরেজি বলে ভিক্টর লজেন। একটু হয়তো সেকেলে, তবে অনর্গল। ধরা পড়ার মুহূর্ত থেকে পরি-স্থিতি নিয়ে আলোচনা করতে চেয়েছে সে, কিন্তু ডি. এ. এস.-এর দু'জন লোককে শান্ত করতে ব্যস্ত থাকতে হলো রানাকে। শেষ মুহূর্তে পৌঁচেছে তারা, খুন করার জন্যে অস্থির। সার্জেন্টকে সাহায্য করার জন্যে রওনা হবার পর নিজেদের একজন লোক হারিয়েছে তারা,

দলের অপর একজন আহত হয়েছে। কাজেই প্রতিশোধ নিতে চায় তারা। বুঝিয়ে-শুনিয়ে তাদেরকে হাসিয়েনদা সার্চ করতে পাঠালো রানা, শত্রুপক্ষের আহত বা নিহত লোকদের নিয়ে কি করতে হবে তাও জানিয়ে দিলো। ইন্টারোগেশন-এর সময় কোনো সাক্ষী রাখতে চায় না ও।

'মাঠের ওপর একবার হাঁটলেই তো পারো, ভিক্টর। সাথে সাথে জানতে পারবে সত্যি বলছি কিনা।'

কপাল আর চোখ থেকে লম্বা চুল সরালো লজেন। 'তোমার কথা আমার বিশ্বাস করা উচিত, রানা,' বললো সে। 'আমার ধারণা, এই জায়গা সম্পর্কে কিছুই তোমার অজানা নেই।'

'কারেক্টো!'

'মেয়েছেলেটা আসলে বেশ্যা,' বললো লজেন, গাল দিলো লিলিয়ানকে।

অন্য কোনো পরিস্থিতিতে লিলিকে এভাবে অপমান করা হলে সাথে সাথে আক্রমণ করতো রানা। ধৈর্য ধরায় এতোটা পথ আসতে পেরেছে ও, জানে এই ধৈর্যই ওকে হয়তো বাকি পথটুকু নিয়ে যাবে, পৌঁছে দেবে হেনেরিক মুলারের কাছে। লিলিয়ানকে যা খুশি বলুক লজেন, রানা মাথা গরম করবে না। 'অস্ত্রটা ফেলে দাও, ভিক্টর,' শান্ত গলায় নির্দেশ দিলো ও।

সবুজ ঘাস মোড়া মাঠের চারদিকে চোখ বোলালো লজেন, যেন শুকনো ডগা সহ ঘাসের একটা চাপড়া খুঁজছে। কয়েক সেকেণ্ড পর হাল ছেড়ে দিলো সে। কাঁধ থেকে কেজি-নাইনটা নামালো, শুধু স্ট্র্যাপ ধরে সামনে পিছনে দোলাচ্ছে সেটা। 'ঠিক কোথায় আত্মহত্যাটা করবো বলে তোমার ধারণা?'

'যতোটা দূরে পারো ছুঁড়ে দাও ওটা,' বললো রানা। 'খানিকটা সম্ভাবনা আছে তুমি আহত হবে না।'

হাসলো লজেন। তার মুখটা চওড়া, হাঁসের মতো, ঠোঁট জোড়া মেয়েলি, যৌনাবেদনের কমতি নেই। মেয়েমানুষ পটাতে তার জুড়ি নেই, এ-কথা সবাই জানে। তার নামটা এতোই জনপ্রিয় যে সদ্যোজাত পুত্রসন্তানের নাম ভিক্টর রাখার একটা হিড়িক পড়ে গেছে কলম্বিয়ায়। দীর্ঘদেহী সে, স্বাস্থ্যবান, নায়কোচিত চেহারা।

স্টাইলের ভক্ত ভিক্টর। কেজি-নাইনটাকে দিয়ে একটা বৃত্ত রচনা করলো সে, নিজের পিছনে নিয়ে গেল, বৃত্ত সম্পূর্ণ করার আগে ছেড়ে দিলো স্ট্র্যাপটা। অস্ত্রটা ছুটে এলো রানার দিকে, একটা আম গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে রয়েছে ও। ওর কাছ থেকে পনেরো গজ দূরে পড়লো সেটা, মাইনফিল্ডের ভেতর। কিছুই বিস্ফোরিত হলো না। 'সত্যি তুমি গুণী লোক, রানা,' বললো সে। 'তোমার সাহস আছে। ভালো লোকের চোখে পড়লে কলম্বিয়ায় তুমি উন্নতি করতে পারতে।'

'আমার ক্যারিয়ার নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না,' বললো রানা। 'তুমি বরং নিজের জীবন নিয়ে চিন্তা করো। আমাদের সিদ্ধান্ত নিতে হবে, মাঠটা থেকে তোমাকে বেরোতে দেয়া হবে, নাকি ওখানেই তোমার অস্তিত্বের ইতি ঘটবে।'

আবার নিজের চারদিকে তাকালো লজেন। কাঁধের ওপর দিয়ে পিছন দিকে তাকাবার সময় শরীরের ভর এক পা থেকে আরেক পায়ে চাপালো। এমনকি ডান পা-টাও সামান্য জায়গা বদল করলো। এ-সবের মানে হলো, তারও সাহসের কোনো অভাব নেই। 'আপোসে রাজি আছো, রানা? কি চাই তোমার? ক্যারিবিয়ানে আমার একটা দ্বীপ আছে। ভালো শিকার পাওয়া যায়। ‍ ‍ ‍র একটা দোতলা

বাড়ি আছে, বাইশটা কামরা ওতে। জেটিতে ইয়ট দেখতে পাবে। আরো দুটো ছোটো বোট আছে। গাড়ি আছে। বলো তো সবসুদ্ধ ওটা তোমাকে আমি দান করতে পারি। কাগজ-পত্র সব আমি তৈরি করে দেবো। বলো তো সাদা কাগজে সই করতেও আপত্তি নেই। সব বুঝিয়ে দেয়ার পর এখান থেকে হেঁটে চলে যেতে পারবো আমি, ঠিক আছে?'

'হাঁটতে তুমি এখনো পারো, লজেন।'

'না, পারি না,' বললো লজেন।

খুশি হলো রানা, বিপদটা সম্পর্কে কোনো সন্দেহ নেই লজেনের। 'তোমার তো জানার কথা যে বিচারের জন্যে তোমাকে যুক্তরাষ্ট্রে পাঠানো হবে,' বললো ও, ধীর পায়ে মাইনফিল্ডের কিনারার দিকে হাঁটছে। 'তোমার বিরুদ্ধে রায় হবে। কঠিন শাস্তি ভোগ করবে তুমি, লজেন।'

'তুমি যখন বলছো, বিশ্বাস না করে উপায় কি।'

'হালকাভাবে নেয়ার ভান করো না, লজেন। তোমার সি. আই. এ. বন্ধুরা এই বিপদে কোনো সাহায্যে আসবে না। এ-ব্যাপারে আমি তোমাকে পূর্ণ নিশ্চয়তা দিচ্ছি।'

সি. আই. এ.-র নাম শুনে প্রতিক্রিয়া হলো লজেনের। তার ঠোঁটের নড়াচড়া দেখে মনে হলো, কি যেন চুষছে সে। ভঙ্গিটা থেকে রানার প্রতি অবহেলা, সবজান্তার ভাব আর একঘেয়েমি প্রকাশ পেলো। তার কণ্ঠস্বরেও এই সব ভাবের সংমিশ্রণ লক্ষ্য করলো রানা। 'সেটা আমার সমস্যা, রানা। তুমি বরং নিজের কথা বলো—এতে তোমার স্বার্থ ঠিক কোন্‌খানটায়, জানতে পারি?'

কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর দরকার রানার। সবচেয়ে ছোটো প্রশ্নটা দিয়ে

শুরু করলো ও। 'সি. আই. এ.-র হয়ে কি কাজ করছো তুমি?'

কাঁধ ঝাঁকালো লজেন। 'এ-সব গুরুত্বহীন বিষয়,' বললো সে। 'ব্যবসা।'

'টাকা,' বললো রানা। 'সি. আই. এ.-কে তুমি টাকা দিয়েছো।'

ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকালো লজেন, দূর থেকে কোনো রকমে বোঝা গেল। 'ওরা কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে লড়ছে, রানা। কমিউনিস্টদের নিশ্চিহ্ন করার জন্যে ফাণ্ড দরকার ওদের।'

'সি. আই. এ.-র মাধ্যমে কণ্ট্রাদের তুমি টাকা দিয়েছো।'

'টাকাটা কিভাবে খরচ করতে হবে সে-ব্যাপারে আমি কোনো শর্ত দিইনি,' বললো লজেন। 'যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট বলেছেন, তিনি একজন কণ্ট্রা। আমি, ভিক্টর লজেন, একজন কণ্ট্রা। তুমি, মাসুদ রানা, অন্তরের অন্তস্তলে একজন কণ্ট্রা।'

'আমি কি তুমি তা জানো না,' বললো রানা। 'যেমন জানো না, যদিও তার সাথে কাজ করেছো তুমি, ডেভিড গোল্ডব্লাট সম্পর্কে। চাঁদার বিনিময়ে তোমাকে সে ঘণ্টা দিয়েছে।'

'কে এই ডেভিড গোল্ডব্লাট?' জিজ্ঞেস করলো লজেন।

'তুমি সম্ভবত তাকে শকুন বলে চেনো। এবার তুমি কনডর গ্রুপ সম্পর্কে কিছু বলো, লজেন।'

'তুমি একজন ইন্টেলিজেন্স এজেন্ট,' বললো লজেন। 'তোমাকে নতুন আর কি বলার থাকতে পারে আমার?'

'তোমার সাথে তাদের সম্পর্ক কি?' জানতে চাইলো রানা।

'আমি তো হোয়াইট গামা,' সাবলীলভঙ্গিতে বলে গেল লজেন। 'দলের সবাই একই রাজনৈতিক আদর্শে বিশ্বাসী। আমাদের দৃষ্টিতে, গোটা দুনিয়া বামপন্থী আদর্শের হুমকির মধ্যে রয়েছে। কেন্দ্রীয় ভাবে

শৃংখলা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব হলে দুনিয়াটাকে আমরা শান্তির নীড় বানাতে পারি··· ।'

'আমার প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছো না তুমি, লজেন।'

'দিয়েছি তো,' জোর দিয়ে বললো লজেন, প্রিয় বিষয়ে কথা বলার সুযোগ পেয়ে উৎসাহ বোধ করছে সে। 'আমরা যারা কনডর গ্রুপে আছি তারা সবাই প্রথমে এই এলাকায় ফ্যাসিজম প্রতিষ্ঠিত করতে চাই। যে-কোনো মূল্যে সাফল্যের মুখ দেখবো আমরা।'

এ-ধরনের ভাষণ আগেও শুনেছে রানা, তবে কোথায় মনে করতে পারলো না। মার্কিন সরকারের একজন এজেন্ট কনডর গ্রুপকে সাহায্য সহযোগিতা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে নিজের চাকরি রক্ষা করার জন্যে, সেই সাথে দেশপ্রেমের নাম করে স্বদেশের বিরাট ক্ষতি করছে। পুরনো গল্প, ডেভিড গোল্ডব্লাট হলো সেই পুরনো কাহিনীর সবচেয়ে ঘৃণ্য পরিচ্ছেদ। 'তোমাদের কর্মসূচীতে সহায়তা পাবার আশায় কতো টাকা দিয়েছো শকুনকে?'

'প্রশ্নটা তোমার করা উচিত আমার অ্যাকাউন্টস অফিসারকে,' অলস ভঙ্গিতে বললো লজেন। 'তবে দশ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের কম নয়, এটুকু আমি জানি।'

দশ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। 'টাকার বদলে একটা রশিদ নেয়া উচিত ছিলো তোমার, লজেন। টাকা দিয়ে শুধুই বিপদ কিনেছো তুমি।'

'মনে হচ্ছে তোমার কথাই ঠিক, রানা।'

বলছে বটে, কিন্তু রানার কথা বিশ্বাস করে না সে। এখন না করলেও, পরে করবে। ইরান থেকে খবর আসুক। শুধু তথ্য সংগ্রহ বাদে, আর সব কাজ করার ক্ষমতা কেড়ে নেয়া হবে সি. আই. এ.-র। মার্কিন

যুক্তরাষ্ট্রের জন্যে মঙ্গলজনক হবে সেটা। স্বদেশের স্বার্থে নির্বিঘ্নে কাজ করতে পারবে ন্যাশনাল সিকিউরিটি এজেন্সি। সি. আই. এ.-র সহায়তা না পেলে কোকেন সম্রাটের মস্ত ক্ষতি হয়ে যাবে, রানার জন্যে ব্যাপারটা উপরি পাওনা। ক্ষতিটা টের পাবে লজেন, কিন্তু তখন আর কিছু করার থাকবে না তার। 'কনডর গ্রুপের সাথে তোমার পরিচয় করিয়ে দিলো কে? ববি মুয়েলার, তাই না?' জানতে চাইলো রানা।

'হ্যাঁ,' বললো লজেন।

'মিটিংটায় তুমি না থাকলেই ভালো করতে, লজেন। ইন্টেলিজেন্স নিয়ে খেলা করা তাদেরই মানায় যারা ব্যাপারটা বোঝে। যেমন তোমার বাবা, তোমার আত্মীয় ভদ্রলোক।'

টোপটা খেলো না লজেন। রানার দিকে নির্লিপ্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলো সে। 'আমার বাবা বুড়ো হয়েছেন, তিনি অসুস্থ। আলোচনায় তাঁকে টেনে না আনলে আমি খুশি হবো।'

'বোঝার চেষ্টা করো, লজেন। তুমি বেঁচে থাকলে আমার কোনো লাভ-লোকসান নেই। অন্য লোকেরা তোমাকে ড্রাগ, দুর্নীতি, কার্টেলের গোপন তথ্য ইত্যাদি নিয়ে প্রশ্ন করবে। এ-সব প্রশ্নের উত্তর পেলে নিজেকে আমি ভাগ্যবান বলে মনে করবো, কিন্তু আমার প্রধান উদ্দেশ্য এগুলোর উত্তর পাওয়া নয়।'

'তুমি একজন বিশেষজ্ঞ,' বললো লজেন। 'এটুকু পরিষ্কার। কি চাও তুমি, রানা?'

'তোমার আত্মীয় ভদ্রলোক সম্পর্ক বলো। তোমার খালু হন, তাই না? আমরা যাকে রলফ মুয়েলার বলে চিনি।'

প্রথম দিকে সাহস দেখিয়ে নড়াচড়া করলেও, আলোচনা শুরু হবার

পর নিজের জায়গায় সম্পূর্ণ স্থির হয়ে আছে লজেন। 'পরিবার নিয়ে আমি কোনো আলোচনায় রাজি নই,' দৃঢ়কণ্ঠে জানিয়ে দিলো সে।

লজেন হয়তো সত্যি অটল থাকবে তার সিদ্ধান্তে, যদিও রানা তা মনে করে না। উজিটা তুলে গুলি করলো ও, মুখে কিছু বললো না। লজেনের সামনে, এক গজ দূরে, দশটা বুলেটের একটা ঝাঁক ঘাসের ভেতর সেঁধিয়ে গেল।

মারাত্মক কিছু ঘটলো না। একটা বুলেট ঘাসের ভেতর নিরেট কিছুতে লাগলো, ছিটকে উঠলো সেটা, বাতাসে শিশ কেটে বেরিয়ে গেল। লজেনের অর্ধ-নগ্ন শরীরে মাটি লাগলো।

মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুত হয়ে আছে এমন একজন লোকের কাছে ঘটনাটা হয়তো তেমন কিছু নয়, তবে লজেনের প্রতিক্রিয়া হলো। শিউরে উঠলো সে, জায়গা বদলের জন্যে পা তুললো। তারপর হঠাৎ আড়ষ্ট হয়ে গেল সে, মনে পড়ে গেছে নড়ার উপায় নেই তার। মুখ রক্ষার জন্যে গা থেকে মাটির কণা ঝাড়লো সে। 'কাজটা তাহলে তোমারই, তাই না?' মুখ তুলে জিজ্ঞেস করলো সে। 'আমার প্লেন আর স্ট্যাচু ধ্বংস করেছো।'

মাথা ঝাঁকালো রানা।

'আমি জানতাম, তোমারই কাজ হবে ওটা। হয় তোমার কাজ, নয়তো কোনো উন্মাদের।'

'কি করে জানলে?'

হাসলো লজেন। হাসিটার মধ্যে রানা যা দেখলো, নির্ঘাৎ মেয়েগুলোও তাই দেখতে পায়। হাসির মধ্যে এতো নিষ্ঠুর ভাব থাকতে পারে, ভাবা যায় না। 'ব্যাপারটা তুমি আর আমি বুঝি, রানা,' বললো সে। 'শক্তিশালী কোনো লোক যদি ধ্বংস করতে চাও, প্রথমে

তার সেন্টিমেন্টের ওপর আঘাত হানো।'

'হ্যাঁ।'

'তারমানে তোমার আর আমার মধ্যে বিস্তর মিল আছে।'

'একটা পর্যায় পর্যন্ত।'

'সেই পর্যায়টা কি?'

'টাকার বিনিময়ে মানুষকে আমি খুন করি না,' বললো রানা।

আবার হাসলো লজেন। 'টাকা নয়, তোমার বোধহয় মানসিক সন্তুষ্টি দরকার,' বললো সে। 'মানুষকে ধাওয়া করে তৃপ্তি পাও তুমি।'

'ধাওয়া পর্ব শেষ হয়েছে, লজেন। আমার শুধু জানতে বাকি আছে, তোমার খালুর ঠিকানাটা।'

জবাব দিলো না লজেন।

উজিটা আবার তুললো রানা। আবার দশটা গুলি করতো ও, এবার ডান দিকে, কিন্তু তার আগেই মুখ খুললো লজেন।

'ওয়েট, ম্যান!'

'জলদি, লজেন। বলো, হেনেরিক মুলারকে কোথায় পাওয়া যাবে।'

নামটা শুনে একটুও অবাক হলো না লজেন। মনে হলো, জানে সে। সম্ভবত বড় হবার পর থেকেই জানে। তার মৌনতা অর্থবহ হয়ে উঠলো রানার কাছে। 'না জানলে বলবো কিভাবে। আমার খালু চলে গেছেন। যখন খুশি আসেন তিনি, কেউ বলতে পারে না কখন চলে যাবেন। চিরকাল এইরকমই তিনি। গ্রেট ম্যান বলতে যা বোঝায়, আমার খালু তাই। মহৎ কোনো মানুষকে প্রশ্ন করা যায় না।'

'বিশ্বাস করলাম না, লজেন। জানো তো, আমার হাতের এই ব্যারেল থেকে সত্যি কথাটা বেরিয়ে আসবে?' উজি থেকে আরো এক ঝাঁক বুলেট ছুটলো। সাংঘাতিক একটা ঝুঁকি নিচ্ছে রানা, যে-কোনো

দিকে একজোড়া মাইনের মাঝখানে খুব বেশি ফাঁক থাকার কথা নয়। লজেনের ডান দিকে লাফিয়ে উঠলো মাটি। টমাস কালভিনের রেখে যাওয়া একমাত্র শত্রু এক পায়ে লাফালো, পাখির মতো।

এবারও লজেনের ভাগ্য বলতে হবে, কিছু ঘটলো না। ভাগ্য রানারও, কারণ লজেন মারা গেলে দরকারী একটা তথ্য থেকে বঞ্চিত হবে ও। লজেনের চুলে, সারা শরীরে মাটি লেগেছে। বাতাসে উড়ছে ঘাসের ছেঁড়া ডগা আর পোকা। তবে কোনো বিস্ফোরণ ঘটেনি। রক্তও ঝরেনি এক ফোঁটা। সঠিক উত্তরটা এবার পেতে হবে রানাকে, তৃতীয়বার ঝুঁকিটা নিতে রাজি নয় ও। 'কোথায় তিনি, ভিক্টর? জবাব দাও, মায়ামি বীচ দেখার জন্যে বেঁচে থাকবে তুমি। বুড়ো বয়সটা নাকি ওখানে কাটাতেই পছন্দ করে কলম্বিয়ানরা।'

রানার দিকে সরাসরি তাকালো লজেন। 'এতোক্ষণে একটা প্রস্তাব দিচ্ছো তুমি। শর্তগুলো কি, রানা?'

'প্রস্তাবটা তোমার জীবন, লজেন। সেটার কি দাম, তুমি ঠিক করবে। আমাকে যদি জিজ্ঞেস করো, মৃত্যুর মুখোশ পরা একটা ভাঁড় তুমি।'

অপমানটা সহজে হজম করতে পারলো না কোকেন সম্রাট। বিপথ-গামী প্রতিভার মানসিক ক্ষমতা সম্পর্কে এই প্রথম আভাস পেলো রানা। চিবুক উঁচু করে রানার দিকে তাকালো সে, যেন দিগ্বিজয়ী একজন বীর, মনটা তার পাষাণ। তার মাংসল ঠোঁট দুটো সামান্যই নড়লো, নিচু গলায় কথা বললো সে। 'ইচ্ছে করলে আমাকে খুন করতে পারো, রানা। কিন্তু মনে রেখো, যে-কোনো মানুষকে খুন করানো যায়। আমি জানি, মেয়েদের প্রতি তুমি খুব নরম। আমি বিশেষ করে সেই বেশ্যাটার কথা বলছি। ভেবো না তাকে নিরাপদে

লুকিয়ে রাখতে পেরেছো। ভেবো না তা সম্ভব। আমি যদি মারা যাই, ববি মুয়েলারের স্ত্রী, নিজের পরিচয় সে যা-ই দিক, যেখানেই সে লুকিয়ে থাকুক, তাকেও মরতে হবে।'

হুমকিটা শোনার সময় বুকের রক্ত ছলকে উঠলো রানার। খুনের একটা নেশা অনুভব করলো ও। আরেকটু হলে ট্রিগার টেনে ধরেছিল। কিন্তু না, লোকটাকে ওর জীবিত দরকার। কারণ টমাস কালভিন ওকে জীবিত ধরতে চেয়েছিল। আরেকটা কারণ, লিলি সম্পূর্ণ নিরাপদ নয়। 'ভিক্টর, তোমার কাছ থেকে একটা কিছু পেতে হবে আমাকে। তা না হলে তোমার আর আমার কথা ছাড়া বাকি সব আমি ভুলে যাবো।'

চেহারায় ঘুম ঘুম ভাব নিয়ে হাসলো লজেন। শব্দগুলো উচ্চারণের সাথে তার ঠোঁট ঘন ঘন বেঁকে গেল, 'আমার খালু এই মুহূর্তে অনেক দূরে রয়েছেন, যেখানে কেউ তাকে খুঁজে পাবে না। তিনি আছেন গভীর এক জঙ্গলে, একটা বাংকারে।'

বাংকারে। জঙ্গলের ভেতর। কিভাবে যেন রানা জানতো, উত্তরটা এরকম একটা কিছুই হবে।

আট

আমাজোনাস টেরিটরি, কলম্বিয়া। ১৬ই মার্চ, ১৯৬১।

ইহুদি ভীতি? তাদের দেখে পালানো? হেনেরিক মুলারের কাছে এটা সম্পূর্ণ নতুন একটা অভিজ্ঞতা। ভয় না পেয়ে উপায় কি, ইসরায়েলিরা আইখম্যানকে আর্জেন্টিনা থেকে অপহরণ করে নিয়ে গেছে। একা শুধু হেনেরিক মুলার নন, নাৎসী অপরাধী যারা বেঁচে আছে তাদের সবাই আতংকিত হয়ে পড়েছে। আরো বড় দুঃসংবাদ, ইসরায়েলে বিচার করা হবে আইখম্যানের। ওখানে তার অপরাধী বিবেক প্রদর্শন করা হবে। কোনো সন্দেহ নেই আইখম্যানকে ফাঁসিতে ঝোলাবে ইহুদিরা, কিন্তু শেষ দয়াটা দেখানোর আগে তাকে নিঙড়ে সমস্ত তথ্য বের করে নেবে। এই মুহূর্তে ঠিক সেই কাজটাই করা হচ্ছে।

মুলার ভাবতে চেষ্টা করলেন, ইসরায়েলিরা ঠিক কি পদ্ধতি ব্যবহার করছে। টরচার তো বটেই, তবে স্থূল ধরনের শারীরিক নির্যাতন নয়। সান্ত্বনা এইটুকু যে আইখম্যান তাঁর সম্পর্কে খুব বেশি কিছু জানাতে পারবে না, শুধু বলতে পারবে চার বছর আগে গেস্টাপো প্রধানকে

বুয়েনস আয়ার্সে দেখেছিল সে। এর বেশি যাতে আইখম্যান জানতে না পারে, সেদিকটায় খেয়াল রেখেছিলেন তিনি।

এক অর্থে, এটাও কম বিপজ্জনক তথ্য নয়। আইখম্যান ধরা পড়ায় যে গুজবটা এতোদিন শুধু শোনা গেছে, কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি, তা সত্যি বলে ধরে নেয়া হবে—নাৎসী হাইকমাণ্ডের সদস্যরা বিধ্বস্ত জার্মানী থেকে পালিয়েছে, তাদের মধ্যে আজও অনেকে বেঁচে আছে। সংখ্যায় খুব বেশি না হলেও, তারা প্রায় সবাই মুলারের প্রতিষ্ঠিত পথ ধরে অর্থাৎ বিশপ হুডালের সহায়তা পেয়ে নিরাপদে পালাতে পেরেছে। সন্দেহ নেই, ইসরায়েলিরা সে-কথা ইতোমধ্যে জেনে ফেলেছে, অন্তত আংশিক হলেও। হেনেরিক মুলার সম্পর্কে সবচেয়ে কম জানার কথা তাদের। আর আইখম্যান যদি সত্যি সাহসের পরিচয় দিতে পারে, তার সম্পর্কে ইহুদিরা কিছুই জানতে পারবে না।

তবে নাৎসী ধরার জন্যে শিকারীরা সদলবলে বেরিয়ে পড়েছে। দক্ষিণ আমরিকায় জার্মান উচ্চারণে কথা বলে, এমন প্রতিটি লোককে সন্দেহ করা হচ্ছে। এদিক থেকে নিজেকে ভাগ্যবান বলে মনে করেন মুলার। তাঁর আসল পরিচয় জানে শুধু সাঁতেলা লজেন, তাঁর ভায়রা। জীবন দিয়ে হলেও তাঁর পরিচয় গোপন রাখবে সাঁতেলা। প্রথম জীবনের কথা নতুন স্ত্রী বা সন্তানদের কাউকে জানতে দেননি মুলার।

ছেলেদের সাথে একটা আলোচনা হওয়া দরকার, বুঝতে পারছেন তিনি। সিটাডেল-এর কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। রলফ আর ববি প্রজেক্টটা সম্পর্কে জানে, কারণ ওদের মা চিঠিতে জানিয়েছে, বুড়ো বয়েসে তোমাদের বাবা একটা পাগলামি করছেন। বাড়ির আরাম-আয়েশ ছেড়ে কলম্বিয়ার শেষ মাথায়, অভিশপ্ত জঙ্গলের ভেতর আস্তানা তৈরি করছেন তিনি।

জনবসতি নেই, এমন বিশাল এলাকা রয়েছে দক্ষিণ আমেরিকায়। যুদ্ধের আগে থেকেই তা জানতেন মুলার। তবে সে-সব এলাকার কোনো দাম নেই। যে উচ্চতায় সহজে প্রাণ ধারণ সম্ভব, সেখানকার প্রতিটি ইঞ্চি জমিতে গত এক শো বছর ধরে চাষবাস করা হচ্ছে। ফেলে রাখা হয়েছে শুধু জঙ্গল।

কাজেই নিজের জন্যে জায়গা পাবার আশা নিয়ে পাহাড় থেকে নেমে এলেন মুলার। এলাকাটা অক্ষত নয়, পরিত্যক্ত। একবার নয়, দু'বার পরিত্যাগ করা হয়। কয়েক শো বছর আগে মিশনারিরা এসেছিল এখানে, আদিবাসী ইণ্ডিয়ানদের যীশুর মন্ত্রে দীক্ষা দিতে। শেষবার এদিকটায় জনবসতি গড়ে তোলার চেষ্টা করে রাবার শ্রমিকরা।

মিশনারিরা জঙ্গলের ভেতর একটা গির্জা তৈরি করে। কিছুদিন বেশ ভালোই কাজ হয় তাদের প্রচারণায়, কিন্তু হঠাৎ করে একদিন স্পেনের রাজা উপলব্ধি করলেন, আদিবাসীদের মধ্যে মিশনারিদের প্রভাব মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। নিজের সাম্রাজ্য থেকে তাদের সবাইকে তিনি বিতাড়িত করলেন। গোটা এলাকা খালি হয়ে গেল। কয়েক শো বছর কেটে যাবার পর জঙ্গলে আবার ফিরে এলো আদিবাসীরা, রাবার সংগ্রহ করতে এসে খুন হবার জন্যে। ব্যবসায়িক স্বার্থসিদ্ধির জন্যে ব্যবসায়ীরা প্রতিদ্বন্দ্বী দলের হাজার হাজার শ্রমিককে হত্যা করলো। আবার খালি হয়ে গেল লাস আনিমাস নামের জঙ্গলটা।

সবশেষে এলাকাটার ওপর নির্দয়তার ছাপ রাখলো প্রকৃতি। জঙ্গলটাকে ঘিরে আছে সাপের মতো একটা নদী, যেদিক থেকে এসেছে সেদিকেই মোড় ঘুরে পিছন দিকে ফিরে গেছে বহুবার, সাপ যেন নিজের লেজ কামড়াবার কসরৎ করছে। প্রতিটি বর্ষা মরশুমে ঘটেও ঠিক তাই। নিজের খাদ ছেড়ে মাটির ওপর উঠে আসে নদী, কয়েক

মাইল দূরে তৈরি করে আরেকটা জলাশয়। নতুন লেকের পানি লোনা, লেকের দু'পাশে কোনো ফসল জন্মায় না, ওদিকে কেউ আসা-যাওয়াও করে না।

একজন বিশপের সাহায্য না পেলে হেনেরিক মুলার কোনো দিন গির্জাটা খুঁজে পেতেন না। নানা দিক থেকেই তাকে একজন সুবন্ধু বলে মনে করার কারণ আছে। বিশপ লোকটা ক্রোয়াটিয়ার ডিকটেটর যুগোশ্লাভ দেশপ্রেমিক অ্যান্টন পাভেলিক-এর অনুসারী। কলম্বিয়ায় বসবাস করছে সে, গোপন করার মতো নিজেরও অনেক কিছু আছে তার। সার্বদের ওপর কম নির্যাতন চালায়নি সে।

জায়গাটা নির্বাচিত করার পর নানারকম সমস্যা দেখতে পেলেন মুলার। প্রথম সমস্যা, শ্রমিকের অভাব। চার্চের দশ মাইলের ভেতর চল্লিশজনের বেশি মানুষ নেই। তাদের মধ্যে আবার বেশিরভাগ মেয়ে-মানুষ, শিশু আর অথর্ব। সমর্থ বারোজন লোক দরকার হলে এলাকার বাইরে থেকে আমদানী করতে হবে। সবচেয়ে কাছের শহর পুয়ের্তো অ্যাসিস। লোকগুলোকে আনা হলো মোটা পারিশ্রমিক আর বোনা-সের লোভ দেখিয়ে।

ভালোভাবেই শুরু হলো কাজ। চার্চটা ইট আর পাথর দিয়ে তৈরি, নদী থেকে এক হাজার গজের মধ্যে একমাত্র ওটাই উঁচু মাটি দখল করে আছে। ভিতটা পনেরো ফুট গভীর, যথেষ্ট চওড়াও করা আছে। মাটি খুঁড়তে গিয়ে ভিতের সাক্ষাৎ পাওয়া গেল, সেই সাথে পাওয়া গেল মানুষের কংকাল, শয়তানের একজোড়া পাথুরে মূর্তি আর একটা বাদুড়।

চার্চের সামনের দিকটা নতুন করে তৈরি করলেন মুলার। বেল-

টাওয়ার যে পাথর দিয়ে তৈরি, সেই পাথরই ব্যবহার করা হলো। নতুন কয়েক সারি ঘরও তৈরি করা হলো। চার্চের মুখ থেকে পিছন দিকে তিন ফুট জায়গা খালি রাখা হলো, গোটা স্থাপনাকে ঘিরে থাকলো গভীর একটা ড্রেন। জেনারেটর থেকে পাওয়ার সাপ্লাইয়ের ব্যবস্থা থাকায় স্যাঁতসেঁতে ভাব বা শ্যাওলা জমার ভয় নেই।

তবু, চার্চের ভেতর বাতাসটা বদ্ধ বাতাস। তবে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিটি ভেনটিলেশন সম্পর্কে অভিজ্ঞ। দম আটকে কিভাবে মানুষকে মারতে হয়, তাঁর চেয়ে ভালো আর কে জানে? ঘটনাটা এখনো মুলার স্মরণ করতে পারেন—আইখম্যানকে পোলাণ্ডে পাঠিয়েছিলেন তিনি, ইহুদি-দের বিরুদ্ধে পদ্ধতিটা কি রকম কাজ করছে দেখে রিপোর্ট করার জন্যে। তাঁর জানার ইচ্ছে ছিলো, নতুন কেমিকেল, জাইক্লন বি কাজ শুরু করতে কতোটা সময় নেয়।

ইহুদিদের ওপর একের পর এক পরীক্ষা চালিয়ে গেছে আইখম্যান, কোনো সন্দেহ নেই তার ওপরও ইসরায়েলিরা এখন একের পর এক পরীক্ষা চালিয়ে যাবে। রিপোর্টে অপ্রাসঙ্গিক বিষয়গুলো লিখতো সে। কাজটা যাদেরকে দিয়ে করানো হচ্ছে, তাদের প্রতিক্রিয়ার বর্ণনা দিতো সে। গ্যাসে আক্রান্ত হয়ে যারা মারা যাচ্ছে, একেবারে শেষ দিকে, তাদের হাত-পা নাকি জীবিতদের মতোই কোমল থাকতো। মানুষের স্তূপ, একটার ওপর আরেকটা, দেয়াল বেয়ে ওপর দিকে উঠে যাচ্ছে, শুধুই উঠে যাচ্ছে বা ওঠার ব্যর্থ চেষ্টা চালাচ্ছে। নিচের লোক-গুলো চিঁড়ে-চ্যাপ্টা হয়ে মরছে। তারা হয় শিশু, নয়তো নারী, কিংবা হয়তো বৃদ্ধ। যারা ওপরে উঠতে পারে, অবশ্যই তারা শক্তিশালী—শক্তি আর কৌশল ব্যবহার করে এক কি দুই মিনিট হয়তো বাড়াতে পারে নিজেদের আয়ু।

যেন ওই দুই-এক মিনিট সত্যি গুরুত্বপূর্ণ। পঞ্চাশে না পড়লে ব্যাপারটা বিশ্বাস করতেন না মুলার। এই বয়েসে পৌঁছে জীবনের প্রতি তাঁর নতুন প্রেম জন্মায়। সুস্থ শরীরে বেঁচে আছেন তিনি, স্বাস্থ্যটা চমৎকার রেখেছেন। বিপুল টাকার মালিক। আর দশজন মানুষের মতোই নিরাপদ জীবনযাপন করছেন। নিজস্ব ব্যাপারে ক্ষমতাবানও তিনি। সুখীও বটেন। আগে কখনো জীবন আর দুনিয়াটাকে এতো ভালো লাগেনি তাঁর।

তারপর হঠাৎ একদিন আবিষ্কার করলেন, তাঁর বয়স ষাট। তখনো তিনি সুস্থ ও সবল। নিরাপত্তাও বিঘ্নিত হয়নি। কিন্তু আর্জেন্টিনা থেকে খবর এলো, আইখম্যান ধরা পড়েছে। কয়েক মুহূর্তের জন্যে একজন ইহুদি হয়ে যান হেনেরিক মুলার। যাদের শিকার করা হয়েছিল, তাদের একজন।

ইহুদিদের মতো তাকে খেদিয়ে বেড়ানো হবে, তাড়া খেয়ে ছুটবেন তিনি, জনসমক্ষে অপমানজনক মৃত্যুকে বরণ করে নিতে হবে তাঁর, এ-সব তিনি ভাবতেও পারেন না। কাজেই তিনি কাজ শুরু করলেন। নিজেকে রক্ষার কাজ। নিজেকে নাগালের বাইরে রাখার কাজ।

তিনি ছিলেন এসএস গ্রুপেনফুয়েরার, দুনিয়ার বুকে সবচেয়ে সফল সিক্রেট সারভিসের নেতা। সারাটা জীবন গোপনীয়তাকে পুঁজি করে একের পর এক সাফল্য অর্জন করেছেন। রহস্য পাহারা দিয়েছেন, রহস্য ভেদ করেছেন। সবই একটা আদর্শের স্বার্থে। সে আদর্শ আজ ইতিহাস হয়ে আছে বলে বিশ্বাস করেন তিনি।

তাঁর বিশ্বাস, থার্ড রাইখ কোনো পাপ বা অন্যায় করেনি। নাৎসীরা যা করেছে তা দুনিয়ার মঙ্গলের জন্যে, রাজনীতির স্বার্থে করেছে। তাদের প্রোগ্রাম ছিলো সুষ্ঠু ও হিসেবী। ঈশ্বর জানতেন, ইহুদিরা

দুনিয়ার বুক থেকে কোনোদিনই নিশ্চিহ্ন হবে না।

ইহুদিরা যেমন অস্তিত্ব হারাবে না, তেমনি দুনিয়াতে কিছু লোক চিরকালই থাকবে যারা অপরের হয়ে মাটি কাটবে, সেই মাটির তলায় দেয়াল তৈরি করবে নিজেদের জ্যান্ত কবর দেয়ার জন্যে। বেশিরভাগ নিগ্রো শ্রমিকদের কাজে লাগান মুলার, তাদেরকে জানান পরীক্ষামূলক-ভাবে একটা বাংকার তৈরি করতে চান তিনি। হাসতে হাসতে তাদের বলেন, বোনাসের জন্যে নিজেদের কর্মদক্ষতা দেখাতে হবে তাদের। তাই, তাঁর হাসির খোরাক যোগানোর জন্যে, হ্যাচওয়ের দরজা নিচে থেকে বন্ধ করে দিলো তারা।

ওদের ভবিষ্যৎ আগেই নির্ধারণ করেছিলেন মুলার। তুচ্ছ মানুষ ওরা, এতোদিন বেঁচে আছে এই তো ওদের ভাগ্য। এরকম মানুষ চিরকাল থাকবে দুনিয়ার বুকে, ইহুদিদের মতো, এদেরকে বিদায়ও নিতে হবে অকালে, সেটাই নাকি প্রকৃতি ও নিয়তির বিধান। নিকৃষ্ট নিপাত যাবে, টিকে থাকবে শুধু যারা শ্রেষ্ঠ।

হুইলটা ঘোরালেন মুলার। বাংকারের দরজা বন্ধ হয়ে গেল। এর-পর যা ঘটলো, বহু বছর আগে দেয়া আইথম্যানের বর্ণনার সাথে হুবহু মিলে যায়। শ্রমিকরা মারা গেল, তারপরও তাদের শরীর জীবিত মানুষের মতোই নরম থাকলো। বুনো শিকড়ের মতো জড়াজড়ি করে পড়ে থাকলো তাদের লাশ। এখানেও শক্তিশালীদের নিচে চাপা পড়লো দুর্বলরা। নিজেদের বর্জ্যের সাথে মাখামাখি হয়ে পড়ে থাকলো তারা, দেখে মনে হবে শেষ মুহূর্তে পরস্পরের সাথে লড়াই করেছে।

হেনেরিক মুলারের মতো ব্যক্তির পছন্দ-অপছন্দ আছে, আছে দায়িত্ব। ষাট বছর বয়েসে আগের সেই শক্তি আর নেই তাঁর। সাতটা লাশ বয়ে নিয়ে যাওয়া, পরিষ্কার করা, পচন ঠেকানোর জন্যে ওষুধ

মাখানো, নদীতে যাবার পথে গাছের উঁচু ডালে লাশগুলো ঝোলানো, এতো সব করতে হলে তাঁর দম ফুরিয়ে যাবে।

প্ল্যানটায় তিনি কোনো খুঁত রাখেননি। কাজ শুরু হবারও আগে কয়েক ড্রাম ঈথার আর ফরমালডিহাইড আনিয়ে রেখেছেন। দু'মাস আগে কিনে রেখেছেন গ্যাস ক্রিস্টাল। এ-সব তিনি বিশেষ একটা উদ্দেশ্যে করেছেন। তিনি জানেন, মৃত্যুর চিহ্ন দেখলে ভয় ও শ্রদ্ধার ভাব জাগে ইণ্ডিয়ানদের মনে। মাথার ওপর লাশ ঝুলতে দেখলে, কুসংস্কারের হাতে বন্দী আদিবাসীরা সিটাডেল থেকে যতোটা সম্ভব দূরে থাকবে। কাজেই চিরকাল অজানাই থেকে যাবে মুলার রহস্য।

নয়

গোটা কলম্বিয়ায় আলিজান আকরামের বাগানটাকেই সবচেয়ে নিরাপদ আর নিরিবিলি বলে মনে হয়েছে রানার। ভদ্রলোকের আতিথেয়তা ভোলার মতো নয়। তাঁকে আরো যে কারণে ভালো লাগলো রানার, ইহুদি ধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণ করার পরও সম্পূর্ণ ধর্মনিরপেক্ষ থাকার মতো উদারতা তাঁর আছে। শুধু ভদ্রলোকের চেহারা ও ব্যবহারে নয়, তাঁর বিলাসবহুল বাড়িটাতেও পবিত্র একটা পরিবেশ

লক্ষ্য করার মতো। শেষবার এখানে রানার আসার পর যা যা ঘটেছে, সে-কথা মনে রেখে আলোচনার জন্যে বাড়িটাকে আদর্শ বলতে হয়।

'কলম্বিয়ার জঙ্গল বিশাল একটা ব্যাপার,' আলিজান আকরাম বললেন। 'দেশের এক তৃতীয়াংশ। ওখানে একজন লোক লুকিয়ে থাকলে তাকে খুঁজে পাওয়া অসম্ভব ব্যাপার। হোক সে শ্বেতাঙ্গ।'

'খুঁজে তাকে আমি ঠিকই পাবো,' বললো রানা। 'সব মানুষই চিহ্ন রেখে যায়। এলাকাটা যতো দুর্গম হবে, চিহ্ন মুছে ফেলা ততো কঠিন। আমি জানি, মুয়েলারকে প্লেন বা বোটে আসা-যাওয়া করতে হয়।'

'শুধু এটুকু জানো তুমি?'

'এখন পর্যন্ত।'

মাথা নাড়লেন বৃদ্ধ। একটু পর বললেন, 'তুমি কি পারো না পারো, সে-প্রশ্ন আমি তুলছি না, রানা। রাহাতকে আমি চিনি বলে তোমাকে চেনাটা আমার জন্যে খানিকটা সহজ হয়েছে। কঠিন একটা কাজে অযোগ্য কাউকে পাঠাবে না সে। তবু, আরো তথ্য না পেলে তুমি এগোবে কিভাবে? আমি ভাবছি···।'

'জ্বী, বলুন?'

'ভিক্টর লজেনকে তুমি আটক করে কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দিয়েছো, আমাদের সরকার স্বভাবতই তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ। তুমি সাহায্য চাইলে ওরা খুশি হবে।'

সত্যি হলে কি ভালোই না হতো, ভাবলো রানা। কিন্তু একটা হেলিকপ্টারের প্রতিশ্রুতি ছাড়া আর কিছু আদায় করতে পারেনি ও। কর্নেল বেনিন মুখ হাঁড়ি করে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন।

লজেনের গ্রেফতার ডি. এ. এস., ডি. ই. এ. থেকে শুরু করে

বোগোটা আর ওয়াশিংটনের মাঝখানে যতো ইন্টেলিজেন্স সংস্থা আছে তাদের সবার জন্যে সুসংবাদ বয়ে এনেছে। কলম্বিয়ান কর্তৃপক্ষ জেরা শেষ করার পর যুক্তরাষ্ট্রে পাঠানো হবে খুনিটাকে। কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানানোর পর কলম্বিয়ান কর্তৃপক্ষ রানার সাথে এমন আচরণ শুরু করে, যেন আর কোনো কাজ বাকি নেই। 'আমি ওদেরকে মুলারের কথা বলতে পারি না,' আলিজান আকরামকে বললো রানা। 'সি. আই. এ. জানতে পারলে আমার বেঁচে থাকা দায় হয়ে উঠবে। কলম্বিয়ায় আরো শত্রু আছে আমার। ক্ষমতা থাকলে ডি. ই. এ.-র এডওয়ার্ড বার্ন এরইমধ্যে এই দেশ থেকে বের করে দিতো আমাকে।'

এই প্রথম উদ্বেগ আর অস্বস্তিবোধ করলেন আলিজান আকরাম। 'মিঃ বার্নের মধ্যে দূরদৃষ্টির অভাব লক্ষ্য করছি আমি, অকৃতজ্ঞ কিনা সে-প্রশ্ন নাহয় নাই তুললাম।'

'খাঁটি বুরোক্র্যাট,' বললো রানা। 'তার পাহারা দেয়ার সময় ধরা পড়েছে চোর, তা-ও একজন বিদেশীর হাতে। কৃতিত্বটা সেই পাবে, জানে সে। লাশগুলোর দায় চাপবে আমার ঘাড়ে। আমি আরো একটা ভালো কাজ করে ফেলি, তা সে চাইবে না।'

কিছু বললেন না বৃদ্ধ, পুলের ওপারে, লনের ওপর দিয়ে একটা পাখি উড়ে যাচ্ছে, সেদিকে তাকিয়ে আছেন তিনি। তাঁর দেখাদেখি রানাও তাকালো। পাখিটা ছোটো, কিন্তু তার লেজটা বিশাল, বহু-রঙা। ওড়ার বা গা-ঢাকা দেয়ার কাজে কিভাবে ওটা সাহায্য করে বুঝতে পারলো না রানা। লেজটা মনে হয় অলংকারবিশেষ, বিপজ্জনক একটা কিছু হিসেবে প্রদর্শন করা হচ্ছে।

বাগানে, রঙিন ফুলের সাথে মিশে গেল পাখিটা। রানার দিকে তাকালেন আলিজান আকরাম। 'ক'দিন আগে তোমাকে যখন খবর

দিলাম, ভেবেছিলাম কয়েকটা তথ্য পেলে তোমার উপকার হবে। এখন আমি অতোটা নিশ্চিত নই।'

'বলুন, প্লিজ। কি ধরনের তথ্য?'

'রাজনীতি সম্পর্কে,' তিক্ততার সাথে বললেন আলিজান আকরাম। 'আমি এক লোককে চিনি, কলম্বিয়ার রাইট-উইং পলিটিক্যাল এলিমেন্ট সম্পর্কে খোঁজ-খবর রাখে। তার জানা তথ্য হলো, কলম্বিয়ার ফ্যাসিস্ট পার্টিকে মোটা টাকা চাঁদা দেন রলফ মুয়েলার। পার্টির ছত্রছায়ায় গজিয়ে ওঠা গ্রুপগুলোও তার কাছ থেকে আর্থিক সাহায্য পায়। তিরিশের দশকে মাথাচাড়া দেয় পার্টিটা, আজও সেটার অস্তিত্ব টিকে আছে।'

'তার তথ্যের উৎস কি?' জানতে চাইলো রানা।

'তার ভাই ফ্যাসিস্ট পার্টির একজন সদস্য, রানা। সমাজে তার পরিচিতি ও সুনাম আছে, ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ, পশু-পাখির প্রতি দরদ আছে। অথচ কি যেন একটা নেই তার মধ্যে, কিসের যেন একটা অভাব।

'ইন্টেলিজেন্স সার্ভিসে, এ-ধরনের অভাব নিজেদের মধ্যে তৈরি করি আমরা। বরং না থাকাটাই খারাপ, একটা প্যাটার্ন পাবার ভয় থাকে।'

'দয়ামায়াহীন, নির্দয়-নিষ্ঠুর, অশুভ শক্তির কথা বলছো তুমি।'

সবিনয়ে মাথা ঝাঁকালো রানা। 'ইফ ইউ উইল।'

'আমি বলছি শুধু নিরেট ঘটনার কথা। হিটলারের অনুপস্থিতিতে নাৎসী পার্টিকে টিকিয়ে রেখেছেন মুয়েলার, এই লোক তাতেই খুশি। তার কথা হলো, যুদ্ধের পর এ-দেশে সমস্ত ফ্যাসিস্ট আন্দোলনের উৎস বা প্রেরণা ছিলেন মুয়েলার। ষাট দশকের প্রথম দিক পর্যন্ত!'

'তারপর কি ঘটলো ?'

'হঠাৎ সমর্থন প্রত্যাহার করে নেয়া হয়,' বললেন আলিজান আকরাম। 'পার্টিকে আর চাঁদা দেন না মুয়েলার। তবে ইতিমধ্যে অবশ্য গোটা দেশেই নিজস্ব গতি পেয়ে গেছে লা ভায়োলেনশিয়া। যে বিশৃংখল পরিস্থিতি ফ্যাসিজমের বিকাশে সার হিসেবে কাজ করে, সেটা যথেষ্টই পাওয়া গেল। আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির এ-ধরনের অবনতি আবার দেখা দিলো ক'বছর আগে, ড্রাগ ব্যবসায়ীরা যখন জঙ্গলের বন্য আইন নতুন করে চালু করলো।'

'তারপর জন্ম নিলো হোয়াইট গামা।'

'হ্যাঁ,' বৃদ্ধ বললেন। 'মুয়েলার যেন তাঁর রাজনৈতিক আদর্শ আত্মীয়দের মধ্যে উইল করে দিলেন। হোয়াইট গামাকে গড়ে তোলা হলো ফরাসী ফ্যাসিস্ট পার্টির আদলে। তাদের ইউনিফর্ম ফরাসী গেস্টাপোর সাথে মিলে যায়। ফরাসী গেস্টাপোর সশস্ত্র সদস্যরা কাঁধের ওপর কালো ব্যাজ লাগায়, এরা লাগায় সাদা কাপড়ে তৈরি গামার প্রতীক।'

'লজেনের বাবা গেস্টাপোর হয়ে কাজ করেছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই,' বললো রানা। 'রেজিস্ট্যান্স সদস্যদের খুঁজে বের করার ব্যাপারে ওদেরকে সাহায্য করে সে।'

'ওই সময় রাজনীতিতে প্রায় নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েন মুয়েলার,' বললেন আলিজান আকরাম। 'বাইরে তাঁকে খুব কমই দেখা গেছে। ব্যাপারটা আমি ভালোভাবে চেক করে দেখেছি। ষাট দশকের শুরু থেকে খুব কম লোকই তাঁকে দেখেছে। দেখেশুনে মনে হচ্ছিলো তিনি যেন নিভৃতে, শান্তিতে মরার জন্যে সব কিছু ছেড়েছুড়ে অবসর নিয়েছেন।'

'মেলে না,' বললো রানা। 'তাঁর সে চরিত্রই নয়।'

'ঠিক বলেছো,' রানার সাথে একমত হলেন আলিজান আকরাম। 'পরে তাঁর সম্পর্কে আরেকটা তথ্য পাই আমি, আর ওটাই তাঁর সম্পর্কে আমার পাওয়া শেষ তথ্য।'

'কি সেটা?' আগ্রহের সাথে জানতে চাইলো রানা।

'মুয়েলার একজন ওফিওলজিস্ট।'

'তারমানে তিনি পড়াশোনা করেছেন···।'

'সাপ সম্পর্কে, রানা,' বললেন আলিজান আকরাম। 'সাপ পোষা তাঁর একটা বিশেষ শখ। সে সময় একাধিক চিড়িয়াখানায় বিষাক্ত সাপের চাহিদা মেটান তিনি। সবগুলোই দুর্লভ প্রজাতির। তাঁর এই শখটা নতুন করে মাথাচাড়া দেয় ষাট দশকের শুরুতে, অবসর নেয়ার পর। এ-থেকে তুমি কোনো প্যাটার্ন পাচ্ছো কি?'

'কই, না,' মাথা নেড়ে বললো রানা।

'ষাটের দশকের শুরুটা ছিলো দক্ষিণ আমেরিকার নাৎসী ফেরারি-দের জন্যে আতংকজনক,' আলিজান আকরাম বললেন। 'কারণ ওই সময়ই ইসরায়েলিদের হাতে ধরা পড়ে আইখম্যান।'

'আপনি বলতে চাইছেন, ইসরায়েলিদের হাতে ধরা পড়ার ভয়েই অবসর নেন মুয়েলার?'

'হ্যাঁ,' বৃদ্ধ বললেন। 'অবশ্য তাঁর জানার কথা ছিলো না যে রাজ-নৈতিক কারণে নাৎসী ফেরারি ধরার অভিযান প্রায় বাদ দেবে ইস-রায়েলিরা।'

'তাই অবসর নিয়ে জঙ্গলে গা-ঢাকা দিলেন মুয়েলার,' বললো রানা, হঠাৎ উৎসাহ বোধ করলো ও। 'আপনি জানেন না, পানামায় আমি সারভাইভাল ট্রেনিং নিয়েছি। এলাকাটা কলম্বিয়ার মতোই। জলা-

তুমি, নদী হতে চাওয়ার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে পাহাড়ী নালা, পোকামাকড়। আর সাপ।'

মৃদু হাসলেন আলিজান আকরাম। 'মনে হচ্ছে, আরো একটা প্যাটার্ন পেয়েছি আমরা, রানা।'

'আপনাকে কে বললো, মুয়েলার একজন ওফিওলজিস্ট?'

'আরেকজন ওফিওলজিস্ট,' বললেন আলিজান আকরাম।

'আপনার কি মনে হয়,' জানতে চাইলো রানা, 'দুর্লভ প্রজাতির সাপ, যেগুলো মুয়েলার সরবরাহ করেছেন, সে-সম্পর্কে আমাদের সাথে কথা বলতে রাজি হবে লোকটা?'

'সাপ বিশেষজ্ঞরা ভারি অদ্ভুত লোক, রানা। সত্যি কথা বলতে কি, সাপ বাদে অন্য কোনো বিষয়ে তাদের কোনো আগ্রহই নেই।'

ট্যুরিস্ট রুট এল রেতিরো-র কাছাকাছি একটা স্নেক ফার্মে এলো রানা। জীবনে এই প্রথম একজন সর্প বিশেষজ্ঞের সাথে হাত মেলালো ও। ফার্মের সাপগুলো সাধারণ দর্শকদেরও দেখানো হয়। বিষ নিয়ে ব্যবসা করে, এমন লোকদেরও আসা-যাওয়া আছে। প্রচুর সাপ রয়েছে এখানে, বিশেষ করে দুর্লভ প্রজাতির সাপ দেখার জন্যেই লোকজন ভিড় করে।

কারমান আভারো খুবই রোগা, মনে হলো সামান্য ধাক্কা দিলে পড়ে যাবে। চোখ দুটো অস্বাভাবিক উজ্জ্বল, প্রতি মুহূর্তে চঞ্চল দৃষ্টিতে কি যেন খুঁজছে, সম্ভবত বিষাক্ত সাপই হবে।

'মিঃ রানা অনেক দূর দেশ থেকে এসেছেন,' আনুষ্ঠানিক পরিচয় ও কুশলাদি বিনিময়ের পর সর্প বিশেষজ্ঞ কারমান আভারোকে বললেন আলিজান আকরাম। 'তাঁর জানামতে স্থানীয় প্রজাতিগুলোই হলো

একমাত্র বিপজ্জনক সরীসৃপ, যেগুলো বিশাল সব সরকারী কমপ্লেক্সে আস্তানা গেড়েছে।'

'উনি কোন্ দেশের নাগরিক?' ভুরু কুঁচকে জানতে চাইলো কারমান আভারো।

'বাংলাদেশ ও আমেরিকার।'

'দুঃখিত। আমি বাংলাদেশী বা আমেরিকান নমুনা কখনো দেখিনি,' শুকনো গলায় জবাব দিলো সর্প বিশেষজ্ঞ।

'ভারি বিষাক্ত ওগুলো,' বললো রানা। 'খাঁচায় ভরে রাখা দরকার।'

'এখানে সাপ আমরা খাঁচায় ভরি না, মিঃ রানা। আর সব প্রাণীদের মতো ছোট্ট জায়গায় রাখলে, অসুস্থ হয়ে পড়ে সাপ, সতেজ থাকে না। রেখে দেখেছি। কিছু কিছু মারা যায়, বাকিগুলো এতো ভয় পায় যে সারাক্ষণ নিজেদের লুকোবার জন্যে ব্যস্ত থাকে। ট্যুরিস্টরাও ব্যাপারটা পছন্দ করে না।'

বিকল্প কি ব্যবস্থা করা হয়েছে, স্নেক পার্কের ভেতর দিয়ে হাঁটার সময় লক্ষ্য করলো রানা। লন বা জলাশয়ে যাবার পথে সরীসৃপদের জন্যে কোনো বাধা নেই। পরিখার চারপাশে একটা মাত্র উঁচু পাঁচিল ওগুলোকে আটকে রেখেছে। ভিজিটর বা দর্শকদের পথটা সযত্নলালিত লনের ওপর দিয়ে চলে গেছে, পথটা কয়েক শ্রেণীর মারাত্মক প্রজাতির সাপের নাগালের মধ্যে পড়ে।

'দুর্লভ জিনিসের প্রতি আগ্রহ রয়েছে মিঃ রানার,' বললেন আলিজান আকরাম। 'এক ভদ্রলোক আপনাদের এখানে দুর্লভ সাপ সরবরাহ করেছেন, সেগুলো সম্পর্ক জানতে পারলে খুশি হবেন উনি। ভদ্রলোকের নাম সিনর মুয়েলার।'

'তারমানে আপনারা জারারাকা সম্পর্কে জানতে চান।'

'তাহলে তাই।'

হঠাৎ করে রোগা-পটকা কারমান আভারোর শরীরে যেন শক্তির বান ডাকলো। প্রায় লাফিয়ে উঠলো সে, উৎসাহে আরো চকচকে হয়ে উঠলো চোখ জোড়া। 'জারারাকা দক্ষিণ আমেরিকার স্থানীয় সাপ। বিষ তো আছেই। এই প্রজাতির চল্লিশটা নমুনা আজ পর্যন্ত পাওয়া গেছে, উপ-প্রজাতির সংখ্যাও প্রায় চল্লিশ। জারারাকা মানে হলো বল্লমের মাথা। বর্ণনাটা হুবহু মিলে যায়, এই প্রজাতির সাপের মাথা ওরকমই দেখতে।'

একটা ঘাস-ঢাকা পরিখার সামনে থামলো ওরা, নিচে শুয়ে রয়েছে অলস একটা সাপ, অর্ধেক শরীর কুণ্ডলী পাকিয়ে বিকেলের রোদ পোহাচ্ছে। বর্শা আকৃতির মাথা থেকে লেজ পর্যন্ত চার ফুটের মতো লম্বা। ধূসর সবুজ আর কালো গায়ে হলুদ চেইন-এর মতো দাগ। 'আপনারা একটা জারারাকা দেখছেন,' বললো কারমান আভারো।

এ-ধরনের প্রাণী যাদের পছন্দ, এটাকে তার সুন্দর বলেই মনে হবে, ভাবলো রানা।

'এটার শরীর আর মাথা অন্য প্রজাতির সাপের চেয়ে একটু বেশি মোটা। খুব দ্রুতগতি নয়, তবে হিংস্র। ফণাটাও খুব বড়, বিষও প্রচুর।'

'এটা কি ওই ভদ্রলোক সাপ্লাই দিয়েছেন, সিনর মুয়েলার?' প্রশ্ন করলো রানা।

'এটা ছিলো তাঁর পাঠানো শেষ সাপ,' বিষণ্ণ সুরে বললো আভারো। 'প্রায় দু'বছর হলো সিনর মুয়েলারের কাছ থেকে আর কোনো সাপ আমি পাইনি। এটা যদি মারা যায়, আমার কাছে আর কোনো নমুনা থাকবে না।'

'কেন তিনি সাপ পাঠানো বন্ধ করলেন ?'

'কি জানি,' আবার দুর্বল হয়ে পড়ার সাথে সাথে আকারেও যেন ছোটো হয়ে গেল আভারো। 'কয়েকছর ধরে বিভিন্ন প্রজাতির নমুনা সাপ্লাই পাবার পর সিনর মুয়েলারকে চিঠি লিখে জানতে চাইলাম, তাঁর এই আবিষ্কারের একটা নাম তিনি দিতে পারেন কিনা। উত্তরে তিনি লিখলেন, ওটাকে সিটাডেলিস বলে ডাকা যেতে পারে। বথরপস জারারাকুকু সিটাডেলিস। সাও পাউলো-র ইন্সটিটিউটে আবেদন জানালাম, তারা যেন নমুনাটাকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দেয়। সাথে সাথেই তা দিলো ওরা। তাঁর সাফল্যের খবরটা চিঠি লিখে জানালাম, কিন্তু সিনর মুয়েলার উত্তরে যা বললেন, মনটা খারাপ হয়ে গেল আমার।'

'কেন ?'

'তাঁর জবাব পড়ে মনে হলো, তাঁকে সম্মানিত করায় তিনি বেজার হয়েছেন। সেই থেকে তিনি আর আমাকে কোনো নমুনা পাঠান না।'

ফেরারি একজন লোকের আচরণ এরকমই হবার কথা, ভাবলো রানা। এমন একটা শখ তিনি ধরে রাখতে পারেন না, যেটা তাঁর পরিচয় প্রকাশ করে দিতে পারে। রানার মনে পড়লো, নাৎসী অভিধানে সিটাডেল শব্দটার গুরুত্ব আছে। যুদ্ধের শেষ দিকে, বার্লিনে, রাইখ চ্যান্সেলারির নিচে অনেকগুলো বাংকারের সমষ্টিকে সিটাডেল বলা হতো। 'সিটাডেলিস এতো দুর্লভ কেন ?' জানতে চাইলো ও।

'কখন একটা জিনিসকে দুর্লভ বলা হয় ? ওটার মতো আর খুব কমই আছে, তাই। বথরপস জারারাকুকু সিটাডেলিস-এর গঠন, রঙ আর আকৃতি আলাদা, তার কাজিনদের সাথে মেলে না। কাছাকাছি

অন্য প্রজাতির চেয়ে ওটার বিষও অনেক বেশি মারাত্মক।'

'কামড়ালেই মানুষ মারা যায়?'

'যদি না সাথে সাথে অ্যান্টিডোট দেয়া হয়,' কারমান আভারো বললো। 'এমনকি সদ্যোজাত সিটাডেলিসের বিষও মারাত্মক। বিষটা রেড ব্লাড সেলের দেয়াল ধ্বংস করে দেয়। অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করে মারা যায় ভিকটিম।'

দাগ কাটা সাপটার প্রতি ভয় মেশানো শ্রদ্ধা দ্রুত বেড়ে গেল রানার। 'বিশেষ করে এই প্রজাতির সাপের কামড় খেয়ে বাঁচার জন্যে অ্যান্টিডোট সেরাম কি কিনতে পাওয়া যায়, সিনর আভারো?' জিজ্ঞেস করলো ও।

'তা কেন পাওয়া যাবে না,' খুশি হয়ে উঠলো আভারো। 'তবে দাম খুব বেশি পড়বে।'

'যে-কোনো ফি দিতে রাজি আছি আমি,' বললো রানা, 'এই সাপটাকে যদি তার আদি ও আসল ঠিকানায় দেখতে পাই।'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে কারমান আভারো বললো, 'সেরাম সংগ্রহের চেয়ে সেটা অনেক কঠিন হবে, মিঃ রানা।'

'কেন, সাপটা কোত্থেকে এসেছে সেটা তো আপনার জানার কথা।'

'তা শুধু একা সিনর মুয়েলার জানেন,' বললো আভারো। 'আমি স্রেফ আন্দাজ করতে পারি।'

'প্লিজ।'

'আমি জানি সাপটা পাঠানো হয়েছে লেটিসিয়া থেকে, তবে লেটিসিয়া থেকে আরো অনেক জিনিস আসে যেগুলো লেটিসিয়ায় পাঠানো হয় অন্য কোথাও থেকে,' বলে থামলো আভারো, ড্রাগ চোরাচালান সম্পর্কে বলার সময় আর সব কলম্বিয়ানরা যেমন থামে। 'শিপমেন্ট-

গুলোয় কোনো কাস্টমস স্ট্যাম্প ব্যবহার করা হয় না, কিন্তু তার মানে এই নয় যে ওগুলো অন্য কোনো দেশ থেকে পাঠানো হয়নি। লেটিসিয়া ট্রাপিজিয়ামকে তিন দিক থেকে ঘিরে আছে ব্রাজিল আর পেরু। আমাজন-এর দিকে কলম্বিয়ার একটা জানালা ছাড়া কিছু নয় ওটা।'

'আপনি বলতে চাইছেন তিনটের যে-কোনো একটা দেশ থেকে আসতে পারে সিনর মুয়েলারের সাপটা।'

'ব্যাপারটা সেরকমই মনে হয়,' বলে কি যেন চিন্তা করলো আভারো। 'তবে আমার ধারণা, সীমানাটা রিয়ো কাকুয়েটার চেয়ে বেশি উত্তরে হবে না, কারণ এই প্রজাতির সাপ বিষুব রেখা ছাড়িয়ে খুব বেশিদূর যায়নি। দক্ষিণ সীমানা হিসেবে আমি রিয়ো নাপো আর রিয়ো আমাজন পর্যন্ত যাবো, তার বেশি নয়। ওই সীমানার নিচের এলাকাগুলোয় অন্য আরেক প্রজাতির সাপ রয়েছে, মাসুরানা। জারারাকুকুদের যম ওগুলো, নিজেদের এলাকায় প্রায় নির্বংশ করে ফেলেছে।'

যথেষ্ট সাহায্য করলো কারমান আভারো। জঙ্গলটা কয়েকশো মাইল ছোটো হয়ে এলো রানার জন্যে। 'আপনি কি আর কিছু বলতে পারেন আমাকে, সিনর আভারো?'

'আপনি যদি জারারাকুকু ধরতে চান, আপনাকে আমি অত্যন্ত সাবধান হতে বলবো,' বললো আভারো, সাপ সম্পর্কে ভালো ধারণা আছে তার।

দশ

হেলিকপ্টার দেয়ার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করলেন কর্নেল বেনিন, কিন্তু রানার হাতে গর্ডন উইন্টারকে ছেড়ে দিতে ঘোর আপত্তি জানালেন। মিনিস্টারের অফিস থেকে এ-ব্যাপারে প্রশ্ন তোলা হয়েছে। লজেনকে গ্রেফতার করা হয়েছে বটে, কিন্তু তার দেয়া হুমকিটাকে ভয় পাচ্ছে সরকার—বাহাত্তর ঘণ্টার মধ্যে কার্টেল নাকি তার ঘোষিত সরকার বিরোধী হরতাল পালন শুরু করবে। কাজেই উইন্টারকে এমন কোথাও যেতে দেয়া চলে না যেখান থেকে তার পালিয়ে যাবার আশংকা আছে। সেরকম কিছু ঘটলে সরকারের দুর্বলতা প্রকাশ পাবে।

তবে বেনিন এমন একজন মানুষ, যিনি তাঁর ঋণ শোধ করতে চান। লজেন প্রসেসিং ল্যাবে হানা দিয়ে ও লজেনকে গ্রেফতার করে গোটা কলম্বিয়ার সবচেয়ে জনপ্রিয় কর্নেল হয়ে উঠেছেন তিনি। তাঁর পদোন্নতির কথাও ঘোষণা করা হয়েছে। রাজনীতিতেও তাঁর একটা মর্যাদাপূর্ণ আসন নিশ্চিত হতে যাচ্ছে, বিশেষ করে দেশের প্রধান দুটো দলই যখন তাঁকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে। জাস্টিস ডিপার্টমেন্টের আপত্তিটা খণ্ডন করা হলো, এরপর আর কর্নেলের সহযোগিতা পেতে রানার

কোনো অসুবিধে হলো না। তিনি এমনকি লেটিসিয়া ডি. এ. এস. প্রধানকে উদ্দেশ্য করে লেখা একটা চিঠিও দিলেন রানাকে, তাতে তাকে নির্দেশ দেয়া হলো রানার সাথে পূর্ণ সহযোগিতা করার জন্যে।

আলিজান আকরামকে সাথে নিয়ে সর্প বিশেষজ্ঞর সাথে কথা বলার চব্বিশ ঘণ্টা পর, মেডিলিনের হাসপাতাল থেকে উইন্টারকে মুক্ত করে একটা সামরিক আকাশযানে চড়ে বোগোটার উদ্দেশে রওনা হয়ে গেল রানা। ওখানে পৌঁছে একটা বেল ২০৫ পেলো ও, চেহারা দেখে মনে হলো কোনো তেলখনি থেকে সদ্য ফেরত এসেছে ওটা। হেলিকপ্টারটার বৈশিষ্ট্য হলো, গায়ে কোনো সামরিক চিহ্ন নেই। আগেরটার মতো অত শব্দও করে না।

তবে সামান্য খুঁতখুঁতে ভাব থেকেই গেল রানার মনে। এবার অতিরিক্ত কোনো পাইলট থাকছে না। লেফটেন্যান্ট নাসাউকে অন্য একটা অ্যাসাইনমেন্টে পাঠানো হয়েছে, প্রয়োজনের সময় অন্য কোনো পাইলটও পাওয়া গেল না। কর্নেল বেনিনকে রানা বোঝালো, তাঁর চিন্তার কিছু নেই, কারণ নিজেও একজন দক্ষ পাইলট ও। কর্নেল প্রশ্নটা না তুললেও, রানা নিজে জানে যে, হাত ও মাথার ব্যথা পুরোপুরি না সারায় হেলিকপ্টার চালাতে সমস্যা হবে ওর। কিন্তু কি আর করা।

ব্যাক-আপ পাইলট নেই, এটা উইন্টারের জন্যে কোনো উদ্বেগের ব্যাপার তো নয়ই, বরং খুশির খবর। তার ধারণা, সে বাদে অন্য কেউ চালালে হেলিকপ্টারটা অ্যাক্সিডেন্ট করতে বাধ্য। বোগোটা ছাড়ার খানিক পর পাইলটের সীটে বসার জন্যে রীতিমতো কড়া ধমক দিয়ে কন্ট্রোল থেকে তাকে সরাতে হলো রানার।

পাথরের মতো নিচের দিকে খসে পড়লো ওরা। এ-ধরনের হেলি-

কপ্টার আগে খুব একটা চালায়নি রানা, অনেকদিন পর হাতে পড়ায় যা শিখেছিল তা-ও প্রায় ভুলে গেছে, তাছাড়া এটা ফিক্সড-উইং এয়ারক্রাফটও নয়। মাত্র দেড় সেকেণ্ডের মধ্যে অনুশোচনায়, বিব্রত-বোধে ও ভয়ে আকুল হতে হলো ওকে।

শুধু খসে পড়লো না, বিরতিহীন ডিগবাজি খেতে শুরু করলো হেলিকপ্টার। কণ্ট্রোল-এর চারটে সিস্টেমের যে-কোনো একটার সাহায্য নিয়ে যখনই পরিস্থিতি সামাল দিতে গেল, ফলাফল হলো তাৎক্ষণিক ও আগের চেয়ে মারাত্মক। সিকলিক-এ কোনো পরিবর্তন আনতে হলে একইসাথে অন্যান্য আরো অনেক বোতাম টিপতে হবে, তারপর অ্যাডজাস্ট করতে হবে রাডার পেডাল। থ্রটলের সাথে সমন্বয় ঘটাতে হবে লিফট-এর, লিফটের সাথে থ্রাস্ট-এর, থ্রাস্টের সাথে ইঅ্যা-র, ইঅ্যার সাথে ঈশ্বরের। অনেক ভুল-ভাল করলো রানা, তার ওপর আচ্ছন্ন একটা ভাব গ্রাস করে রাখলো ওকে।

কোনো সাহায্য না করে উইণ্টার শুধু তারস্বরে চিৎকার করলো। রানার ফ্লাইট স্যুটের ভেতর সচল হলো ঘামের অনেকগুলো ধারা। তারই সাথে পাল্লা দিয়ে উইণ্টারের চিৎকার অর্থাৎ সশব্দ হাসি বাড়তে লাগলো। কণ্ট্রোল ফিরিয়ে নিতে রাজি নয় সে। দেখতে পাচ্ছে একটা সবুজ ঘাস ঢাকা মাঠে পতন ঘটতে যাচ্ছে ওদের, বিরাট বৃত্ত রচনা করে নেমে যাচ্ছে চপার, কিন্তু ভুলেও কণ্ট্রোলের দিকে একবার হাত বাড়ালো না। বাধ্য হয়ে অনুরোধ করতে হলো রানাকে।

'আই টেক ওভার,' সম্ভাব্য শেষ মুহূর্তে বললো উইণ্টার।

শেষ পর্যন্ত ওরা বিধ্বস্ত হলো না।

'সত্যি কথা বলতে কি, আপনি আমাকে মুগ্ধ করেছেন, জেনারেল,' গম্ভীর সুরে বললো উইণ্টার।

তার দিকে তাকালো না রানা।

নিচে গাঢ় ছায়া চরছে, তাদের ওপর দিয়ে আড়াআড়িভাবে ছুটছে চপার। 'এটা ফিক্সড-উইং টাইপ হলে আরো দ্রুত পড়তো,' বললো উইন্টার। 'দেখে যা বুঝলাম, দু'পাঁচ ঘণ্টা সময় দেয়া হলে ভালো পাইলটদের তালিকায় নাম লেখাতে পারবেন আপনি। আপনার হাত আর চোখের কোঅর্ডিনেশন চমৎকার। তবে ফুট কোঅর্ডিনেশনে কিছুটা গলদ আছে।'

নিরাপদ আকাশে অর্থাৎ ওপরদিকে দ্রুত উঠে যাচ্ছে চপার। 'এবার আমাকে বলবেন, কোথায় আমরা যাচ্ছি?' জানতে চাইলো উইন্টার।

'দিকটা তোমাকে আগেই জানিয়েছি,' বললো রানা।

'তাই কি?' চপারের নাক নিচের দিকে তাক করলো উইন্টার, স্পীড হঠাৎ করে বেড়ে গেল। হঠাৎ করেই বললো সে, 'ওভার টু ইউ।'

কন্ট্রোল হাতে পেয়ে প্রথমেই মাথা ঠাণ্ডা রাখলো রানা। আগের মতোই ডিগবাজি খেতে শুরু করলো চপার, কিন্তু এবার তাড়াহুড়ো না করায় সংশ্লিষ্ট বোতামগুলোয় ঠিকমতোই চাপ দিতে পারলো ও। সিধে হলো ওদের আকাশযান।

'আপনি আমাকে লজ্জায় ফেলে দিলেন,' অভিযোগের সুরে বললো উইন্টার। 'দু'পাঁচ ঘণ্টা নয়, মাত্র দু'পাঁচ সেকেণ্ডের মধ্যে শিখে নিলেন!'

সম্পূর্ণ অন্য প্রসঙ্গে কথা বললো রানা, 'আমরা লেটিসিয়ায় যাচ্ছি।'

'হুঁহুঁ, হেডিং আর ফুয়েল লোড দেখে আগেই আন্দাজ করেছিলাম,' বললো উইন্টার। 'কেন বলবেন?'

'আমরা মুয়েলারকে ধরতে যাচ্ছি।'

'মাটি দেয়ার অনুষ্ঠানে দেখা সেই বুড়ো ভদ্রলোককে ?'

'হ্যাঁ।'

'বুড়ো একজন মানুষকে ধরার জন্যে এতো সব আয়োজন, ঠিক যেন মিলছে না,' বললো উইন্টার। 'তবে ইনি সম্ভবত বিশেষ শ্রেণীতে পড়েন।'

'তা বলতে পারো।'

'কে উনি ?'

'অ্যাডলফ হিটলার।'

হেসে উঠলো উইন্টার। 'করুন, ঠাট্টা করুন।'

'খুব একটা ভুল বলিনি। শোনো, তোমাকে দিয়ে আমি কয়েকটা কাজ করাতে চাই।'

'বান্দা হাজির, জেনারেল।'

'আকাশে আমরা তিন ঘণ্টা থাকবো, তাই না ?'

'কমবেশি।'

'যতোটা সম্ভব কাছাকাছি যেতে চাই আমি,' বললো রানা।

'চপার নিয়ে খুব কাছাকাছি যাওয়ার মানে কি, আপনি ভালোই বোঝেন। আপনার দ্বারা কতোটুকু সম্ভব আমি জানি না।'

'লেটিসিয়ায় পৌঁছে, আমি চাই, মুয়েলার সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করবে তুমি। ওখানে তোমার অনেক লোকের সাথে যোগাযোগ আছে, তাই না ? আমাদের জানতে হবে ঠিক কোথায় আছেন তিনি।'

'কাজটা করবো, কারণ আমি আপনার ভক্ত হয়ে পড়েছি।'

'কাজটা তুমি করবে, কারণ না করলে অনেক বছর জেল খাটতে হবে তোমাকে।'

'স্বভাবতই এবার তাহলে আমার পরিণতি [illegible]ঙ্গটা ওঠে,' তাড়া-

তাড়ি বললো উইন্টার।

'লেটিসিয়ায় তোমার সাফল্যের ওপর নির্ভর করবে ব্যাপারটা। জোরালো লাথি খেয়ে হয়তো অনেক দূরে ছিটকে পড়বে তুমি, আমার চোখের আড়ালে।'

'আপনি কি আমার মুক্তির কথা বলছেন?'

'ঠিক ধরেছো,' বললো রানা, যদিও গর্ডন উইন্টার সম্পর্কে নিশ্চিত-ভাবে এখনো কিছু জানে না ও। তাকে ছেড়ে দিলেও কি সে নির্বি-বাদে চলে যাবে? বা চলে গিয়ে কার্টেলের সাথে আবার হাত মেলাবে না?

হাইল্যাণ্ড ছেড়ে সমতল প্রান্তরের ওপর চলে এলো ওরা। সবুজ আর খয়েরি সমতল প্রান্তর যেন দূর অসীমে মিলিয়ে গেছে। পাম গাছের সাথে জলাশয়গুলো পরিষ্কার চেনা গেল হেলিকপ্টার থেকে, খানিক পর পর খুদে স্ট্যাম্পের মতো দেখালো খামারগুলোকে। কয়েক জায়গায় গরু-ছাগলের বড়সড় পাল দেখা গেল।

কয়েকবারই কন্ট্রোল হাতে নিলো রানা, প্রতিবার আগের চেয়ে ভালো চালালো হেলিকপ্টার। কোথাও ভুল হলে শুধরে দিলো উইন্টার।

সান হোসে দে গুয়েভার ছোট একটা শহর, শহরের বাইরে সরু একটা স্ট্রিপে নামলো ওরা ফুয়েল নেয়ার জন্যে। আকাশে ওঠার খানিক পর নিচে শুরু হলো জঙ্গল, সেই দিগন্ত পর্যন্ত বিস্তৃত।

আরো সামনে নিচু মেঘ দেখা গেল। ঝড়-বৃষ্টির আশংকা করলো উইন্টার।

জঙ্গলের ভেতর জনবসতির কোনো চিহ্ন দেখা গেল না। রূপালি

একটা লেক দেখলো ওরা, এরকম আরো আছে বলে আন্দাজ করলো রানা. লেকের কিনারায় বা আশপাশে এতো বেশি গাছ যে নিচে দৃষ্টি চলে না, পায়ে হাঁটা সরু পথ বা ঘর-বাড়ি যদি থাকেও, নজরে পড়লো না।

নদীগুলোও দেখতে পেলো ওরা, তাও এতো সরু যে পলকের জন্যে চোখে পড়লো। কয়েকটা নদীর নাম বলতে পারলো উইন্টার—ভপেস, আপাপোরিস, মিরিটিপারনা। তারপর ওরা চলে এলো সবচেয়ে বড় নদীটার ওপর। অনেক চওড়া বলেই গাছপালার ফাঁকে দেখা গেল ওটাকে। নদীর নাম কাকুয়েটা।

কারমান আভারো যে সীমানাগুলো চিহ্নিত করে দিয়েছে, কাকুয়েটার অপর তীর তার একটা। এখান থেকে শুরু হলো সাপের রাজত্ব। সভ্যতা থেকে অনেক দূরে চলে এসেছে ওরা। নদীটা ছাড়া আর কোনো সূত্র দেয়নি আভারো। এ-ধরনের জঙ্গলে যদি কোনো লোক লুকিয়ে থাকে, আর সে যদি পানির উৎসগুলো এড়িয়ে যায়, অন্যান্য সূত্র ছাড়া তাকে খুঁজে বের করা প্রায় অসম্ভব একটা কাজ।

সাথে করে উইন্টারকে নিয়ে আসার সেটাই কারণ রানার। প্রয়োজনীয় তথ্য একমাত্র সে-ই দিতে পারে ওকে। মনে মনে ঠিক করে রেখেছে, লোকটা সাহায্য করলে তাকে মুক্তি দেবে ও। এসপিওনাজ জগতের দস্তুরই এই। কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলতে হয়, অনেক সময় ক্ষমা করতে হয় শত্রুকে। কর্নেল বেনিন ব্যাপারটা বুঝবেন। এডওয়ার্ড বার্ন বুঝবে না।

রানার বিরুদ্ধে অভিযোগ করার এই সুযোগটা ছাড়বে না সে।

তিন ঘণ্টা পর রিয়ো পুটমাইও পেরোলো ওরা, নামতে শুরু করলো

লেটিসিয়া ট্রাপিজিয়ামের দিকে। জায়গাটাকে মাটির একটা বড় পা বলা যেতে পারে, আমাজনের ওপর দখল কায়েম করার সুযোগ দিয়েছে কলম্বিয়াকে। আমাজন অববাহিকায় রাবারের চাষ যখন খুব ভালো হচ্ছে, পেরুর সাথে এই জায়গাটার দখল নিয়ে তুমুল যুদ্ধ বেধে যায় কলম্বিয়ার। প্রতিযোগিতা আর সিনথেটিক-এর আগমন ঘটায় রাবার ব্যবসা প্রচণ্ড মার খেলো, তবু কলম্বিয়া সরকার পেরুকে জায়গাটা ফেরত দিলো না। তার বদলে ওটাকে স্মাগলারদের স্বর্গ হিসেবে গড়ে তোলা হলো।

'লেটিসিয়ায় সম্ভাব্য সব আপনি পাবেন,' বললো উইন্টার। 'অরিজিনাল পিকাসো চান? অটোমেটিক রাইফেল? হীরা, চুনি, পান্না? কিংবা জাগুয়ারের চামড়া দরকার? অথবা জ্যান্ত একটা জাগুয়ার? রাস্তায় দাঁড়িয়ে স্রেফ অর্ডার দিতে হবে আপনাকে, জেনারেল। তারপর হোটেলে অপেক্ষা করুন। খুব বেশি অপেক্ষা করতে হবে না, অর্ডারের জিনিস আপনার দোরগোড়ায় পৌঁছে যাবে।'

'কোকাও,' বললো রানা।

'কোকাও, অবশ্যই,' বললো উইন্টার। 'শহরটার মধ্যে দিয়ে টন টন কোকা পাচার হয়। আমাজনের আশপাশে রয়েছে হাজার হাজার খাদ আর নদী। যে-কোনো জায়গায় পৌঁছে দেবে আপনাকে।'

'কিনবো আমরা,' বললো রানা, 'তবে কোকা নয়। তুমি চারপাশে প্রচার করে দাও যে আমরা সিটাডেলিস খুঁজছি। আমাদের পরিচয়, আমরা প্রাণীবিজ্ঞানী। বথরপস জারারাকুকু সিটাডেলিস খুব দরকার আমাদের। মনে থাকবে তো নামটা?'

মাথা নাড়লো উইন্টার। 'না।'

'লিখে দিই।'

'তাতে কোনো লাভ হবে না,' বললো উইণ্টার। 'সাপের প্রতি আমার অদ্ভুত একটা ঘৃণা আছে। ফলে সাপ সংক্রান্ত যে-কোনো তথ্য মনে গেঁথে নিতে পারি না। এ-ব্যাপারে আমাকে আপনি মানসিক-প্রতিবন্ধী বলতে পারেন।'

'তোমার ভুলে গেলে চলবে না যে তোমাকে আমার সাথে আসতে বাধ্য করা হয়েছে, মিঃ গুসানো।'

'আপনি তাহলে এই নামে ডাকবেন আমাকে?'

'তোমার পাসপোর্টের নাম,' বললো রানা। 'জুয়ান গুসানো, জাতীয়তা ব্রাজিলিয়ান।'

'আমার,' বললো উইণ্টার, 'পাসপোর্ট?'

'ঠিক।'

'আমি আপনার হুকুম মানতে বাধ্য, জেনারেল।'

'নামটা ভুলো না তাহলে,' বললো রানা।

'না।'

আমাজন নদীর ওপর চলে এলো হেলিকপ্টার। ফুলেফেঁপে থাকা বিশাল একটা নদী, তবে উৎস থেকে অনেক দূরে চলে আসায় আকারে ওটা ছোটো হবে বলেই ধারণা করলো রানা। ধারণাটা মিথ্যে প্রমাণ হলো। পুর্টো নারিনো-র কাছে নদীটাকে প্রথম দেখেছিল, দু'মাইল চওড়া, তীর থেকে খানিক দূরে একটা দ্বীপ ছিলো। পানির গতিবেগও ছিলো তীব্র। পাঁচশো ফুট উঁচু থেকেও ফুলেফেঁপে ওঠা বান অনুভব করতে পেরেছে ও, ঠিক পালস অনুভব করার মতো। বিপুল জলরাশির এই উচ্ছ্বাস ও বান শতো শতো মাইল দূরের পাহাড়গুলোকে ছুঁয়ে এগিয়ে গেছে, প্রভাবিত করছে সামনের হাজার হাজার মাইল এলাকা।

ঠিক কোকার মতো। আন্দেজের পুব ঢালে, পেরুভিয়ান প্রদেশে, যেখানে আমাজন জন্ম নিয়েছে, সে-জায়গাটাও গভীর জঙ্গলে ঢাকা, সেই জঙ্গলে প্রচুর কোকা পাতা জন্মায়। আমাজন আর তার শাখা-প্রশাখা দিয়ে বিভিন্ন এলাকায় রপ্তানি হয়ে যায় কোকেন। ড্রাগ-এর সাথে আসে প্রকৃতির অন্য আরেকটা আবর্জনা, স্মাগলার।

কাজেই লেটিসিয়া এয়ারপোর্ট স্রেফ একটা স্ট্রিপ নয়, পুরোদস্তুর সার্ভিস টার্মিনাল। প্রতিদিন অনেকগুলো কমার্শিয়াল ফ্লাইট রয়েছে, দেশের অভ্যন্তরে আসা-যাওয়া করছে। দুনিয়ার অন্য কোনো ছোটো শহরের এয়ারপোর্টে এতো বেশি প্লেন পার্ক করা অবস্থায় দেখেনি রানা। দামী বা নতুন নয় একটাও, তবে সব ক'টা উড়তে পারে। বৃষ্টির পর ঝলমলে রোদে চকচক করছে ওগুলোর গা।

সী-লেভেলে তাপমাত্রা বিষুবীয় এলাকার মতোই। শুধু গরম নয়, ভ্যাপসা একটা গন্ধের সাথে ওদেরকে আক্রমণ করলো রাজ্যের মাছি আর পোকা। শূকরগুলো স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ওরা যেন ভিয়েতনাম বা কম্বোডিয়ায় এসে পড়েছে। তবে দক্ষিণ-পুব এশিয়ায় ঠিক আমাজনের মতো পানিপথ নেই। নদীর রঙ খয়েরি, কুয়াশা উঠছে পানি থেকে, ক্ষিপ্রগতি স্রোতে এমন একটা আত্মবিশ্বাসী ভাব, আমাজন যেন জানে যে তার কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী নেই। লম্বা পা নিয়ে সাদা এক ঝাঁক পাখি দ্বীপ লক্ষ্য করে উড়ে যাচ্ছে। বাঁক ঘুরে এগোলো একটা হাইড্রোফয়েল। এমন কিছু দেখলো না রানা যার ভেতর বিশেষ কোনো বৈশিষ্ট্য আছে।

লেটিসিয়া শহরটাও রানার মনে কোনো ছাপ ফেলতে পারলো না। শহরটা নদীর করাল গ্রাসে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়নি তিনশো ফুট উঁচু বাঁধ থাকায়। বাকি তিন দিকে ঠেলে সরিয়ে দেয়া হয়েছে বনভূমিকে,

জঙ্গলের কিনারায় সাদা রঙের বাড়ি-ঘর দেখা গেল। তেমন কোনো নির্মাণ কৌশল চোখে পড়লো না, দৃষ্টি কাড়তে পারে এমন কোনো দালানও নেই শহরে। সভ্যতা যেন এখানে শুরু হতে গিয়েও হয়নি।

লেটিসিয়া দোকানের শহর। ফ্রি পোর্টটা আসলে অন্য কোথাও যাবার প্ল্যাটফর্ম হিসেবে ব্যবহার হচ্ছে। নদীর কিনারায় সার সার বোট হাউস, সবগুলোর ভেতরে আধুনিক সী-প্লেন দেখা গেল। তীর ঘেঁষে নোঙর ফেলেছে সব ধরনের জলযান, হাইপাওয়ারড বোট থেকে শুরু করে বড়সড় ক্রুজার-ও আছে।

উইন্টারের প্রিয় একটা হোটেলে উঠলো ওরা। আলাদা আলাদা বাংলো, শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত, বিল হবে মার্কিন ডলারে। ডি. এ. এস. এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করার কথা একবার ভাবলো বটে রানা, তবে সিদ্ধান্ত নিলো তার দরকার নেই। উইন্টারের সাহায্য নিয়ে যা করার একাই করবে ও। অতি সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট হবার আশংকা।

'লেটিসিয়া শহরের নিজস্ব একটা ইউনিফর্ম আছে,' বললো উইন্টার। 'সেটা না পরলে ক্ষতি নেই, তবে পরলে লাভ আছে। সুন্দর একটা লেদার ব্যাগ কাঁধে ঝোলাতে হবে, আর পরতে হবে লেস লাগানো সাদা শার্ট।'

'ডিলার সাজার দরকার কি আমাদের?' জিজ্ঞেস করলো রানা। 'আমরা তো প্রাণীবিজ্ঞানী।'

'ওরা যেন সে-কথা বিশ্বাস করবে!' এমন সুরে বললো উইন্টার, যেন ওর কণ্ঠস্বরই লেটিসিয়ার সবচেয়ে শুকনো জিনিস। 'বিশেষ করে ভিক্টর ধরাশায়ী হবার পর। দু'জন সন্দেহজনক বিদেশী নানা প্রশ্ন নিয়ে চারপাশে ঘুর ঘুর করছে। আমাদের শোল্ডার ব্লেডের মাঝখানে কেউ যদি বুল'স আই সেঁটে দেয়, টার্গেট প্র্যাকটিস করার জন্যে, একটুও

অবাক হবো না আমি। গায়ে ইউনিফর্ম না থাকলেও ওরা পড়তে পারবে, আমাদের কপালে লেখা রয়েছে ডি. ই. এ.।'

'রাস্তায় তো কাউকে সশস্ত্র বলে মনে হলো না,' বললো রানা। 'দু'একজনের সাথে হ্যাণ্ডগান থাকলেও থাকতে পারে, বড়জোর। তবে, তুমি যদি মুয়েলার সম্পর্কে কিছু সংগ্রহ করতে পারো, যেমন খুশি সাজতে আমার আপত্তি নেই।'

'এই কথাটাই শুনতে চেয়েছিলাম, জেনারেল,' বললো উইন্টার। 'ওভার টু মি, রাইট?'

'ওভার টু ইউ।'

তবে মুহূর্তের জন্যেও উইন্টারকে চোখের আড়াল করলো না রানা। হোটেল বারে এক ল্যাটিন দম্পতির সাথে কথা বললো উইন্টার, একই জায়গায় কথা বললো অপর এক লোকের সাথে। লোকটা ইউরোপিয়ানের মতোই দেখতে, কাঁধে ঝুলছে একটা স্নেকস্কিন ব্যাগ। গায়ের রঙ রোদে পোড়া তামাটে। উইন্টারকে চেনে বলেই মনে হলো, দেখা হওয়ায় বিস্মিত বা আতংকিত হয়নি। শুভেচ্ছা জানিয়ে বিদায় নেয়ার আগে উইন্টারের সাথে বিশ মিনিট কথা বললো সে।

হোটেল থেকে বেরিয়ে নদীর কিনারায় চলে এলো উইন্টার, তার পঞ্চাশ গজের বেশি কাছে এলো না রানা। একটা বোটে চড়লো উইন্টার, মাথার কাছে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়লো। তার চেয়ে দ্বিগুণ আকৃতির এক লোক এগিয়ে এলো। শুয়েই থাকলো উইন্টার। মিনিট দশেক কথা বললো ওরা। বোট থেকে নেমে দুই এঞ্জিনবিশিষ্ট আরেকটা বোটে চড়লো উইন্টার, গোলগাল আরেক লোকের সাথে আলাপ শুরু করলো।

সারাক্ষণ উদ্বেগের মধ্যে থাকলো রানা। বন্ধু আর বোট নিয়ে উই-

ন্টার যদি পালাতে চেষ্টা করে, ওদেরকে ধরতে কতোক্ষণ সময় লাগবে ওর? আরেকটা বোট যদি পাওয়াও যায়, ধাওয়া করে লাভ হবে কি? নদীতে তীব্র স্রোত রয়েছে, ঢেউগুলো শক্তিশালী, স্রোতের সাথে ভেসে যাচ্ছে বিরাট আকারের আবর্জনা—গাছ, ঘাসসহ মাটির চাপড়া ইত্যাদি। ধাওয়া করে লাভ না হলেও, রানা জানে এসআইজি-২০১ দিয়ে দু'জনের একজনকে ফেলে দিতে পারবে ও।

রানা যে তা করবে বা করতে পারে, গুসানোর তা জানা আছে। অন্তত রানার দৃষ্টিসীমার ভেতর থেকে কিছুতেই পালাবার চেষ্টা করবে না সে। আয়োজন হয়তো এখনি করে রাখছে, পরে কেটে পড়বে। প্রশ্ন হলো, কতো পরে?

পালিয়ে কোথায় যাবে উইন্টার? কার্টেলের কাছে ফিরে গিয়ে লাভ নেই, জানে সে। কারণ কার্টেল এখন আর বিশ্বাস করবে না তাকে। অন্তত আগের মতো তো নয়ই। ডি. এ. এস.-এর জন্যে যা করেছে সে, কার্টেল যদি জেনে ফেলে থাকে, দেখামাত্র তারা খুন করবে ওকে।

এ-সব কথা ভেবেই ঝুঁকিটা নিয়েছে রানা। পনেরো মিনিট পর দেখা গেল, ভুল করেনি রানা। বোট থেকে নেমে হাতছানি দিয়ে রানাকে ডাকলো উইন্টার। তার সাথের লোকটাও দাঁড়ালো, ঘুরে তাকালো রানার দিকে।

দূর থেকে যতোটুকু মনে হয়েছিল তারচেয়ে খাটো লোকটা, তবে শরীরটা আরো পেশীবহুল।

তার বোটটাও শক্তিশালী। দুটো ইয়ামাহা এঞ্জিনে চলে। বোটের নাম আগরেব। 'ক্যাপটেন কোসিমো ইলিয়ভিচ,' পরিচয় করিয়ে দিলো উইন্টার।

বাড়ানো হাতটা ধরলো রানা। দুই বাহুতে উল্কি আঁকা রয়েছে—একটায় নোঙর, অপরটায় হরতন। মুঠোর ভেতরও জিনিস দুটোর কোনো অভাব নেই।

'আমেরিকান, অ্যাঁ?' লোকটার উচ্চারণে কোনো ঘৃণা প্রকাশ পেলো না। 'ব্রিজপোর্ট, কানেকটিকাট-এ বহুদিন ছিলাম আমি, যুগোশ্লাভিয়া থেকে বেরিয়ে আসার পর। তারপর এখানে চলে আসি। জায়গাটা আমার জন্যে মন্দ নয়।' হাসলো সে।

রানাও সামান্য হাসলো। 'আপনি তাহলে জাগরেব থেকে এসেছেন?'

'লেটিসিয়া থেকে,' বললো কোসিমো ইলিয়ভিচ। 'এই নদী আমার বাড়ি।'

'আশপাশের সবাইকে চেনেও। তাই না, কোসিমো?' জিজ্ঞেস করলো উইন্টার। 'সে এমনকি আপনার জার্মান বন্ধুকেও চেনে।'

'তার নাম মুয়েলার,' বললো রানা। 'বুড়ো একজন মানুষ, মাথায় টাক। ঠোঁট নেই বললেই চলে।'

'সত্যি অদ্ভুত,' বললো ক্যাপটেন কোসিমো, 'ওই ঠোঁট দুটো। ওগুলো থেকে কথা বেরোয় না। হয়তো কথা কিভাবে বলতে হয় তা-ই জানে না।'

কিংবা হয়তো এমন কিছু বলার নেই যা মানবজাতি হজম করতে পারবে। এরইমধ্যে কোসিমোর কাছ থেকে সুসংবাদ পেয়েছে রানা, তাই কোনো মন্তব্য না করে ইতস্তত করলো, লোকটাকে ভয় পাওয়াতে চায় না। তারপর বললো, 'আপনি আমার মস্ত উপকার করবেন, ক্যাপটেন, যদি জানাতে পারেন সিনর মুয়েলারকে কোথায় পাবো আমি।'

'মস্ত মানে কি ?' সরাসরি জানতে চাইলো কোসিমো। 'পাঁচ হাজার ডলার ?'

'না,' মাথা নাড়লো রানা।

'তাহলে কি তিন হাজার ডলার ?'

কথা না বলে আবার মাথা নাড়লো রানা। মনে মনে জানে, মুয়েলারের খোঁজ পাবার বিনিময়ে কয়েক লাখ ডলার দিতে হলেও বেশি দেয়া হবে না।

'তাহলে দুই হাজার ডলার,' প্রশ্ন নয়, সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিলো কোসিমো।

'হতে পারে,' বললো রানা।

'শুনুন, কোথায় তাকে পাওয়া যাবে তা আমি আপনাকে জানাতে পারবো না,' বললো কোসিমো, হৃৎপিণ্ড আঁকা হাতটা দিয়ে দাড়িতে আঙুল চালালো। 'তিনি বা তাঁর বোট যেখানে আছে, আমি কখনো যাইনি সেখানে। আমি শুধু বলতে পারি, কোথায় খুঁজতে হবে। খাদের উজানে, পারানা-য়, কালো প্রিস্টকে আপনি দেখেছেন তো ?'

'কালো পুরোহিত ?'

'উসতাচি,' মুচকি হেসে বললো কোসিমো, হাসিটার সাথে অস্পষ্ট কণ্ঠস্বর বেমানান ঠেকলো। 'আপনি উসতাচি সম্পর্কে জানেন না, পরদেশী ?'

মাথা নাড়লো রানা।

'ওরা খুব ভালো ক্যাথলিক,' সেই মুচকি হাসির সাথে বললো কোসিমো। 'ওরা চায় সবাই তাদের মতো ভালো ক্যাথলিক হোক। পারানা বেশিরভাগই অর্থোডক্স, কাজেই উসতাচিদের কাজের অন্ত নেই। পারানাদের ধরে ধরে ক্যাম্পে ভরেছিল নাৎসীরা, তাই না ? কিন্তু

একজন সার্বকে জিজ্ঞেস করে দেখুন, প্রভু হিসেবে কাদের চায় সে, একজন উসতাচিকে না একজন নাৎসীকে ? যতোবার প্রশ্নটা করবেন, বারবার একই উত্তর পাবেন আপনি—প্রভু হিসেবে জার্মানদের চাই।'

'কেন ?' জানতে চাইলো রানা।

'নাৎসীরা তাদেরকে খুন করেছে, কিন্তু উসতাচিরা তাদের আত্মা চায়। মানুষের আত্মা কয়েকবারে বের করে আনে ওরা, টুকরো টুকরো করে, একসময় কাঁচা মাংস ছাড়া আর কিছু অবশিষ্ট থাকে না, ওটা-কেই বলা হয়—গুড ক্যাথলিক ম্যান।'

'সার্বরা তাদের কথা না শুনলেই তো পারে।'

'সার্বরা শুধু মরতে জানে, তারা কোনো কাজের নয়। রোমে যিনি বসে আছেন, পোপ, তাঁর জন্যে ব্যাপারটা মন্দ হয়নি। কারণ তিনি শুধু ভালো ক্যাথলিক চান, তা না পেলে সার্বদের লাশ চান। ব্যাপারটা তাঁর কাছে আরেকটা ক্রুসেডের মতো।'

রানা কিছু বললো না, কারণ জানে কোসিমোর কথা বেশিরভাগই সত্যি। ডেথ ক্যাম্পগুলোয় এতো বেশি ইহুদি মারা গেছে যে ছোটো-খাটো জেনোসাইডের দিকে কারো নজরই পড়েনি। যুদ্ধের পর ইহু-দিরা মারতে শুরু করলো ফিলিস্তিনীদের, উপমহাদেশ বিভক্ত হবার পর পাকিস্তান আর ভারতে মারা পড়লো হিন্দু আর মুসলমানরা, যুগোশ্লাভিয়ায় জাতীয়তাবাদীদের মধ্যেকার যুদ্ধে মারা পড়লো হাজার হাজার লোক—খোঁজ নিলে জানা যাবে, প্রতিটি দাঙ্গার জন্যে দায়ী ছিলো উগ্র ধর্মীয় উন্মাদনা। বিভিন্ন নামে পরিচিত হলেও, উসতাচিরাই সবখানে সাম্প্রদায়িকতার বীজ ছড়াচ্ছে। 'কালো যে পুরোহিতের কথা আপনি বলছেন, তিনি কি যুদ্ধের সময় জার্মানদের পক্ষে কাজ করেছেন ?'

'অবশ্যই,' বললো কোসিমো। 'তখন কাজ করেছেন, এখনো করছেন—যদি মারা গিয়ে না থাকেন।'

'তিনি কি মুয়েলারের পক্ষে কাজ করেন?'

মাথা নাড়লো কোসিমো। 'আপনি ভালো করে আমার কথা শুনছেন না। বোটটা আমি দেখেছি, যেটার মালিক আপনার এই মুয়েলার ভদ্রলোক। পারানা নদী ছাড়িয়ে সেই যে খাদটা, সেদিকে যেতে দেখেছি, বুঝলেন? বোটে পুরোহিত ছিলেন। ···ড্রাগোনোভিচকে আমি নিজের হাতেই খুন করতাম, কিন্তু ভাবলাম আমার হয়ে কাজটা জঙ্গলই তো করতে পারে। জঙ্গল বরং আরো ধীরেসুস্থে মারবে তাঁকে। তিনি যেমন সার্বদের মারেন।'

'আমি জানতে চাই, ঠিক কোথায় বাস করেন পুরোহিত,' বললো রানা। 'তথ্যটার জন্যে দু'হাজার ডলার দেয়া যেতে পারে।'

'টাকাটা আমি নেবো,' উদারভঙ্গিতে হাত নেড়ে বললো কোসিমো। 'কিন্তু যদি পুরোহিত মশাইকে আপনি খুন করতে পারেন, প্রতিটি ডলার ফেরত পাবেন। শুধু যে টাকা ফেরত পাবেন তাই নয়, আপনি আমার শ্রদ্ধাও পাবেন, কারণ তাঁর মতো একজন লোককে খুন করতে পারা পুণ্যের কাজ।'

এগারো

ভোরের আবহাওয়ায় স্বেচ্ছাচারিতার ভাব। মাটিতে তুমুল বৃষ্টি, ফোঁটা-গুলো খাড়াভাবে পড়ছে। আকাশে ভরামাস পোয়াতির মতো জল-ভরা মেঘ আড়ষ্ট মন্থরগতিতে মিছিল করছে সেই ট্রাপিজিয়াম পর্যন্ত। কোর্স ঠিক রাখতে হিমশিম খেয়ে গেল উইন্টার। এয়ারস্পীড কখনো কমাতে হলো, কখনো বাড়াতে হলো। রানা নিশ্চিত, অন্তত একবার পেরুর আকাশসীমা লংঘন করেছে ওরা। সভ্য জগতে হিসেবের এই সামান্য ভুল গুলি ছুঁড়ে আকাশযানকে ভূপাতিত করার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

তবে কোথায় সভ্যতা? মাঝে-মধ্যে ফাঁক পাওয়া গেলে মেঘের নিচে জঙ্গল ছাড়া তেমন আর কিছু রানার চোখে পড়লো না। পুট-মাইওতে পৌঁছুবার পর খানিকটা পরিষ্কার হলো আবহাওয়া, নিচে জঙ্গল আর চওড়া একটা নদী দেখতে পেলো ও। কলম্বিয়ানরা পুট-মাইও নদীতে গান-বোট রাখে, এলাকাটায় বহুকাল ধরে রাবার চাষও করা হয়, তবু জনবসতির স্পষ্ট কোনো চিহ্ন চোখে পড়লো না। নদী থেকে দূরে একেবারেই কিছু নেই।

নদীকে পিছনে রেখে উত্তর-পশ্চিমে যাচ্ছে চপার। আবার মেঘের বড় একটা মিছিলের ওপর চলে এলো ওরা, পাঁচ মাইল লম্বা সেটা। পরে যখন নিচটা দেখা গেল, দেখেই নদীটাকে চিনতে পারলো উইণ্টার। 'পারানা রিভার,' বললো সে।

পারানা একটা শাখা নদী, সরু আর ধীরগতি। জঙ্গলের ভেতর দিয়ে এঁকেবেঁকে ধূসর সাপের মতোই এগিয়েছে, গাছের ফাঁকে কখনো দেখা যায়, কখনো যায় না। আঁকাবাঁকা পথ ধরে সেটাকে অনুসরণ করলো উইণ্টার। খুব নিচু দিয়ে উড়ছে ওরা, মনে হলো উঁচু পামগাছগুলো মুখে বাড়ি মারবে। উজানের দিকে সাড়ে সাত কিলোমিটার এগিয়ে পশ্চিম দিকে ঘুরে গেল উইণ্টার, গাঢ় রঙের পানি সহ একটা খাদকে অনুসরণ করলো। গাছপালায় ঢাকা, খাদটা কতোটুকু লম্বা বোঝা গেল না। দু'মিনিটেরও কম সময়ে ম্লান খানিকটা বালির ওপর স্থির হলো হেলিকপ্টার, মন্থরগতি পানিপথ এখানটায় সবচেয়ে চওড়া বলে মনে হলো রানার।

'কোসিমোর যদি ভুল না হয়,' বললো উইণ্টার, 'টার্গেট থেকে তিন হাজার মিটার দূরে রয়েছি আমরা।'

'বালির ওপর নামতে পারবে?' জিজ্ঞেস করলো রানা।

পাইলট হিসেবে তার যোগ্যতাকে সন্দেহ করা হয়, এমন কোনো প্রশ্নের উত্তর দেয় না উইণ্টার। বালির ছোট্ট বিস্তৃতির ওপর নিখুঁতভাবে হেলিকপ্টার নামালো সে। সুইচ অফ না করা পর্যন্ত রানা টেরই পেলো না যে ল্যাণ্ড করেছে ওরা।

জোয়ারের সময় উঠে আসতে পারে পানি, তাই দুই তীরের গাছের সাথে চপারটাকে বাঁধলো ওরা। পাঁচ মিনিটের মাথায় ইনফ্লেইটেব্‌ল্ কেভলার র‍্যাফট্ নিয়ে রওনা হয়ে গেল, দু'জনেই ছোটো বৈঠা

চালাচ্ছে। স্থির হয়ে আছে বাতাস, বুনো ফুল আর পচা লতাপাতার গন্ধ ঢুকলো নাকে। কোথাও কোথাও মাথার ওপর জড়াজড়ি করে আছে গাছের শাখা-প্রশাখা। ভেলার সাথে সাথে আসছে পোকার ঝাঁক, মশাগুলো সুযোগ পেলেই কামড়াচ্ছে।

ছায়া, গভীর ছায়া ছাড়া আর কিছু চোখে পড়লো না রানার। তবে জানে, এদিকের পানিতে পারানা আর ক্যানডারিস মাছ প্রচুর পাওয়া যায়, দুটোই মাত্র কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে একটা মানুষের শরীর থেকে সমস্ত মাংস ছাড়িয়ে নিতে পারে। রক্তের গন্ধ পেলেই পাগল হয়ে ওঠে পারানা। ক্যানডারিস পাগল হয় প্রস্রাবের গন্ধে। বেগ চেপে রাখতে না পারলে সাবধানী একজন লোকের উচিত কাজ হবে তার অতীব গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গগুলো পানি থেকে যতোটা সম্ভব দূরে রাখা এবং আশা করা যে বোটের পলিমেরাইজড আবরণ বিজ্ঞাপনের দাবি অনুযায়ী সত্যিই যথেষ্ট মজবুত।

ওদের কোনো সমস্যা হলো না, এমনকি কালো পুরোহিতের ক্যাম্প ঠিক জায়গায় না পাওয়া সত্ত্বেও। উজান বেয়ে আধ মাইলটাক যাবার পরই কিছু চিহ্ন দেখা গেল, এই প্রথম বোঝা গেল আশপাশে মানুষ আছে। প্রথমে চোখে পড়লো পাড়ের কাছাকাছি পরিষ্কার করা খানিকটা জায়গা, যেন এখানটায় কেউ রাত কাটিয়েছে। তারপর পাওয়া গেল সেদ্ধ মাংস আর প্রস্রাবের গন্ধ। ইংরেজি এস হরফের আকৃতি নিয়ে ঘুরে গেছে পাহাড়ী খাদ বা নালাটা, পুরো বাঁক ঘুরতেই দেখা গেল ক্যাম্প।

রানা যা ধারণা করেছিল, তারচেয়ে বড় ক্যাম্পটা। গাছ আর ঘাস কেটে প্রায় তিনশো গজ জায়গা পরিষ্কার করা হয়েছে। দুটো বড় আর একটা ছোটো কুঁড়েঘর। পাতা দিয়ে তৈরি ঘরগুলোর চাল দেয়াল

ছাড়িয়ে নেমে এসেছে প্রায় মাটি পর্যন্ত, ক্রমশ ঢালু হয়ে। ছোটো ঘরটা গোলাকার, বাকি দুটোকে চৌকোই বলা যায়। রানা ভাবলো, চার্চ হওয়া বিচিত্র নয়।

শেষ ঘরটা থেকে এক লোক বেরিয়ে এলো। পুরোহিত হওয়া অসম্ভব নয়। যীশুর ক্ষত ছাড়া বাকি সবই তার মধ্যে আছে। কালো, হাফ-হাতা শার্টের বাইরে বেরিয়ে থাকা সরু হাত দুটোয় পটাশিয়াম পার-মাঙ্গানেট দিয়ে বেগুনি-লাল নকশা কাটা হয়েছে। থ্যাবড়া, ভোঁতা চেহারা, বেড় দিয়ে রেখেছে সাদা চুল। খোঁড়াচ্ছে লোকটা, আঁকাবাঁকা একটা লাঠি হাতে বেরিয়ে এলো। দুর্বল কণ্ঠে কথা বললো সে, 'ভায়েরা!'

ওরা কি এই লোককেই খুঁজছে? পাড়ে ভেলা ভিড়িয়ে তাড়াতাড়ি নেমে পড়লো রানা। 'শুভেচ্ছা, ফাদার। আপনার সাথে কথা বলার জন্যে অনেক দূর থেকে এসেছি আমরা।'

বিশ ফুট দূরে দাঁড়িয়ে পড়লো বুড়ো পুরোহিত। নাকের ডগার কাছে ঝুলে রয়েছে চশমাটা, মুখ উঁচু করে ওদের দিকে তাকালো সে। চেহারায় রাগ রাগ ভাব। ঈশ্বরকে নয়, তাকে খুঁজছে ওরা, এটা যেন তার কাছে একটা দুঃসংবাদ। তবে কথা বললো আগের সেই শান্ত, দুর্বল স্বরে, 'তোমাদের স্বাগত জানাই। খুব একটা মেহমান তো আর পাই না আমরা।'

পুরোহিতের শেষ শব্দটা খানিকটা অস্বস্তির মধ্যে ফেলে দিলো রানাকে। শব্দটা কি কেতাবী, ঈশ্বর আর তাঁর উপাসনালয়কে বোঝাচ্ছে, নাকি ওটা ব্যবহার করা হলো অধিকতর আক্ষরিক অর্থে? শেষ বয়েসে বুড়ো একজন মানুষ জঙ্গলে পালিয়ে এসে বসবাসের জন্যে নিশ্চয়ই এটা বানায়নি। 'আমরা প্রাণীবিজ্ঞানী,' বললো রানা। 'আমার সাথে

রয়েছে জুয়ান গুসানো, আমার কলিগ, ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অভ আমাজন রিসার্চ-এর বিজ্ঞানী। আর আমি ডক্টর বিল হাওয়ার্ড, মেরিল্যাণ্ড ইউনিভার্সিটিতে আছি।'

চোখ বন্ধ করে আবার খুললো পুরোহিত। 'আমি ব্রাদার জাসিন্টো।'

এক নিমেষে সব যেন খাপে খাপে মিলে গেল। জাসিন্টো মানে হলো হাইঅ্যাসিন্থ্। ব্রাদার হাইঅ্যাসিন্থ্ নিচু পদের একজন সন্ন্যাসী ছিলো, বিশপ হুডালের তৈরি ভ্যাটিক্যান এস্কেপ রুট-এর একটা অংশবিশেষ ছিলো সে। ইসরায়েলি ইণ্টারোগেটর, যারা আইখম্যানকে জেরা করেছে, তাদের দ্বারাই প্রকাশ পেয়েছে হাইঅ্যাসিনথের কীর্তিকলাপ। 'এখানে আমরা এসেছি একটা সাপের খোঁজে,' বললো রানা। 'স্থানীয়, কিন্তু দুর্লভ, সিটাডেলিস।'

চশমার ভেতর ঘন ঘন চোখ মিটমিট করলো বুড়ো, যেন শব্দগুলোর অন্তর্নিহিত অর্থ বোঝার চেষ্টা করছে। 'আমাদের এই জঙ্গলে বিভিন্ন জাতের বিষধর সাপ আছে, ভাই। এই জায়গাটা পরিষ্কার করার সময় চল্লিশটার ওপর শুধু সিটাডেলিস পেয়েছি আমরা।'

বিস্মিত হলো না, কারণ রানা জানে মায়ের সাথে অনেক বাচ্চা সাপও থাকে। প্রশ্ন হলো, সাপগুলো ধরলো বা মারলো কে? 'সিটাডেলিস খোঁজার কারণ হলো, ওটাকে নমুনা হিসেবে নতুন বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। এদিকে নাকি সিটাডেল বলে একটা জায়গা আছে, সাপটা সেখান থেকে এসেছে। পুরো নামটা হলো, ফাদার, বথরপস জারারাকুকু সিটাডেলিস। সিটাডেল জায়গাটা কোথায় বলে দিলে আমাদের ভারি উপকার হয়।'

ধীরে ধীরে মাথা নাড়লো ব্রাদার হাইঅ্যাসিন্থ্। 'আপনার বর্ণনা

শুনে মনে হলো, ওটা একটা দুর্গ,' বললো সে। 'এই এলাকায় সে-ধরনের কিছু আছে বলে আমার জানা নেই।'

'তাহলে জায়গাটায় কে বাস করেন তা বোধহয় আপনি বলতে পারবেন,' বললো রানা। 'ভদ্রলোকের নাম রলফ মুয়েলার। একসময় লোকে তাঁকে গ্রুপেনফুয়েরার হেনেরিক মুলার হিসেবে চিনতো।'

হঠাৎ করে পরিস্থিতিটা যেন পরিষ্কার হয়ে গেল, মাথাটা কাত করে চারদিকে দ্রুত তাকালো হাইঅ্যাসিন্থ্, যেন পালাবার পথ খুঁজছে। কোনো পথ না পেয়ে ঝট্ করে ঘুরে দাঁড়ালো সে, খোঁড়াতে খোঁড়াতে বড় কুঁড়ে ঘরটার দিকে এগোলো। ঘরটার সামনে একটা ক্যাম্প চেয়ার রয়েছে, ধপ্ করে বসে পড়লো সেটায়। রানা আর উইন্টার তার দু'পাশে এসে দাঁড়াতেও কিছু বললো না সে।

গাছের একটা গুঁড়ির ওপর বসলো উইন্টার, ওপরদিকটা সমতল ও মসৃণ, টেবিল হিসেবে কাজ করে। ফাদার হাইঅ্যাসিনথের দিকে তিন ফুট দূর থেকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকলো সে, যেন অদ্ভুত একটা বস্তু পরখ করছে। 'ফান্দে পইড়া বগা কান্দে,' জাতীয় কিছু ইংরেজিতে বললো সে।

'আসলে তোমাদের পরিচয় কি?' জানতে চাইলো বুড়ো।

'সংগ্রাহক, আমরা সংগ্রাহক,' বললো উইন্টার। 'আপনি সংগ্রহ করেন আত্মা আমরা করি দেহ।'

উইন্টারের দিকে নয়, ফাদার হাইঅ্যাসিন্থ্ রানার দিকে তাকালো। 'এই দেহটার বয়স হয়েছে, জমা হয়েছে অনেক ক্লান্তি। এখন এটা শুধু শান্তি আর বিশ্রাম চায়। অথচ আমি বুঝতে পারছি, আপনি শান্তিকামী মানুষ নন।'

'আপনি কি শান্তিকামী মানুষ, ড্রাগোনোভিচ?' কঠিন সুরে জিজ্ঞেস

করলো রানা। 'উসতাচির কর্নেল ছিলেন আপনি, আমাদের জানা আছে। নাৎসী অপরাধীদের পালিয়ে আসতে সাহায্য করেছেন।'

'মাটির বুকে ওরা সবচেয়ে ঘৃণ্য আবর্জনা,' ফাদার বিড়বিড় করে উঠলো। 'ইহুদিরা।'

'সবচেয়ে নোংরা আবর্জনা হলেন আপনারা, যারা সাম্প্রদায়িক শক্তিকে সাহায্য করছেন।' বেল্টের খাপ থেকে ছুরিটা বের করলো রানা। 'যুদ্ধ বন্ধ করার জন্যে যেমন যুদ্ধ করা দরকার, তেমনি শান্তি ফিরিয়ে আনার জন্যে দরকার রক্তপাত। তবে, আপনাকে একটা সুযোগ দেয়া হবে। আপনি যদি আমার প্রশ্নের উত্তর দেন, আইন তার নিজের পথে চলবে। আপনি গ্রেফতার হবেন, আপনার বিচার হবে। আর যদি উত্তর না দেন···বুঝতেই পারছেন। এই শেষবার জিজ্ঞেস করছি, কোথায় পাওয়া যাবে হেনেরিক মুলারকে?'

রানার মুখ লক্ষ্য করে থুথু ছুঁড়লো হাইঅ্যাসিন্থ্। শুকনো একটা শব্দ হলো মাত্র, ব্যর্থ চেষ্টা, থুথু বেরোলো না। বহুলোককে মৃত্যুর মুখে দাঁড় করিয়েছে এই লোক, শেষ মুহূর্তগুলোয় দুর্ভাগাদের শারীরিক অবস্থা কি রকম হয় তা তার জানা উচিত ছিলো।

পুরোহিতের বাম হাতের পাঁচড়ার ওপর ছুরির ডগাটা সামান্য একটু ঢোকালো রানা। ঝট্ করে ক্ষতের খানিকটা চেঁছে তুলে ফেললো। একচুল নড়লো না বুড়ো। লোকটা সম্ভবত শারীরিক নির্যাতন গ্রাহ্য করছে না। ক্ষতটা থেকে রক্ত বেরিয়ে আসছে দেখে খুশি হলো রানা। 'হাত দুটো পিছমোড়া করে বাঁধা হবে আপনার। তারপর গলা পর্যন্ত ডুবিয়ে রাখা হবে পানিতে। কোন্ পানিতে, আপনি জানেন।'

লেফটেন্যান্ট কর্নেল ড্রাগোনোভিচকে কয়েক মুহূর্ত হতভম্ব দেখালো,

তারপর আঁতকে উঠলো সে। 'খাদটা পারানায় ভর্তি!'

'সেরকমই বলা হয়েছে আমাকে। দেখতে চাই শিকার পেলে কি করে ওরা।'

'আ-আপনি এতো নি-নিষ্ঠুর হতে পা-পারেন না!'

'সাধারণ মানুষদের কথা আলাদা, কিন্তু আপনি একটা দুর্লভ ব্যতিক্রম, কর্নেল,' বললো রানা।

চশমাটা মুখের সাথে চেপে ধরলো হাইঅ্যাসিন্থ্, রানার দিকে বিহ্বলদৃষ্টিতে তাকালো। 'আপনি ইহুদি হয়ে আমার মতো নিরীহ বুড়ো এক লোককে···।'

'আমি ইহুদি হলে এতোক্ষণে তুমি মরে বাঁচতে,' বললো রানা। 'সত্যি কথা না বললে আমার হাতেও তুমি মরবে, তবে কষ্ট পেয়ে। যে-কোনো একটা বেছে নাও।'

বেছে নেয়ার আর আছে কি। লেফটেন্যান্ট কর্নেল ড্রাগোনোভিচের আর যাই থাক, শহীদ হবার সুযোগ নেই। কয়েক সেকেণ্ড সিদ্ধান্তহীনতায় ভোগার পর মুখ খুললো সে। মুখ খোলার পর বলতে বাকি রাখলো না কিছুই।

ষাট দশকের প্রথম দিকের ঘটনা। আইখম্যান ধরা পড়ায় নাৎসী ফেরারীরা আতংকে দিকবিদিক ছুটছে। এই সময়ই সিটাডেলটা খুঁজে পায় ক্রুনোসলা ড্রাগোনোভিচ। ফ্রানসিসকান সন্ন্যাসী ছিলো সে। যুদ্ধের পর ভ্যাটিকানে তার ক্রোয়াটিয়ান বন্ধুরা জেনোয়ার একটা মঠে তাকে লুকিয়ে রাখে। বিনিময়ে, পরবর্তী সময়ে, অনেক ফেরারী নাৎসী অপরাধীকে পালাতে সাহায্য করে সে। তাদের মধ্যে আইখম্যান আর ক্লাউস বারবি-ও ছিলো। ড্রাগোনোভিচের নিজের ভাষায়, দ্বিতীয়

জীবনে পদার্পণ করতে প্রায় দুশো এসএস অফিসারকে সাহায্য করেছে সে, তাদের মধ্যে ক্যাথলিক ও প্রোটেস্ট্যান্ট দু'দলই ছিলো। সবাই তারা কমিউনিজম আর কমিউনিস্টদের ঘোর বিরোধী।

অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি, নাৎসী অপরাধীদের অনেকেই সাহায্য-প্রার্থী হয়ে তার কাছে এলো মার্কিন ইন্টেলিজেন্স এজেন্সির মাধ্যমে। নিরাপদ জায়গায় পাচার করার জন্যে মাথাপিছু এক হাজার ডলার করে পায় ড্রাগোনোভিচ। নাৎসী অপরাধী ভি. আই. পি. হলে ফি বেড়ে গিয়ে পনেরো শো ডলারে দাঁড়ায়। আমেরিকানরা, যারা বলশেভিক-কে মানবজাতির পরম শত্রু বলে জ্ঞান করে, তারা তাকে 'গুড ফাদার' বলে ডাকে। মিত্র পক্ষের ক্যাম্পে উসতাচির যে-সব সদস্য সাময়িক দুঃখ-কষ্ট ভোগ করছে তাদের যত্নআত্তি করার জন্যেও অনুমতি দেয়া হলো তাকে।

এক সময় ইউরোপের কাজ শেষ হলো, বিশপ হুডালের অনুমতি নিয়ে দক্ষিণ আমেরিকায় চলে এলো ড্রাগোনোভিচ। প্রথমে ব্রাজিলে এলো সে, সেখান থেকে কলম্বিয়ায়। দক্ষিণ আমেরিকায় এসে এমন অনেক লোকের সাথে তার দেখা হলো যারা তার অতীত সম্পর্কে সহানুভূতিশীল। সুন্দর, উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখতে শুরু করলো ড্রাগোনোভিচ। যাদেরকে নিরাপদ জীবন পেতে সাহায্য করেছে, সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলো তারা।

তাদের মধ্যে একজন হলো আইখম্যান। যদিও আইখম্যানের আসল পরিচয় ড্রাগোনোভিচ তখন জানে না। কেউ চিনতো না আইখ-ম্যানকে। দক্ষিণ আমেরিকায় এতো তাড়াতাড়ি চলে আসে সে, এসেই যেভাবে নিজের প্রভাব বিস্তার করে, তাকে রিফিউজি বলে মনেই হয়নি। প্রকাশ্যে খুব একটা বাইরে না বেরোলেও, একদিন ড্রাগোনো-

ভিচকে খুঁজে বের করলো সে, বিশপ হুডালের ব্যক্তিগত সুপারিশ দেখিয়ে একটা তথ্য চাইলো তার কাছে। জানালো, একটা জেসিউইট ধ্বংসাবশেষ সম্পর্কে কৌতূহল রয়েছে তার।

কাজটা মুয়েলারের, কাজেই খুশি মনে রাজি হলো ড্রাগোনোভিচ। কলম্বিয়ার দুর্গম এলাকাগুলোয় জেসিউইট আর ফ্রানসিসকানরাই ছিলো প্রথম শ্বেতাঙ্গ, অধপতিত ইণ্ডিয়ান আত্মা উদ্ধারে পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলো তারা। জঙ্গলের গভীর প্রদেশে অবিশ্বাস্য সব সাংগঠনিক ও নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করে জেসিউইটরা। সতেরো শো সাতষট্টি সালে স্পেন থেকে বিতাড়িত হওয়ার আগে এলাকাটা এমনভাবে সুরক্ষিত করে ওরা, আজও সেখানে অনুপ্রবেশ করা অত্যন্ত কঠিন।

জেসিউইটদের বিশেষ একটা আস্তানা সম্পর্কে আগ্রহ দেখালেন মুয়েলার। রিয়ো পারানার উজানে, জায়গাটার নাম লাস আনিমাস—আত্মা। বড় আকারের সেটলমেণ্টগুলোর একটা ওটা। পরবর্তী সময়ে রাবার ব্যবসায়ীরাও ওখানে বসবাস করে, কিছু কিছু বিল্ডিং মেরামতও করে তারা। চার্চটাকে বানায় কোম্পানী হাউস, বাসস্থানকে রান্নাঘর আর কাঠমিস্ত্রীর দোকান, কনভেণ্টকে ইণ্ডিয়ান মেয়েদের আস্তানা।

একে একে বিপদ নেমে এলো লাস আনিমাসের ওপর। প্রথমে রাবার ব্যবসা মার খেলো। তারপর নদীর গতিপথ বদলে গেল। নদীর গতিপথ বদলে যাওয়ায় মূল বনভূমির সাথে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লো জায়গাটা। আগে যেটা দুর্গম ছিলো, এখন সেটা অগম্য হয়ে পড়লো। লাস আনিমাস দাঁড়িয়ে থাকলো লেকের মাঝখানে। স্বজাতির বিদেহী আত্মারা ওখানে ঘোরাফেরা করছে, ভয়ে তাই ইণ্ডিয়ানরাও ওদিকে যেতে সাহস পায় না।

যাদের কোনো আশ্রয় নেই, দুনিয়া জুড়ে যাদেরকে খোঁজা হচ্ছে, সেই নাৎসীরা ছাড়া আর কারা যাবে ওখানে! প্রথমে তারা মিত্র-পক্ষের তাড়া খেয়েছে, তারপর ইহুদিদের। পালাবার সময়, প্রতি মুহূর্তে তারা উপলব্ধি করেছে নির্জনাবাসের গুরুত্ব কতোখানি। লোক-চক্ষুর আড়ালে, জঙ্গলের ভেতর, ফ্যাসিস্ট আইনশৃঙ্খলা ও নীতি-আদর্শ ফিরিয়ে আনার জন্যে কাজ করা সম্ভব। লোকজনকে ট্রেনিং দেয়া সম্ভব। সংগ্রহ করা অস্ত্র লুকিয়ে রাখা যায়।

শুরু হলো গোপন আন্দোলন। যারা নেতৃত্ব দিলো তারা সবাই ফাসিজম-এর প্রতি নিবেদিতপ্রাণ। লোকজন জড়ো করা হলো সিটা-ডেল-এ, বিশেষ ট্রেনিং দিয়ে দক্ষ করে তোলা হলো তাদেরকে। হোয়া-ইট গামার ক্যাডার হিসেবে অ্যাসাইনমেণ্ট বুঝে নিলো তারা।

মুয়েলারের চেয়ে ভালো ট্রেনার তারা পাবে কোথায়! কেউ জানে না তাঁর মনে কি আছে, কিংবা জানে না তাঁর প্ল্যানটা আসলে কতো-টুকু বাস্তব। তবে কেউ তাঁর নির্দেশ অমান্য করলো না। নিম্নপদস্থ সন্ন্যাসী তো নয়ই।

শুধু লোকজনের সেবা করার জন্যেই এখানে থাকা ব্রাদার হাই-অ্যাসিনথের। তাদের অনেকেই ক্যাথলিক। কতো রকম ঝুঁকি নিয়ে জঙ্গলের ভেতর আসে তারা তার সাথে দেখা করার জন্যে, মুয়েলারের অনুমতি নিয়ে বা কখনো অনুমতি ছাড়া, কারণ ঈশ্বরকে তারা ভয় ও ভক্তি করে। এই বনভূমিতে, এই পরিবেশে, এ-ও বিশ্বাস করা সম্ভব যে তাঁর অস্তিত্ব মিথ্যে আশ্বাস নয়।

'ব্যাটা ফ্যাণ্টাসিতে ভুগছে, তাই না?'

'হতে পারে।'

ঘরের একটা খুঁটির সাথে বাঁধা হয়েছে ব্রাদার হাইঅ্যাসিনথকে, সেদিকে তাকিয়ে উইন্টার বললো, 'ভেবে দেখুন না। বছরের পর বছর ধরে এই জঙ্গলে থাকলে, একজন মানুষ সুস্থ থাকে কিভাবে? চোখ দুটো লক্ষ্য করেছেন? কিসের যেন একটা ঘোর লেগে আছে।'

'কিন্তু সিটাডেল মিথ্যে নয়,' বললো রানা। 'এতোটাই সত্যি যে এখানে কি ঘটছে বলার চেয়ে মরে যাওয়াও ভালো বলে মনে করেছে লজেন। কিংবা বলেনি জায়গাটা কোথায়। সেজন্যেই কি তুমি ভয় পাচ্ছো, উইন্টার?'

'সাপ আমি বড় ভয় করি,' শিউরে উঠে বললো উইন্টার। 'জলাও আমার আতংক। লেটিসিয়ায় থাকার সময় যে-সব কথা শুনলাম, আমার স্বস্তি কেড়ে নিয়েছে।'

শহরে বন্ধু-বান্ধবদের সাথে কথা হয়েছে উইন্টারের, তার বেশির-ভাগই রানাকে এখনো বলেনি সে। 'কি কথা, উইন্টার?'

'গুজব,' বললো উইন্টার। 'যেমন—শহরে এতো বেশি কোকেন ঢুকছে যে গত দশ বছরে এই প্রথম ওরা বাজার বসাতে পারছে। এতো বিপুল পরিমাণে কোকেন আসছে অথচ বাজারে তা পড়তে যা দেরি, সাথে সাথে গায়েব হয়ে যাচ্ছে। খোঁজ নিয়ে দেখুন, এমন কি বলি-ভিয়ানদের কাছেও আপনি পাবেন না। অসম্ভব একটা ব্যাপার।'

'কোকেনের এই অভাব কতোদিন ধরে চলছে?' চিন্তিতভাবে জিজ্ঞেস করলো রানা।

'ঠিক জানি না,' বললো উইন্টার। 'কেউ মুখ খুলতে রাজি নয়। তবে যতোদূর বুঝতে পারছি, বিশ-বাইশ দিন হয়ে এলো। কোকা-ল্যাণ্ডে একমাস মানে চিরকাল।

বিশ-বাইশ দিন? ওই কাছাকাছি সময়েই ভিক্টর লজেনকে যুক্তরাষ্ট্রে

পাঠাবার মার্কিন অনুরোধ নিয়ে কলম্বিয়ায় আসে টমাস কালভিন। 'লেটিসিয়া থেকে কোকেন বেরিয়ে যাচ্ছে কিভাবে, কোন্ পথে?' জানতে চাইলো রানা।

'না, প্লেনে করে নয়,' বললো উইন্টার। 'লেটিসিয়া থেকে টারাপাকা পর্যন্ত রাস্তা আছে।'

'ওটা পুটমাইও নদীতে না?'

'নদীতে শহর না বলে বলা উচিত শহরে নদী, সত্যি যদি জানতে চান।'

'টারাপাকা থেকে বেরোবার মতো রাস্তা কি আছে?'

কাঁধ ঝাঁকালো উইন্টার। 'না বলতেই দেখছি ধরে ফেলেছেন।'

'তারমানে রাস্তা দিয়ে পুটমাইও যাচ্ছে, সেখান থেকে নদীতে,' বললো রানা। 'কিন্তু তারপরও জিনিসটা রাখার জন্যে একটা জায়গা দরকার হবে। কোকেনের পরিমাণ বেশি হলে ওয়্যারহাউসটাকেও বড় হতে হবে। সাবধানের মার নেই ভেবে বুড়ো এক পুরোহিতকে সর্বক্ষণ স্টেশনে রাখাটাও উচিত কাজ হবে। সে তার ধর্মীয় দায়িত্ব পালন করলো, অপারেশন-এর ওপরও চোখ রাখলো। আসলে কি ঘটছে, সবটা তাকে না জানালেও চলে।'

'কিংবা আপনি যতোটা ভাবছেন তারচেয়ে অনেক বেশি মূল্য তার,' বললো উইন্টার। 'সে-ই হয়তো পুরনো কনট্যাক্টগুলোকে ফিরিয়ে এনেছে খেলায়।'

'সম্ভব।'

'তারও বেশি,' বললো উইন্টার। 'কাঁধে শোল্ডার ব্যাগ, লোকটার কথা মনে আছে আপনার? কাল রাতে যার সাথে কথা বললাম?'

'হ্যাঁ।'

'লোকটা পাইলট,' বললো উইন্টার। 'হ্যানস সনেটা। ওর সাথে আমার প্রথম পরিচয় হয় অ্যাঙ্গোলায়। কোম্পানীর হয়ে কাজ করছিল।'

কোম্পানী? দক্ষিণ আমেরিকায় শব্দটার একাধিক অর্থ প্রচলিত। 'তুমি বলতে চাইছো পাইলট লোকটা এজেন্সির হয়ে কাজ করতো?' আরেকটা শব্দ এজেন্সি, একাধিক অর্থ বহন করে—তবে সি. আই. এ.-কেই মূলত বোঝায়।

'দেখুন, আপনি বিশ্বাস না করলে আমার কিছু আসে যায় না। ছোকরাদের হয়ে সত্যি কাজ করতো সে। তাদের ঘরে এখনো হয়তো একটা পা দিয়ে রেখেছে। সনেটা আমাকে কি বলেছিল, শুনবেন?'

'কি বলেছিল?'

'কোস্টারিকার একটা এয়ারস্ট্রিপ থেকে যুক্তরাষ্ট্রে কোকেন নিয়ে যায় সে। বড়, ভারি চালান। বিশ্বাস করুন, আমি জানি, ঝুঁকি নেয়ার বান্দা সনেটা নয়। কাজটা কখন নিরাপদ, সে বোঝে। আমাকে বললো, ড্রাগ ভর্তি একটা ডিসি-থ্রি সরাসরি হোমস্টেড এয়ারফোর্স বেসে নিয়ে গেছে। মেইন্টেন্যান্স শেড-এর সামনে পার্ক করে প্লেনটা। সামনের গেট দিয়ে হেঁটে বেরিয়ে যায়। ড্রাগস নামালো কে? তার জানা নেই। আমরা জাদু নিয়ে কথা বলছি, জেনারেল। সত্যিকার ভৌতিক কারবার। ওপর মহলের ক্লিয়ার্যান্স ছাড়া এ-ধরনের কাজ আপনি একটা সামরিক বিমানবন্দরে করতে পারেন না। ওপরমহল মানে অনেক ওপরমহল। বলুন, কে হতে পারে সে?'

সি. আই. এ. ওপরমহল হিসেবে চিহ্নিত, তাদের মধ্যে এ-ধরনের কাজে যারা জড়িত হতে পারে তার একটা তালিকা আছে রানার

কাছে, লিলির সাথে বসে তৈরি করা। 'তোমার বন্ধু যে সত্যি কথা বলছে, তার প্রমাণ কি?' শান্ত গলায় জিজ্ঞেস করলো রানা।

'আমাকে বলেছে, এটাই প্রমাণ,' দৃঢ়কণ্ঠে জানালো উইন্টার। 'আমাকে মিথ্যে বলবে না।'

'ঠিক আছে, ধরা যাক সত্যি কথাই বলছে সে। ল্যাংলির স্বার্থ কি?'

'মোটা লেনদেন,' বললো উইন্টার। 'যা শুনেছি তাই বলছি।'

'কি ধরনের লেনদেন?'

'বিগ ক্যালিবার,' বললো উইন্টার। 'গানস, অ্যামুনিশনস। দ্বিতীয় একটা ফ্রন্ট খোলার জন্যে যথেষ্ট বড় চালান।'

'দ্বিতীয় একটা ফ্রন্ট কোথায়?'

'এটা একটা ফিরতি টিকেট, জেনারেল,' বললো উইন্টার। 'কোস্টা-রিকা, মায়ামি, কোস্টারিকা। ল্যাণ্ডিং স্ট্রিপটা নিকারাগুয়া সীমান্তের কাছেই। বাকিটা বুঝে নিন।'

সাউদার্ন ফ্রন্ট, ভাবলো রানা। কণ্ট্রা যুদ্ধ শুরুর প্রথম দিন থেকেই নিকারাগুয়া সীমান্তে কোস্টারিকার সাথে লড়াই হচ্ছে। শুরুতে প্রতি-রোধ করা হয় এডেন পাসতোরা-র নেতৃত্বে। সানডিনিসটা হাই কমাণ্ড থেকে বিদ্রোহ করে চলে আসে সে। কিছুদিন পর সি. আই. এ.-র সমর্থন হারায়। নিজেদের প্ল্যান সফল করার জন্যে নিজেদের লোককে দায়িত্ব দেয় সি. আই. এ., কিন্তু তাতে বিশেষ সুবিধে হয়নি। তারপর, ইদানীং, আরো অশুভ একটা শক্তির সাথে হাত মিলিয়েছে তারা।

অবশেষে সব খাপে খাপে মিলে যাচ্ছে। ববি মুয়েলারের মাধ্যমে কণ্ট্রা হাই কমাণ্ডকে কয়েক মিলিয়ন ডলার দান করে ভিক্টর লজেন। আর্মস আর ড্রাগস ডিলার ছিলো ববি মুয়েলার। চুক্তি সম্পাদনের সময় সি. আই. এ.-র প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত ছিলো ডেভিড

গোল্ডব্লাট। বোঝাই যায়, লজেনকে তারা নির্বিঘ্নে ড্রাগ পরিবহণের সুযোগ দেয়, বিনিময়ে ফিরতি ফ্লাইটে কণ্ট্রাদের জন্যে অস্ত্র বহন করতে হবে। এ-ধরনের চুক্তির অর্থ হলো, ড্রাগ ব্যবসায়ীদের হাতে নিজের দেশের লোককে বিক্রি করে দেয়া। নোংরা একটা যুদ্ধ টিকিয়ে রাখার জন্যে স্বদেশের সাথে বেঈমানী করছে সি. আই. এ.।

এই সত্যটাই ফাঁস করার চেষ্টা করেছিল লিলিয়ান। তার পিছনে ভাড়াটে খুনিদের লেলিয়ে দেয় সি. আই. এ.। ভাড়াটে খুনি নয়, কার্টেলকে লেলিয়ে দেয়া হয়েছে রানার বিরুদ্ধে। রণকৌশল হিসেবে পাল্টা আঘাত হানার সিদ্ধান্ত নেয় রানা। অনেক দূর চলে এসেছে ও, বেঁচে আছে এখনো। সামনে আরো পথ বাকি, সেটা পেরোতে পারলেই, ওর আশা, হেনেরিক মুলারকে খুঁজে পাবে। 'উইণ্টার, আমি চাই তুমি চপারের কাছে ফিরে যাও,' বললো রানা। 'বোগোটার ডি. এ. এস.-এর সাথে যোগাযোগ করবে। এদিকে আসার পথে লোকজন নিয়ে সতর্ক থাকতে বলবে কর্নেল বেনিনকে।'

ঠোঁটে বাঁকা হাসি নিয়ে গর্ডন উইণ্টার জানতে চাইলো, 'আপনি চান আমি একা যাই, জেনারেল?'

'হ্যাঁ,' বললো রানা। 'আমার ধারণা, দ্বিতীয় কাজটাও তুমি নিখুঁত-ভাবে সারতে পারবে।'

'কি সেটা?'

'নিজেকে গুম করে ফেলা।'

এই প্রথম উইণ্টারকে বাক্যহারা হতে দেখলো রানা। দু'তিনবার ঢোক গিলে শুধু বলতে পারলো, 'ওয়েল, থ্যাঙ্কস, জেনারেল।'

'ফাদার না ব্রাদার, তাকেও সাথে করে নিয়ে যাও,' বললো রানা।

'কতো দূরে?'

'তোমার ইচ্ছে।'

'কতো উঁচুতে?'

'তোমার খুশি।'

নার্ভাস ভঙ্গিতে খক খক করে হাসলো উইন্টার। 'শুনেছি তিন হাজার ফুট ওপর থেকে পানিতে পড়লে, ওদের মধ্যে নাকি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ার একটা প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। আমাজন কখনো ড্রেজিং করা হয় না।'

'তোমার সমস্যার কথা আমাকে শুনিয়ো না,' বললো রানা। 'আমার নিজেরই অনেক সমস্যা আছে।'

চেহারায় উদ্বেগ নিয়ে উইন্টার জানতে চাইলো, 'আপনি চান ডি. এ. এস.-কে আমি জায়গাটার কথা বলি?'

'ওদেরকে টার্গেট দেবে এই পজিশন থেকে দুই দশমিক সাত কিলো-মিটার পশ্চিমে।'

রাস্তার দিকে তাকালো উইন্টার, ফাঁকা জায়গাটা থেকে বনভূমির ভেতর ঢুকে গেছে। মাথা নাড়লো সে। 'ভেতরে কোথাও সশস্ত্র একটা বাহিনী থাকতে পারে,' বললো সে। 'আপনার একা যাওয়াটা কি উচিত হবে? সাহায্য যেটা আসবে বলে ধারণা করছি আমরা, পৌঁছুতে কতোক্ষণ লাগবে তার কোনো ঠিক নেই, আদৌ পৌঁছুবে কিনা তাও বলা কঠিন। না, আমার মনে হচ্ছে···।'

'চিন্তা করো না,' বললো রানা। 'আমি আসছি ওরা জানে না।'

বারো

জঙ্গলের ভেতর দিয়ে প্রথম এক-দেড় মাইল ভালোই এগোলো রানা। মাথার ওপর গাছের ডাল আর লতাপাতা নিশ্ছিদ্র ছাদ তৈরি করেছে, সরাসরি নিচে নামার পথ পায়নি রোদ, শুধু একটা আভা মিহি ফুল-রেণুর মতো ছড়িয়ে আছে চারদিকে। সম্ভবত আলো কম বলেই মাটিতে প্রাণের চিহ্ন খুব একটা দেখা গেল না। পায়ের তলায় স্পঞ্জের মতো লাগলো মাটি। পচা লতাপাতায় পিচ্ছিল হয়ে আছে চারদিকে, উৎকট দুর্গন্ধে বমি আসে। লাস আনিমাস থেকে তীর্থযাত্রীরা সম্ভবত খুব একটা আসে না এদিকে।

দুর্গন্ধ আর জমাট নিস্তব্ধতা, শুধু এই দুটোকে জোরালোভাবে অনুভব করা যায়। একটা প্রাণীও চোখে পড়লো না রানার—না পাখি, না বানর বা সাপ। তবে কিছু ছাপ লক্ষ্য করলো ও। পথের ওপর পড়ে থাকা বড় একটা গাছের কর্কশ ছালের ওপর বড় একটা বিড়াল তার নখের আঁচড় রেখে গেছে। কিছু প্রাণীর পায়ের দাগও দেখলো, সম্ভবত পেকারি আর টেইপার-এর। পুরনো নদীর কিনারা পর্যন্ত আর কিছু চোখে পড়লো না। নদীটাকে জলাভূমি বলাই ভালো, কোথাও

কোথাও খুব গভীর, জলজ গাছের পাতায় প্রায় ঢাকা পড়ে আছে পানি।

পরবর্তী পাঁচশো গজ অত্যন্ত বাজে। সন্দেহ নেই ঘুরপথ ধরে গেলে এতোটা কষ্ট হতো না, কিন্তু ট্রেইলটা খুঁজে পায়নি রানা। ওর হাঁটু পর্যন্ত উঠে এলো কাদা। ঝাঁক ঝাঁক মশা আর মাছি চারদিক থেকে ঘিরে ফেললো। ধরাশায়ী গাছ টপকালো একের পর এক। কালো পানিতে প্রচুর প্রাণীর সন্ধান পাওয়া গেল—বক, কাইম্যান আর একজোড়া স্পুনবিল। সবচেয়ে বড় কথা, এই প্রথম একটা সাপ দেখতে পেলো ও। বিরাট সাপ, অ্যানাকোনডা। প্রথমে ওটার মাথা দেখতে পেলো, বাকি শরীর থেকে অন্তত তিন ফুট দূরে। শিকারের সন্ধানে ঘুর ঘুর করছে, ফণা তুলছে বাতাসে, তার বাকি অংশ অগভীর পানিতে কুণ্ডলী পাকিয়ে রয়েছে, বাদামি মাটিতে নীল-সবুজ নকশা কাটা গা, বাজুকার মতো মোটা।

নিজের নিরাপত্তার কথা একবারও ভাবলো না রানা, সহজেই পিছিয়ে আসার উপায় আছে ওর। তবে মিনিটখানেক স্থির দাঁড়িয়ে থেকে প্রাণীটার সৌন্দর্য উপভোগ করলো। সময়ের হেরফের হলে তেমন কিছু আসে যায় না, তবে মনোযোগে বিঘ্ন ঘটলে তা মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে, কথাটা মনে হতেই একটা ঝাঁকি খেলো রানা, মনোযোগী হলো নিজের কাজে—জলাভূমি ধরে আবার এগোলো। আকস্মিক বৃষ্টিটাকে পুরস্কার হিসেবে গ্রহণ করলো ও।

বৃষ্টি তো নয়, যেন জলপ্রপাতের মোটা ধারা। খানিক আগে থেকে শুরু হলে অপর তীরে হয়তো পৌঁছুনোই হতো না। পিঠে ঝুলছে ব্যাগটা, সেটার ভেতর পানি ঢুকতে পারে ভেবে উদ্বিগ্ন হলো ও। হোঁচট খেলো পাড়ের সাথে। একটা বুট হারিয়ে গেল, তবে গ্রাহ্য

করলো না ও। হন হন করে হেঁটে আধা শুকনো মাটিতে উঠে এলো, সেখান থেকে চলে এলো জঙ্গলের ভেতর। মাথার ওপর আবার পাওয়া গেল ডাল আর লতাপাতার ছাদ।

ওর পথ থেকে ষাট ফুট দূরে রয়েছে ট্রেইলটা। পিছন দিকে তাকিয়ে জলাভূমির ওপর সরু একটা বাঁধ দেখতে পেলো ও, প্রকৃতির তৈরি, ওটার ওপর দিয়েই এদিকে অনেকটা এগিয়ে এসেছে ট্রেইল। ওটার দু'পাশে জলজ উদ্ভিদ এতো উঁচু হয়ে আছে যে ডান বা বামে দাঁড়ালে পাঁচ ফুট দূরে থেকেও দেখা যাবে না।

ভাগ্যকে দোষ দিয়ে নষ্ট করার মতো সময় রানার নেই। দশ মিনিটের মধ্যে বনভূমির মেঝেতে পৌঁছে যাবে বৃষ্টির পানি। তাছাড়া, লাস আনিমাসের প্রাচীন জনবসতি এখনো অনেকটা দূরে।

জলাভূমির এদিকটায় গাছগুলো আরো কাছাকাছি দাঁড়িয়ে আছে। ছালগুলো মসৃণ, ডগা আরো ওপর দিকে উঠেছে। কিছু গাছ রয়েছে জীবনে কখনো দেখেনি বা নাম শোনেনি রানা। সুন্দর লাগলেও, কোনো ফুল ছিঁড়লো না, ওগুলো বিষাক্ত হতে পারে। এদিকের জঙ্গলে সঙ্গী আছে, একা নয় রানা—নিরাকার নিস্তব্ধতাকে হটিয়ে দিয়ে জেঁকে বসেছে বৃষ্টি।

তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে নিরাপদ সীমানা ছাড়িয়ে যাবার কোনো ইচ্ছে না থাকলেও, সন্ধ্যের আগে ভালো একটা অবজারভেশন পোস্টে পৌঁছুতে চায় রানা। টার্গেট প্রায় দৃষ্টিসীমার ভেতর চলে এসেছে, এই সময় মাটি শক্ত আর ঢালু দেখে মেজাজ খারাপ হয়ে গেল ওর। পথের ওপর কিছু আছে, বুঝতেই পারেনি ও। খালি পায়ে, দুই আঙুলের মাঝখানে, কিসের যেন স্পর্শ পেলো। স্পর্শটা শক্ত আর কঠিন হয়ে উঠছে দেখে বিদ্যুৎ চমকের মতো বুঝতে পারলো, পিয়া-

নোর তার। স্থির হয়ে গেল রানা, পা-টা আর তুললো না। তারটা টপকে এলো সাবধানে।

তারের সাথে কি জড়ানো আছে, সি-ফোর নাকি শটগান, দেখার জন্যে থামলো না রানা। এই মুহূর্তে এমন কিছু করতে রাজি নয় যাতে মনোযোগ নষ্ট হতে পারে। একমাত্র এই গভীর মনোনিবেশই বাঁচিয়ে রাখতে পারে ওকে।

ঢাল বেয়ে ধীরে ধীরে নামলো রানা। হামাগুড়ি দিয়ে এগোচ্ছে, দীর্ঘ পা সহ বিশাল একটা ব্যাঙ যেন। চারদিকটা দেখে নিতে প্রতিবার যথেষ্ট সময় ব্যয় করলো ও। ইতিমধ্যে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে শরীর। পিঠে পঞ্চাশ পাউণ্ড বোঝা নিয়ে প্রচুর হেঁটেছে, এখন সেটাকে টেনে নিয়ে যেতে হচ্ছে। এভাবে খুব বেশিক্ষণ এগোতে পারবে না। জোর করে এগোতে চাইলে ঘন ঘন ভারসাম্য হারিয়ে ফেলবে।

দু'বার টেরই পায়নি তারের উপস্থিতি। সিধে হয়ে হাঁটছে রানা, সামান্য পিছনে ফেলে এসেছে একটা তার, জানে সামনে অন্তত বিশ-গজের মধ্যে আর কোনো তার নেই। হঠাৎ পায়ে বাধলো ওটা। শেষ মুহূর্তে নিজেকে সামলাতে পারলেও, তাতে শুধু পা-টা মাটিতে রাখা গেল, নাচের অস্থির ভঙ্গিতে বসে পড়তে হলো ওকে। তখনই চাপ পড়লো তারটায়। বুঝলো, পরবর্তী নিঃশ্বাসের সাথে বিস্ফোরিত হতে যাচ্ছে ফাঁদটা, পরবর্তী ঘামের ফোঁটার সাথে। অন্ধের মতো পথ থেকে লাফ দিলো ও, গড়িয়ে দিলো শরীরটা।

ওর কাঁধে ঘষা খেলো অস্ত্রটা। জ্যা মুক্ত হবার শব্দটা পরিষ্কার শুনতে পেলো রানা। পরিষ্কার কানে বাজলো টংকার। ভেজা শার্ট-টায় হ্যাঁচকা টান পড়লো। মিসাইলটা ঘ্যাঁচ করে গেঁথে গেল ওর দশ ফুট পিছনের একটা গাছের গায়ে। তীর।

ক্রসবো-অ্যারো। বিশাল এক গাছের চার ফুট উঁচু কাণ্ডে বিঁধেছে, ট্রেইল থেকে তিন ফুটেরও কম দূরে। ধনুকটা যুক্তরাষ্ট্রে তৈরি, বিয়ার নামে পরিচিত, ক্যামোফ্লেজ-কোটেড, বাঘ-ভাল্লুক মারার জন্যে অত্যন্ত শক্তিশালী একটা হাতিয়ার। প্রাণ হরণের জন্যে মাংসের গভীরে প্রবেশ করার দরকার নেই, তীরের ডগায় যদি বিষ মেশানো থাকে। স্থানীয় বিষ কিউরেয়ার, তবে অন্যান্য আরো অনেক বিষ সংগ্রহ করা সম্ভব।

রানার মনে পড়ে গেল, প্রায় একমাস হতে চললো মেডিলিনের হোটেল স্যুইটে মৃত্যুর খুব কাছাকাছি চলে গিয়েছিল ও। আজও ঠিক তাই ঘটলো। এখনো বেঁচে আছে, সেটা ওর ভাগ্য, শুধু সতর্ক থাকার পুরস্কার নয়। কিন্তু ভাগ্য কি বারবার সাহায্য করবে? তীর না হয়ে, এরপর যদি বিস্ফোরক হয়?

কাজেই অত্যন্ত সাবধানে এগোলো রানা। বৃষ্টির পানি গড়িয়ে জঙ্গলের মাটিতে এলো, একই সাথে ডাল আর লতাপাতার আবরণ ভেদ করে ওপর থেকেও ঝরতে শুরু করলো। আর একটু পরই অন্ধকার নামবে। রানা জানে, যন্ত্রণাদায়ক ও মন্থরগতি প্রতিযোগিতায় নেমেছে ও, প্রকৃতি ও মানুষের সাথে।

অতিমাত্রায় সতর্ক না হলে দ্বিতীয় ফাঁদটা দেখতেই পেতো না রানা। দৃষ্টিসীমার ভেতর প্রতিটি আকার আকৃতির খুঁটিনাটি বৈশিষ্ট্য গভীর মনোযোগের সাথে লক্ষ্য করছে ও। নির্দিষ্ট একটা দূরত্ব ঠিক করে নিচ্ছে, কখনোই সেটা পনেরো ফুটের বেশি নয়। এগোবার সময় শুধু ওই পনেরো ফুটের প্রতি ইঞ্চির ওপর নজর রাখছে। যখন দেখলো গাছ থেকে খানিকটা নেমে শিকড়টা পথের ওপর দিয়ে চলে গেছে, থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো ও, সেটাকে এড়িয়ে যাবার সহজ রাস্তাটা

হাতছানি দিয়ে ডাকলেও সাড়া দিলো না।

লোকজন সরাসরি ওই ঝুলে থাকা শিকড়টার নিচে দিয়ে হেঁটে গেছে, তারাও যেন কিছু সন্দেহ করেছিল। গভীর একটা জঙ্গলের ভেতর অনুকরণ প্রবণ শব্দ ও বস্তুর কোনো অভাব নেই—অনেক পাখি দেখতে হুবহু ঠিক যেন একটা ফুল, পোকাকে মনে হয় পাতা, এমন অনেক সাপ আছে দেখে মনে হবে শিকড়—উদ্দেশ্য ছাড়া কোনো লোক তা করতে যাবে না। সাধারণ বুদ্ধিতেই বোঝা যায়, আরেক পথে নিয়ে যেতে চাওয়ার পিছনে নিশ্চয়ই বড় কোনো কারণ আছে।

পথ ছাড়লো না রানা, ঝুলে থাকা শিকড়টার নিচ দিয়েই এগোলো। খানিকটা এগিয়ে এসে ঘুরলো ও, ট্রেইলের পাশের বিবর্ণ মাটিতে তাকালো। সতর্ক চোখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর পাম গাছের পাতা দিয়ে তৈরি ছোট্ট পর্দাটা দেখতে পেলো ও, ট্রেইলের দিকে নব্বুই ডিগ্রী কোণ সৃষ্টি করেছে ওটা। তার খুঁজতে খুঁজতে সাবধানে, একটু একটু করে এগোলো রানা। তার পাওয়া গেল না, তবে মাইনটা পাওয়া গেল। প্রথমে রানা দেখতে পেলো লাল তীর চিহ্নটা। মাইন-টা খুদে একটা স্ট্যাণ্ডের ওপর বসানো রয়েছে, ছ'ইঞ্চি উঁচু। চিনতে পারলো রানা। ক্লাইমোর। মাইনের ওপর লাল তীর চিহ্ন যে-দিকটা নির্দেশ করছে সেদিকেই বিস্ফোরণ ঘটবে। নির্দেশ করছে ট্রেইলের পাশের সরু জায়গাটা।

শিকড়ের তলা দিয়ে না পেরুলে এতোক্ষণে ছাতু হয়ে যেতো রানা। ভাগ্যগুণে যদি না-ও মরতো, বিস্ফোরণের শব্দটা কাজ করতো অ্যালার্ম হিসেবে, শোনা যেতো অনেকটা দূর থেকে। বুঝতে অসুবিধে হলো না, সেটলমেণ্ট থেকে এখন আর খুব বেশি দূরে নেই ও।

ক্লাইমোর ছাড়িয়ে পঞ্চাশ গজও এগোয়নি রানা, রোদের মাত্রা কমে

আসছে দেখে এই প্রথম ট্রেইল ত্যাগ করলো ও। কিনারার কাছে ঘন হয়ে গেছে জঙ্গল, আলো পাবার জন্যে গাছপালাগুলো বেপরোয়া প্রতিযোগিতা শুরু করেছে। ভুরু কুঁচকে উঠলো রানার। শেষ সীমায় বনভূমি আরো ঘন হওয়ার কথা, দেখে মনে হবে দুর্ভেদ্য। একটু পরই কারণটা বোঝা গেল। জঙ্গল ঘন হতে পারেনি ক্যামোফ্লেজ নেট-এর জন্যে। জালগুলো বিশাল, প্রতি এক জোড়া গাছের মাঝখানে ঝুলছে ফাঁকা জায়গাটাকে আলাদা করেছে ওগুলো। আলাদা করেছে লাস আনিমাসের প্রাচীন ধ্বংসাবশেষকে।

বড় আকারের চারটে দালান দেখলো রানা। সবগুলো পুরনো। প্রতিটির ভিত আর থাম পাথরের তৈরি। এ-ধরনের পাথর শুধু পাহাড়ী শহরে দেখা যায়। পাঁচিল আর দেয়ালগুলো পাথর আর ইঁট দিয়ে গাঁথা। প্রধান ভবনটা সম্ভবত জেসিউইট চার্চ। বিশাল কাঠামো ওটার, সবগুলো জানালা দরজার সামনে ইঁটের পাঁচিল খাড়া হয়ে আছে। কোনো সন্দেহ নেই, ওটা একটা বুরুজ। সিটাডেল।

চোখে স্কোপ তুললো রানা। ক্যাম্পের প্রতিটি জিনিস চিনতে পারলো—হেঁসেল, শোবার ঘর, কমিউনিকেশন সেন্টার, সাপ্লাই শেড। তবে সিটাডেলটা কি কাজে ব্যবহার করা হয় বুঝতে পারলো না ও। ওটার ডান দিকে আরো একটা ছোটো দালান রয়েছে, চৌকো। এই দুটো বিল্ডিঙে কেউ আসা-যাওয়া করছে না।

ওগুলোর ভেতর কি কোকেন আছে? পশ্চিম গোলার্ধের অর্ধেক কোকা পেস্ট তাহলে কি রানার নাগালের মধ্যে, হাত বাড়ালেই ছোঁয়া যাবে? পেস্ট সহজে নষ্ট হয় না, মনে পড়লো ওর। এক জায়গায় অনেক দিন রাখা যায়। এই আবহাওয়ায় কোকেন ক্রিস্টাল নরম খয়েরি পুডিং-এর মতো হয়ে যাবে। কিন্তু পেস্ট একই রকম থাকবে,

যদি না আরেকটা কেসই কম্পাউণ্ড-এর সাহায্যে ওটার আয়ু কমানো হয়।

কলম্বিয়া থেকে বিষ ছড়ানো হচ্ছে, তীব্র যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে গোটা দুনিয়া। বাংলাদেশও নিষ্কৃতি পাচ্ছে না। সেই বিষের প্রবাহকে থামিয়ে দেয়ার একটা সুযোগ আসছে রানার সামনে।

ওকে শুধু মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হবে, শান্ত করতে হবে মনটাকে। গুনে দেখতে হবে সব মিলিয়ে কতোজন আছে ওরা এখানে। হিসেব করে বের করতে হবে সঠিক দূরত্ব। তারপর রাত নামার অপেক্ষায় থাকা। ভাগ্য ভালো হলে আবার বৃষ্টি হবে রাতে। পানির শব্দ আর আড়াল পেলে ভেতরে ঢুকতে সুবিধে হবে রানার। প্রথমে গার্ডদের কাবু করবে ও, একজন একজন করে। তারপর সরাসরি হামলা চালাবে কোকা পাতা বা পেস্টের গুদামে। সবশেষে ধাওয়া করবে হেনেরিক মুলারকে।

সময়ের আগেই সুযোগটা পেয়ে গেল রানা, কিন্তু বুঝতে দেরি করায় হাতছাড়া হয়ে গেল সেটা। বুড়ো একজন মানুষকে দেখতে পেলো ও। সিটাডেলের ভেতরের উঠন দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে, যাচ্ছে একটা নিশ্ছিদ্র দেয়ালের দিকে। মাথায় স্ট্র হ্যাট, কপালের ওপর নেমে এসেছে। পায়ে স্নীকার। কোমরে ছোট্ট শর্টস, গায়ে ঢিলেঢালা সাদা শার্ট। দেখেও রানা বিশ্বাস করতে পারলো না যে এই লোককে ধরার জন্যেই হাজার হাজার মাইল পথ পাড়ি দিয়ে এখানে এসেছে ও। পরিষ্কার চিনতে পারলো তা নয়, চেনা চেনা লাগলো। কপালটা চওড়া। মুখে মাংস আর চর্বির এতো বেশি আধিক্য যে ঠোঁটের যেন কোনো অস্তিত্বই নেই।

মুলারের একটা ছবি গাঁথা আছে রানার মনে, সেটার সাথে চেহারা-

টা মেলাবার চেষ্টা করছে ও, ঠিক এই সময় অদ্ভুত ঘটনাটা ঘটলো। মনোযোগ ছুটে গেল ওর। চোখের পলকে অদৃশ্য হয়ে গেল বৃদ্ধ। মনে হলো নিরেট পাথর ভেদ করে সিটাডেলের ভেতর ঢুকে গেলেন রলফ মুয়েলার।

তেরো

রাত নামার পর আরো এক ঘণ্টা বৃষ্টির জন্যে অপেক্ষা করতে হলো রানাকে। তারপর রওনা হলো।

বাড়িগুলো থেকে উঠনে যারা মাঝে-মধ্যে বেরিয়েছে তাদের সংখ্যা আঠারো। জঙ্গলের কিনারা ঘেঁষা পাঁচিলের কাছে পাঁচকোণা একটা কাঠামো পাহারা দিচ্ছে আরো পাঁচজন গার্ড। ভবনগুলোর ভেতর লোক থাকতে পারে। ওর একার তুলনায় লোকসংখ্যা অনেক বেশি হলেও, সমাধানের অযোগ্য কোনো সমস্যা দেখতে পেলো না রানা। সনাক্ত করা না গেলে লাস আনিমাস নিরাপদ আস্তানা হিসেবে আদর্শ। কিন্তু হদিশ পাবার পর সমস্ত সুবিধে আক্রমণকারীর। চারপাশের জঙ্গলে অবাধে বিচরণ করা যায়, আড়াল পাওয়া কোনো সমস্যা নয়, পিছু হটে নিরাপদ জায়গায় সরে যাওয়াও সম্ভব।

গার্ডদের মেরে ফেলার কোনো ইচ্ছে নেই রানার, তবে পরিস্থিতি ওকে বাধ্য করতে পারে। ঝম ঝম বৃষ্টির মধ্যে লোকগুলো কয়েক হাত দূরের জিনিসও দেখতে পাচ্ছে না, রানার জন্যে এটা একটা মস্ত সুবিধে।

গার্ডরা কোথায় আছে আগেই দেখে রেখেছে রানা। তাদের এক-জনকে লক্ষ্য করে এগোবার সময় ভারি অস্বস্তিবোধ করলো ও। সামনে কি যেন একটা ঝুলছে। মোটা তার দিয়ে গাছের সাথে বেঁধে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে, জিনিসটা ঠিক চেনা যাচ্ছে না। অন্ধকারে ঠাহর করা গেল না, মনে হলো একটা মানুষ। চোখে স্কোপ তুলে তাকাবার পর অস্বস্তি আরো বেড়ে গেল ওর। ঠিক মানুষ বলেও মনে হলো না।

আকৃতিটা মানুষের, কালো একটা মানুষের, সম্ভবত হাতে তৈরি একটা কাকতাড়ুয়া। কিন্তু তাই বা কি করে হয়! জঙ্গলের প্রতিকূল পরিবেশ কাঠামোটার গায়ে দাঁত বসিয়েছে, এখান-সেখান থেকে ঝুলে পড়েছে কিছু কিছু অংশ, জট পাকিয়ে গেছে চুল, পচে গলে খসে পড়েছে নাড়িভুঁড়ি। জিনিসটা যাই হোক না কেন, ওটার সাথে মানুষের মিল আছে।

মাথার ওপর ঝুলে থাকা জিনিসটা সম্পর্কে গার্ড যেন সচেতন নয়। পাহারা দেয়ার সাধারণ নিয়মগুলোও পালন করছে না সে। পরনে জ্যাকেট আর হ্যাট, জঙ্গলের দিকে খানিকটা পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছে, অ্যাসল্ট রাইফেলটাকে এমনভাবে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে রেখেছে, ওটা যেন বৃষ্টিভেজা দিনে ঘরের বউ। বেমক্কা ধাক্কা খেয়ে মাটিতে পিঠ দিয়ে পড়ার পর হুঁশ হলো লোকটার, গলায় ছুরির পাঁচ ইঞ্চি ব্লেড। 'গার্ড কখন বদল হয়?' জিজ্ঞেস করলো রানা।

রানার কাদামাখা মুখটা দেখে আঁতকে উঠলো লোকটা, সম্ভবত

মাথার ওপর ঝুলন্ত আকৃতিটার সাথে মিল খুঁজে পেয়েছে। 'আটটায়!' ভাঙা গলায় বললো সে।

তারমানে এক ঘণ্টা পনেরো মিনিট সময় পাওয়া যাবে, ভাবলো রানা। বাইরে এই মুহূর্তে যারা পাহারায় রয়েছে তাদের সব ক'টাকে কাবু করার জন্যে যথেষ্ট সময়। ছুরি ছেড়ে দিয়ে লোকটার নাকে-মুখে কয়েকটা ঘুসি মারলো ও, শেষটা কপালের পাশে। অজ্ঞান লোকটাকে বাঁধলো, রেখে এলো জঙ্গলের আড়ালে। বাকি থাকলো চারজন।

পঁয়তাল্লিশ মিনিট সময় নিলো রানা। ফাঁকা জায়গাটার কিনারা ধরে একটা চক্কর দিলো, তারপর একজন একজন করে ধরলো ওদেরকে। প্রথম তিনজনের ওপর অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়লো, কেউই তেমন ধস্তাধস্তি করার সুযোগ পেলো না। নাইলন কর্ড দিয়ে হাত-পা বেঁধে রেখে এলো ঝোপের ভেতর। কিন্তু বাকি একজন টের পেয়ে গেল ওর উপস্থিতি, উজি বি দিয়ে গুলি না করে উপায় থাকলো না রানার। তুমুল বৃষ্টি আর চওড়া পাঁচিলে বাধা পেয়ে গুলির শব্দ অনেকটাই চাপা পড়ে গেল, রানা আশা করলো বাড়িগুলোর ভেতর থেকে শুনতে পায়নি কেউ।

চৌকো ভবনটার সমতল মাথায় রয়েছে গান-প্ল্যাটফর্ম। জঙ্গলের কিনারা থেকে শুরু হয়েছে কাঁটাতারের বেড়া, বেড়া থেকে তিরিশ গজ দূরে ভবনের দেয়াল। বেড়াটা গরু-ছাগলকে ঠেকাতে পারবে, তার কাটার যন্ত্র থাকায় রানার জন্যে কোনো বাধা হতে পারলো না। বৃষ্টি আর অন্ধকারের মধ্যে নির্বিঘ্নে বাকি ফাঁকা জায়গাটুকু পেরিয়ে এলো ও, পৌঁছে গেল ভবনটার পিছন দিকে।

কাঠামোটা অদ্ভুত। শুধু ছাদটা সমতল নয়, ভবনের সামনে-পিছনে

চৌকো স্তম্ভ খাড়া হয়ে রয়েছে। খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর রানার মনে হলো, থাম বা স্তম্ভগুলো সম্ভবত কোনো এক সময় গ্যালারি বা পোর্টিকোর অবলম্বন হিসেবে কাজ করেছে। ওগুলোর মাথা থেকে ক্রমশ ঢালু হয়ে ভবনের মাথায় নেমে আসে একটা ছাদ, যদিও আজ সেটার আর কোনো অস্তিত্ব নেই, বহুকাল আগে ধসে পড়েছে। তবে স্তম্ভগুলো থেকে, বিশেষ করে বাঁ দিকের তৃতীয়টা থেকে, ভবনের সমতল ছাদ পরিষ্কার দেখা যায়, মাঝখানে মাত্র ছ'-ফুটের মতো দূরত্ব।

একটা স্তম্ভ বেয়ে উঠলো রানা।

দু'জন লোককে দেখলো ও। স্বচ্ছ প্লাস্টিকের তলায় জড়াজড়ি করে শুয়ে রয়েছে। দু'জনেই যে যার বুকে মুখ গুঁজে পড়ে আছে, মুখ তুলে তাকালেই জঙ্গলের কিনারা পরিষ্কার দেখতে পাবে। খোলা মাঠের দিকে তাক করা রয়েছে ৫'৫৫ এমএম বেলজিয়ান মিনিমি, এক টুকরো স্বচ্ছ প্লাস্টিকের তলায় পড়ে রয়েছে অ্যাসল্ট রাইফেল।

গুলি করলে দূর থেকে মাজল ফ্ল্যাশ দেখা যাবে, তাছাড়া আহত না হয়ে লোক দু'জন মারাও যেতে পারে। স্তম্ভের মাথা থেকে লাফ দিলো ও।

কাপড়চোপড় ভিজে যাওয়ায় ওজন বেড়েছে, তার সাথে যোগ হলো বৃষ্টির চাপ, লাফ দেয়ার আগে ছোটার সুযোগ না থাকায় হিসেবে সামান্য ভুল হয়ে গেল রানার। ছাদের বাড়তি কিনারায় খালি পা দিয়ে পড়লো ও, পিছলে গেল, ঘষা খেয়ে ছিঁড়ে গেল হাঁটুর চামড়া। খসে পড়ছে রানা, শেষ মুহূর্তে এক হাতে ছাদের কিনারা ধরে ফেললো। পেণ্ডুলামের মতো দুলতে শুরু করলো ভারি শরীরটা। ভিজে ছাদ থেকে পিছলে নেমে আসছে হাত। প্লাস্টিকের তলা থেকে

লোকগুলো বেরিয়ে এলেই সর্বনাশের ষোলোকলা পূর্ণ হয়। বুটের আঘাতে হাতের আঙুলগুলো থেঁতলে দিলে নিজেই ছাদের কিনারা ছেড়ে দেবে ও।

দু'হাত দিয়ে ছাদের কিনারা ধরে মোচড়ামুচড়ি শুরু করলো রানা। কিনারায় শরীরটা প্রায় তুলে ফেলেছে, এই সময় ছাদে শুয়ে থাকা লোকগুলোর মধ্যে একজন ঘাড় ফিরিয়ে ওর দিকে তাকালো।

দু'সারি দাঁতের ফাঁক থেকে ছুরিটা নিয়ে ছুঁড়লো রানা। সরাসরি কপালে লাগলো সেটা। দ্বিতীয় লোকটা মেশিনগান তাক করার সময় না পেয়ে চেঁচিয়ে উঠতে গেল, নিজেদের লোকজনকে সতর্ক করতে চায়। হাঁ করলো সে, রানার লাথিটা খেলো গলায়, ফলে চিৎকারটা শুরু হতে না হতে থেমে গেল।

জার্মান উচ্চারণ, ধরতে পারলো রানা। হেনেরিক মুলার তাহলে দেশী লোকদের দিয়ে কাজ করাচ্ছেন।

কপালে ছুরি খেয়ে প্রথম লোকটা জ্ঞান হারায়নি বটে, তবে রক্ত দেখে ভয়ে এতোটাই আড়ষ্ট হয়ে পড়েছে যে হাড়ের ভেতর সামান্য ঢুকে যাওয়া ছুরির ডগাটা টেনে বের করতে পারেনি। কপালের পাশে দ্বিতীয় লাথি খেয়ে তার সঙ্গী জ্ঞান হারিয়েছে।

ছুরিটা কপাল থেকে টেনে নিলো রানা, লোকটার গলায় এমনভাবে চেপে ধরলো ব্লেড যাতে নিঃশ্বাস ফেলতে না পারে। 'তোমার নাম কি?' জার্মান ভাষায় জানতে চাইলো ও।

নিজের নাম বললো লোকটা, 'ব্রান্ট।'

'কি কাজ করো?'

'এঞ্জিনিয়ার।'

হেসে উঠতে ইচ্ছে করলো রানার, কারণ জানে জার্মান সামরিক

বাহিনীর এঞ্জিনিয়ার মানে এক্সপ্লোসিভ টেকনিশিয়ান। ড্রাগোনো-ভিচের বর্ণনা দেয়া টেনিং সেন্টার তাহলে মিথ্যে নয়। 'এখানে তোমাকে কি কাজের জন্যে আনা হয়েছে?'

জবাব দিলো না ব্রান্ট। ছুরির ডগাটা গলার চামড়ায় খানিকটা ঢোকালো রানা, বেরোবার সাথে সাথে বৃষ্টিতে ধুয়ে গেল রক্তের কয়েকটা ফোঁটা। এরপর তাড়াতাড়ি মুখ খুললো ব্রান্ট। একটা মাত্র শব্দ উচ্চারণ করলো সে।

সাধারণ ধর্মঘট। বন্দী হবার আগে ও পরে ধর্মঘটের হুমকি দিয়েছে লজেন। বোঝা গেল, প্রোগ্রামটা বাতিল করা হয়নি। বরং নতুন মাত্রা যোগ করা হয়েছে। হোয়াইট গামার ট্রেনিং পাওয়া ক্যাডারদের দিয়ে সরকারী প্রতিষ্ঠানে হামলা চালাবার প্ল্যান করেছেন রলফ মুয়ে-লার। মুক্তিপণ হিসেবে লজেনকে ফেরত চাইবেন?

'হ্যাঁ,' উত্তর দিলো ব্রান্ট। 'খুব তাড়াতাড়ি পাল্টা আঘাত হানা হবে।'

এঞ্জিনিয়ারের কাছ থেকে আরো অনেক তথ্য জেনে নেয়ার দরকার ছিলো, কিন্তু এরইমধ্যে অনেক সময় নষ্ট করেছে রানা। তাছাড়া পরি-কল্পিত হামলার চূড়ান্ত সময়সীমা জানা আছে ওর। তবে এমন একটা সম্ভাবনাময় তথ্য-ভাণ্ডারকে ঘুম পাড়াতে খারাপই লাগলো ওর।

লোক দু'জনের হাত-পা বেঁধে মুখে কাপড় গুঁজে দিলো রানা। তারপর মিনিমিটাকে অকেজো করলো। প্লাস্টিক আবরণের নিচে অ্যাসল্ট রাইফেলের সাথে জোড়া লাগানো একটা ৪০ এমএম গ্রেনেড লঞ্চারও পেলো ও, প্রচুর অ্যামুনিশন সহ।

অস্ত্র দুটো হাতে আসায় প্ল্যান একটু বদলাতে হলো রানাকে। অতিরিক্ত যন্ত্রপাতি সাথে রাখতে পছন্দ না করলেও, জার্মান লোক-

টাকে একটা ইয়ার-মাইক্রোফোন পরে থাকতে দেখে খুশি হয়ে উঠলো ও। গ্রেনেড লঞ্চারটাও নিলো, ক্যামোফ্লেজ ভেস্ট-এর পকেটে ভরলো অনেকগুলো গ্রেনেড। স্বচ্ছ প্লাস্টিকের টুকরোটা মাথায় দিয়ে তিন ফুট লম্বা দরজাটা খুললো। ছাদ থেকে ভবনটার ভেতরে ঢোকার এটাই একমাত্র পথ।

পাথুরে একটা সিঁড়ি, দেয়াল ঘেঁষে মৃদু আলোর একটা উৎসের দিকে নেমে গেছে। শেষ ধাপটা থেকে দশ ফুট ওপরে রয়েছে রানা, প্রথম লোকটাকে দেখতে পেলো। কেরোসিন ল্যাম্পের লালচে আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে আছে মুখ, আলোর দিকে ঝুঁকে পেপারব্যাক পড়ছে সে। মুখ তুলে সরাসরি রানার দিকে তাকালো।

যেমন নামছিল তেমনি নামতে লাগলো, রানার মধ্যে আড়ষ্ট বা দ্বিধার কোনো ভাব নেই। মুখের সামনে হাত তুলে রেখেছে, ভঙ্গিটা দেখে মনে হবে মাথা থেকে প্লাস্টিক নামাতে যাচ্ছে। জিনিসটা নামাতে যথেষ্ট দেরি করলো ও। যখন বুঝলো বই পড়ুয়া লোকটার কৌতূহল বেড়ে গেছে, তারপর আর দেরি করলো না। কিছু করার আগে আশ-পাশে আর কেউ আছে কিনা জেনে নেয়া দরকার।

সুযোগ হলো না। চেয়ার থেকে সামান্য একটু উঁচু হলো লোকটা, গলা লম্বা করে প্লাস্টিকের নিচের মুখটা ভালো করে দেখতে চাইলো, পরমুহূর্তে বগলের তলায় আটকানো সুইভেল হোলস্টার থেকে হ্যাঁচকা টানে বের করে আনলো কেজি-নাইন।

এরকম ক্ষিপ্র লোক খুব কমই দেখেছে রানা। ওর তিনটে গুলির একটা বিস্ফোরণ আঘাত করলো লোকটার ওপরের ধড়ে, তারপরও কেজি-নাইন থেকে বেরিয়ে এলো ছয় কিংবা আট রাউণ্ড গুলি, সিঁড়ির পাশের দেয়ালে লেগে ছুটে গেল ওপর দিকে।

ব্যাপারটা এতো অপ্রত্যাশিত যে বোকার মতো নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকলো রানা, নড়ার কথা ভুলে। গুলি শেষ হতে সংবিৎ ফিরলো ওর।

কেউ ছুটে এলো না। বা কোনো শব্দও শোনা গেল না। গোটা বাড়ি নিস্তব্ধ। তারমানে ভেতরে আর কেউ নেই। এখনো তুমুল বৃষ্টি হচ্ছে, তা না হলে অটোমেটিক রাইফেলের আওয়াজ পাশের ভবনগুলো থেকে নিশ্চয়ই শোনা যেতো। তবু, সিঁড়ির উল্টোদিকের বড়সড় ধাতব দরজার দিকে চোখ রেখে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলো রানা।

আকার দেখে মনে হলো, ওটা সম্ভবত কোনো ভল্টের দরজা। পুরোদস্তুর একটা সামরিক হেলিকপ্টার অথবা একটা কার্গো প্লেনে করে এখানে আনা হয়েছে ওটাকে।

চিন্তিত হয়ে উঠলো রানা, কারণ লাস আনিমাসের আশপাশে কোনো হেলিপ্যাড বা ল্যাণ্ডিং স্ট্রিপ দেখেনি ও। আস্তানাটার চারদিকে চক্কর দিয়েছে ও, চোখে স্কোপ নিয়ে পরীক্ষা করেছে প্রতিটি গজ। ভাবলো, ক্যামোফ্লেজ নেট গুটিয়ে নিলে কি একটা রোটারি-উইং টাইপের আকাশযান ল্যাণ্ড করতে পারবে? অসম্ভব নয়।

শুধু দরজাটা নয়, মেঝেতে রাখা কাঠের বাক্সগুলোও অস্বস্তির মধ্যে ফেলে দিলো রানাকে। ছ'ফুট উঁচু একেকটা, অত্যন্ত শক্ত কাঠ দিয়ে তৈরি। একটা হুলিগান বার ছাড়া ওটা খোলার কথা ভাবাই যায় না। ডেস্কের নিচে লোহার একটা রড পাওয়া গেল, কাজ চলতে পারে।

চেয়ারে দাঁড়িয়ে কাজ শুরু করলো রানা। পেরেকমুক্ত করে ঢাকনিটা খুলে ফেললো। ভেতরের প্যাকেটগুলো স্বচ্ছ প্লাস্টিকে মোড়া।

প্রতিটি প্যাকেটে জমাট বাঁধা কি যেন রয়েছে, স্ফটিকের মতো। কোনো প্যাকেটে এক টুকরো, কোনোটায় একাধিক। জিনিসগুলোর রঙ সাদাটে-হলুদ। পাথরের মতো শক্ত।

প্রথমে চিনতে পারলো না রানা, তারপর কোকেন তৈরির পদ্ধতিটা মনে পড়ে গেল ওর। কোকা পাতা থেকে পেস্ট, পেস্ট থেকে ক্রিস্টাল, তারপর কখনোসখনো, ক্রিস্টাল থেকে রক বা পাথর। কোকেনকে বাজারে ছাড়ার আগে আজকাল প্রায়ই শক্ত পাথরে পরিণত করা হচ্ছে। পদ্ধতিটা সম্পর্কে বিশদ বর্ণনা দিয়েছিল কালভিন। ইংরেজিতে পদ্ধতিটাকে বলা হয়, ফ্রিবেস বা ক্র্যাক। ফ্রিবেস বা ক্র্যাক যে-কোনো ড্রাগসের চেয়ে অনেক বেশি ঘন আর মারাত্মক। এক কিলো কোকেন পেস্ট আর এক কিলো ফ্রিবেসের দামের মধ্যে আকাশপাতাল পার্থক্য রয়েছে। ফ্রিবেসকে মহার্ঘ্যবস্তু বলা যেতে পারে।

জঙ্গলের ভেতর কিভাবে কোকেন আসছে, এখনো বুঝতে পারছে না রানা। জলাভূমির সবটাই অগভীর, এ-কথা মনে করার কোনো কারণ নেই। পানিতে সী-প্লেন নামা-ওঠা করতে পারে। জলাভূমিতে অনেক গাছ পড়ে থাকতে দেখেছে ও, ধারণা করেছিল মড়ক লাগায় বা পচন ধরায় ধরাশায়ী হয়েছে ওগুলো। এখন মনে হচ্ছে, সম্ভবত বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ফেলে দেয়া হয়েছে ওগুলোকে। সন্দেহ নেই, এ-ধরনের কাজের জন্যে ব্রাণ্ট অত্যন্ত উপযুক্ত লোক। গাছগুলোকে সরিয়ে দিয়ে পানিপথটাকে যানবাহনের উপযোগী করা হয়েছে। একটা মাত্র প্লেন কয়েক মিলিয়ন ডলারের ফ্রিবেস বহন করতে পারে।

বাক্সগুলোর ভেতর কোকেনের ছোটো একটা করে পাহাড় রয়েছে। রাস্তায় বিলি করে দাও, মহামারীর আধুনিক সংস্করণ দেখতে পাবে। সন্দেহ নেই, কোকেনের এই পাথর সুদূর বাংলাদেশেও পাঠানো

হতো। ন্যাশনাল সিকিউরিটি এজেন্সির অনুরোধে রাজি হয়ে অ্যাসাইনমেন্টটা গ্রহণ করায় নিজের ওপর খুশি হয়ে উঠলো রানা।

কঠিন কোকেনের পরিমাণ আর বাক্সগুলোর আকার একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়ালো। কিভাবে কি করলে সহজেই জিনিসটা ধ্বংস করা যাবে বুঝতে পারছে না। কিছু একটা পাওয়া দরকার, খুঁজতে শুরু করলো, যদিও ঠিক জানে না কি খুঁজছে। এই বিপুল কোকেন ধ্বংস করা সম্ভবই হতো না ভবনটার এক কোণে টলুয়েন-এর ড্রাম তিনটে না পেলে। টলুয়েন কেমিক্যাল সলভেন্ট, কোকেন পরিশোধনে লাগে। টিএনটি তৈরি করারও একটা উপাদান জিনিসটা। সি-ফোর আর স্থানান্তরিত ড্রামগুলোর মাঝখানে তারের সংযোগ দিলো রানা, ফলে শুধু কোকেন নয়, পাথুরে দেয়ালগুলোর ভেতর যা কিছু রয়েছে, সব উড়িয়ে দেয়া যাবে।

বিস্ফোরণের সাথে সাথে কোকেন সম্রাটের কয়েক বছরের রোজগার মিলিয়ে যাবে বাতাসে। তবে, রানা জানে, এ-ধরনের এক-আধটা আঘাতে তেমন কোনো ক্ষতি হবে না কার্টেলের। নিজের ওপর বিশ্বাস আছে ওর, মোক্ষম এমন একটা আঘাত করবে যে মুখ থুবড়ে পড়ার পর আবার সিধে হতে কয়েক বছর লেগে যাবে ওদের।

হেনেরিক মুলারকেও ধরবে ও। প্রথম দিকে ব্যাপারটা ছিলো, একজন নাৎসী অপরাধীকে আটক করা। পরে জানা গেছে, মেডিলিন কার্টেলের ব্রেন বলতে মুলারকে বোঝায়। দশ বছর আগে সাঁতেলা লজেন অসুস্থ হয়ে পড়ার পর মঞ্চে প্রবেশ করেন মুয়েলার, ভিক্টরকে পথনির্দেশ দেন, কার্টেলকে গড়ে তোলেন গেস্টাপোর আদলে। বিশ বছর আগে, ধরা পড়ার আতংকে যে সিটাডেলটা তিনি তৈরি করেন, পরে সেটাই ড্রাগ ব্যবসার হেডকোয়ার্টার হয়ে ওঠে।

বাড়িটা থেকে বেরিয়ে আসার আগে, টেপ দিয়ে কব্জিতে একটা ডিটোনেটর লাগিয়ে নিলো রানা, যাতে পরিবর্তিত যে-কোনো পরিস্থিতিতে ফ্রিবেস কোকেনের পাহাড়টা ধুলোর সাথে মিশিয়ে দিতে পারে ও। দু'মিনিট সময় নিয়ে ধ্যান করলো, সাহায্য নিলো অটো-সাজেশন-এর। মনের প্রতিটি অংশে পাঠিয়ে দিলো একটি জরুরী বার্তা, একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো ডিটোনেটরটা অ্যাকটিভেট করা। সুইচটা অন করতে এখন আর কোনো রকম দ্বিধায় ভুগবে না রানা, এমনকি মৃত্যুর মুখে পড়লেও।

এরপর উঠনে বেরিয়ে এলো ও, বৃষ্টির ভেতর স্বাভাবিক ব্যস্ততার সাথে হাঁটতে শুরু করলো। হোমিং ডিভাইসটা অ্যাকটিভেট করা যায়, অপারেশনে অংশগ্রহণ করার জন্যে পৌঁছে যাবে ডি. এ. এস., কিন্তু ট্র্যান্সমিশন ইন্টারসেপ্ট করা হতে পারে ভেবে ঝুঁকিটা নিতে চাইছে না। মুয়েলারের কমিউনিকেশন সেন্টারের রেডিও হয়তো বিভিন্ন ওয়েভলেংথে সেট করা নেই, তবু দুর্ভাগ্যবশত ধরা পড়ে যেতে পারে রানা। মুয়েলারের কমিউনিকেশন সেন্টারটা একবার দেখা দরকার। নিশ্চয়ই অত্যাধুনিক ইকুইপমেন্ট আছে ওখানে।

নেই মানে! দু'জন লোক রয়েছে ডিউটিতে, বসে আছে সামনে একটা কনসোল নিয়ে। কনসোলে তিনটে রেডিও, একটা রাডার-স্কোপ, সাথে ডিজিটাল ফ্রিকোয়েন্সি ইকুইপমেন্ট। ছোটো বাড়িটায় ঢুকেছে রানা, বাইরে কোনো পাহারা নেই। নিজেকে আড়াল করার কোনো চেষ্টাই করলো না ও, যেন দলেরই একজন লোক সে। আগের মতোই প্লাস্টিকের টুকরোটা দিয়ে মাথা ঢেকে রেখেছে। লোকগুলোর এতো কাছে এসে দাঁড়ালো, থুথু ছুঁড়লে লক্ষ্য ব্যর্থ হবে না।

ওদের সাথে কথা বলার ইচ্ছে রয়েছে র উজি বি তুলে খুক

পরে পাশলো ও। ঝট করে মুখ তুললো একজন, একটা হাত ঢুকে গেছে তার হোলস্টারে। দ্বিতীয় লোকটা রানার দিকে তাকালোই না, তারও একটা হাত চলে গেল জ্যাকেটের ভেতরে।

জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ওদের মাথার ওপর, ফাঁকা গুলি করলো রানা। এমন বেপরোয়া, আত্মহত্যাপ্রবণ লোক খুব কমই দেখেছে ও। হেরে গেছে, আত্মসমর্পণ না করলে নির্ঘাৎ মৃত্যু, জেনেও ওরা ক্ষান্ত হলো না। রানা এমন জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে, আশেপাশে কোনো আড়াল নেই। দ্বিতীয় লোকটা কেজি-নাইন বের করে ফেললো। প্রথম লোকটা ডাইভ দিলো মেঝে লক্ষ্য করে, তার হাতেও চলে এসেছে আরেকটা কেজি-নাইন। লোকটা ডাইভ দিয়েছে হিসেব করে, মেঝে-তে পড়ামাত্র চমৎকার একটা পজিশন পেয়ে যাবে গুলি করার। সব মিলিয়ে পরিস্থিতি এমনই দাঁড়ালো, খুন করার জন্যে গুলি না করে উপায় থাকলো না রানার।

হোমিং ডিভাইসের রেঞ্জ পঁচিশ মাইল। রেঞ্জের ভেতর একটা আকাশ-যান থাকলে কোনো সমস্যা হবার কথা নয়। তবু আরো ভালোভাবে প্রচার করার জন্যে কনসোল-এ বসানো ট্র্যান্সমিটারটা ব্যবহার করলো রানা। লাশ বা রক্ত নিয়ে করার কিছু নেই ওর, কাজেই কমিউনিকে-শন সেন্টারের ইকুইপমেন্টগুলো নষ্ট করলো। তাড়াতাড়ি আরেক বিল্ডিঙে যেতে হবে ওকে, লোকজন যেখানে ঘুমায়।

ফাঁকা উঠনটা পেরিয়ে আসছে রানা। বাড়িটা যখন বিশ গজ দূরে, দরজার ডান দিকে কার্নিসের নিচে একজন গার্ডকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলো ও। হাঁটার গতি একই রকম থাকলো ওর। মাথা আর মুখ ঢেকে রেখেছে প্লাস্টিকের টুকরো। দূরত্ব যখন আর বিশ ফুটের মধ্যে হাঁটার গতি বাড়িয়ে দিলো রানা, যেন তাড়াতাড়ি বৃষ্টির হাত থেকে

বাঁচতে চায়।

সরে গিয়ে রানাকে দাঁড়াবার জায়গা করে দিলো লোকটা। ছুটে এসে থামলো না রানা, প্রচণ্ড ঘুসি মারলো তার নাকে। লোকটা নিরেটদর্শন, আঘাতটা আসছে দেখেও কিছু করতে পারলো না। রানা অনুভব করলো, লোকটার চোয়ালের হাড় নড়বড়ে হয়ে গেল। ঢিল পড়লো চোখের পেশীতে। দরজার সামনে জমে থাকা পানিতে মাথা দিয়ে পড়লো সে। ছলাৎ করে একটা শব্দ হলো, ওটাই একমাত্র আওয়াজ। বৃষ্টির মধ্যে বেরিয়ে এসে লোকটার মাথায় একটা লাথি কষলো রানা। টেনে-হিঁচড়ে অজ্ঞান দেহটাকে রেখে এলো অন্ধকার কোণে।

দরজার দু'দিকে দুটো জানালা, দরজা থেকে প্রতিটির দূরত্ব দশ ফুট। দুটোই খোলা। একটার পাশে দাঁড়িয়ে সাবধানে ভেতরে উঁকি দিলো রানা। প্রথমে চোখে পড়লো অনেকগুলো মশারি। মশারির ভেতর লাইনবন্দী হয়ে শুয়ে আছে লোকজন। কেউ নড়ছে না, যেন ভয়ে সিটকে বা আধমরা হয়ে আছে সবাই। তারপর ড্রামগুলো চোখে পড়লো। বিশাল কামরার জানালা আর দরজাগুলো বাদ দিয়ে দেয়াল ঘেঁষে দুই লাইনে রাখা হয়েছে ওগুলো।

কামরাটার শেষ মাথায় দুটো টেবিলে বসে রয়েছে আরো কয়েকজন লোক, নড়াচড়ার ভঙ্গি দেখে মনে হলো তাস খেলছে। বারোজনের কম নয়।

চিন্তায় পড়ে গেল রানা। ঘুমন্ত লোকগুলোকে গ্যাস বোমার সাহায্যে অজ্ঞান করা কোনো সমস্যা নয়। কিন্তু যারা জেগে আছে তারা বিষাক্ত গ্যাসে আক্রান্ত হওয়ামাত্র ছুটোছুটি শুরু করবে, বিভিন্ন দরজা দিয়ে বেরিয়েও আসতে পারবে কেউ কেউ। দরজা একটা হলে,

সেটার পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে পারতো রানা। কে কোন্ দরজা দিয়ে বেরোবে জানার উপায় নেই, বেরিয়ে কোন্ দিকে ছুটবে তাও আগে থেকে বলা যায় না। অথচ সিটাডেল-এর উদ্দেশে রওনা হবার আগে পরে বা পথে কোনো শত্রুর অস্তিত্ব রাখতে চায় না ও।

সব সমস্যার সমাধান এনে দিতে পারে সি-ফোর। সি-ফোরের কয়েকটা বল জানালা দিয়ে কামরার মেঝেতে ফেলতে পারে ও, তারপর নিরাপদ দূরত্বে সরে গিয়ে ডিটোনেটরের বোতামে চাপ দিলেই রলফ মুয়েলারের শিষ্যরা ইহজগৎ ত্যাগ করবে।

কিন্তু না, ব্যাপারটা অমানবিক হয়ে যায়। ঠাণ্ডা মাথায় একজন লোককেই খুন করা সম্ভব নয় রানার পক্ষে, এখানে তো কমকরেও পঞ্চাশজন রয়েছে। তাহলে উপায় ?

ড্রামগুলোর কথাও ভোলেনি রানা। ওগুলোর ভেতর কি আছে জানা নেই, তবে আন্দাজ করতে পারলো। ইতোমধ্যে গুনেছে ও, বত্রিশটা ড্রাম। প্রতিটি পঞ্চান্ন পাউণ্ডের। ওগুলোর ভেতর কি পরিমাণ কোকেন পেস্ট আছে হিসেব করতে গিয়ে মাথাটা ঘুরে উঠলো রানার।

এমন একটা উপায় বের করতে হবে, যাতে সাপও মরবে, লাঠিও ভাঙবে না। কিন্তু তা কি সম্ভব ? কোকেন পেস্ট নষ্ট করতে হলে, তার আগে সবগুলো লোককে অজ্ঞান করতে হবে। তা যদি সম্ভব না হয়, সি-ফোর দিয়ে বিস্ফোরণ ঘটাতে হবে, তাতে কোকেনের সাথে অস্তিত্ব হারাবে পঞ্চাশজন মানুষ।

খানিক ভাবতেই একটা বুদ্ধি পেয়ে গেল রানা। একসাথে দুটো কাজ করা যাবে না, এটুকু পরিষ্কার বুঝতে পারছে ও। অনেকগুলো জানালা, প্রায় সবগুলোই খোলা, প্রতিটির ভেতর দিয়ে সি-ফোরের

একটা করে বল কামরার মেঝেতে ফেললো ও। সামান্যই শব্দ হলো, বৃষ্টির আওয়াজের সাথে মিশে যাওয়ায় শুনতে পেলো না কেউ। হঠাৎ যদি কারো চোখে পড়ে যায়, খেলার কোনো সামগ্রী বলে মনে হবে তার। গ্যাস বোমাগুলো তো হুবহু টেনিস বলের মতো দেখতে। সে-গুলো এমনভাবে গড়িয়ে দিলো রানা, প্রতিটি গা-ঢাকা দিলো ড্রাম-গুলোর আড়ালে।

কাজ সেরে বাড়িটা থেকে দূরে সরে আসছে রানা। গ্যাসের প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে কেউ যদি বাইরে বেরিয়ে আসে, ওর কাছে উজি বি রয়েছে, পাখি শিকারের মতো সহজেই ফেলে দিতে পারবে। আর শত্রুরা যদি সংখ্যায় বেশি হয়, রানার সাথে গ্রেনেড লঞ্চারও আছে।

দশ ফুট চলে এসেছে রানা। বিশ ফুট। বিশ গজ। বৃষ্টি এখনো পড়ছে, তবে আগের মতো জোরে নয়। প্রায় নিরাপদ দূরত্বে চলে এসেছে রানা। এখন যদি ডিটোনেটরের সুইচ অন করে সি-ফোর ফাটিয়ে দেয়, ওর কোনো ক্ষতি হবে না। সিটাডেল-এর দিকে হাঁটছে। ইতো-মধ্যে বিস্ফোরিত হয়েছে গ্যাসবোমাগুলো, রঙহীন বিষাক্ত গ্যাস নিঃশব্দে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে কামরার ভেতর। এই সময় ওর পিছনের বাড়িটা থেকে ছিটকে বেরিয়ে এলো এক লোক। বলা কঠিন রানাকে দেখে, নাকি গ্যাসের আতংকে, চিৎকার শুরু করলো সে।

ঝট্ করে ঘুরেই উজি তাক করলো রানা। গুলি খেয়ে গুঙিয়ে উঠলো লোকটা, আওয়াজটা শুনে বুঝতে অসুবিধে হলো না গলায় লেগেছে বুলেট। দোরগোড়াতেই পড়ে গেল সে।

সিটাডেল-এর সিঁড়ির নিচে পৌঁছুলো রানা। সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে রয়েছে দু'জন গার্ড। রানাকে উঠন ধরে হেঁটে আসতে দেখেছে তারা। গুলির শব্দও শুনেছে। এক মুহূর্ত সময় পাবার জন্যে টেপ

দিয়ে হাতে আটকানো তিনটে ডিটোনেটরের দ্বিতীয়টার সুইচে চাপ দিলো রানা। পিছনের বাড়িটার দুটো দরজা, সামনের ও পিছনের, একযোগে বিস্ফোরিত হলো। জোড়া বিস্ফোরণের শব্দ মনোযোগ কেড়ে নিলো গার্ডদের।

স্যাঁৎ করে এক পাশে সরে গেল রানা। সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করলো পাশ ফিরে, এক ধার দিয়ে, প্রতি মুহূর্তে গুলি করছে। প্রথম লোকটা ধরাশায়ী হলো পাল্টা গুলি করার কোনো সুযোগ না পেয়েই। দ্বিতীয় লোকটার তিনটে বুলেট রানার মাথার ওপর দিয়ে বেরিয়ে গেল। রানার হাতে রাইফেলটা অটোমেটিক হলেও, চর্চা না থাকলে র‍্যাপিড ফায়ারে লক্ষ্যভেদ করা অত্যন্ত কঠিন। অ্যাসাইনমেন্ট পাবার আগের দু'হপ্তা প্র্যাকটিসের মধ্যে ছিলো বলে নিজেকে ধন্যবাদ দিলো ও। দ্বিতীয় লোকটার হাঁটু বেয়ে উঠে গেল বুলেটগুলো, শেষ দুটো বুলেটের একটা লাগলো কপালে, অপরটা মাথার চুল ছুঁয়ে বেরিয়ে গেল।

এরপর সব যেন স্বপ্নের মধ্যে দ্রুত ঘটতে লাগলো। লাথি মেরে সিটাডেল-এর দরজা খুললো রানা, ব্যাগ থেকে আগেই বের করে ফেলেছে গ্রেনেড লঞ্চারটা। প্রতিবার একটা করে শেল ভরলো, পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক-রেঞ্জ থেকে নিক্ষেপ করলো কামরার ভেতর। ভেতরে লোকজন আছে, টের পেলো রানা। প্রচুর ইকুইপমেন্টও দেখতে পেলো। সম্ভবত দাহ্য পদার্থ ভরা দু'একটা ড্রামও ছিলো। কারণ হঠাৎ করে লাফ দিয়ে সিলিং ছুঁলো আগুনের শিখাগুলো, প্রচণ্ড এক ধাক্কা খেয়ে পাঁচ ফুট পিছিয়ে এলো রানা, পড়ে গেল।

রানা পড়ে যাবার সাথে সাথে বিস্ফোরিত হলো বত্রিশটা কোকেন ভরা ড্রাম সহ বিশাল শোবার ঘরটা। ডিটোনেটরের সুইচ অন হয়ে গেছে।

পড়ে যাবার পরও গড়িয়ে আরো ছ'ফুট সরে গেল রানা। সিটাডেলের খোলা দরজা দিয়ে নরকের অগ্নিকুণ্ড দেখতে পাচ্ছে ও। মেঝেতে পিঠ দিয়ে মাথাটা শুধু সামান্য উঁচু করলো, চাপ দিলো আরেকটা ডিটোনেটরে। সাথে সাথে বিস্ফোরিত হলো স্টোর হাউসটা। কেঁপে উঠলো যেন গোটা দুনিয়াটাই, পরবর্তী পাঁচ সেকেণ্ড আরেক জায়গায় কাটলো রানার। আগেই পড়ে গেছে বলে রক্ষা, তা না হলে বুলেটের গতিতে ছুটে আসা ইট আর লোহার টুকরো লেগে ওর শরীরটা দ্বিখণ্ডিত হয়ে যেতো। বিস্ফোরণের ফলে শুধু ইট, কাঠ লোহা আর পাথর নয়, দিকবিদিক ছুটোছুটি করছে টুকরো টুকরো আগুন। একের পর এক বিস্ফোরণ ঘটছে, সবগুলোর কারণ বা উৎস রানার জানা নেই। লাফিয়ে উঠছে মাটি, শকওয়েভের ধাক্কায় ফুসফুস থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে সমস্ত বাতাস। খাড়া হয়ে থাকা একটা জিনিসও আর খাড়া থাকলো না। খোলা উঠন জুড়ে শুরু হলো আগুনের মাতামাতি। কমিউনিকেশন সেণ্টারে কোনো বিস্ফোরণ ঘটেনি, অথচ দাউ দাউ করে জ্বলছে সেটা। বাষট্টিজন লোক আর কোকেন পেস্ট ভরা ড্রামগুলো নিয়ে সম্পূর্ণ ধসে পড়েছে শোবার কামরাটা, সেখানে আগুন জ্বলছে কয়েকটা স্তরে ভাগ হয়ে। সদ্য ছাড়া রকেটের মতো আগুনের বলগুলো উঠে যাচ্ছে ভিজে অন্ধকার আকাশের দিকে।

তারপর অনেকটা সময় কাটলো। অনেকক্ষণ হয়ে গেছে কোনো শব্দ শোনেনি রানা। এমন কোনো কাঠামো বা আকৃতি দেখতে পেলো না যেটাকে ঘিরে ঘন আগুনের লালচে শিখা নাচানাচি করছে না। মনে হলো, প্রতিটি জিনিসই যেন নড়াচড়া করছে। কিন্তু সিধে হয়ে দাঁড়াবার পর দেখলো, সিটাডেল-এর চৌহদ্দি বাদ দিলে আশপাশে কোথাও কোনো জিনিসের আকৃতি অটুট নেই। নিঃসঙ্গ একজন মাত্র

লোককে দেখলো রানা। পুরনো চার্চের দরজায় বেরিয়ে এলো সে, এমন ভঙ্গিতে সামনে হাত বাড়ালো যেন পবিত্র পানি পেতে চায়। ভঙ্গিটা বদলালো না, সটান আছাড় খেলো সে। বৃষ্টি কমে আসায় তার পতনের আওয়াজটা পরিষ্কার শুনতে পেলো রানা, মনে হলো পাথরের চাতালে বাড়ি খেয়ে ভেঙে গেল হাড়গুলো।

লাস আনিমাসে কেউ বেঁচে আছে বলে মনে হলো না। বিস্ফোরণে চারপাশের প্রতিটি ভবন মাটির সাথে সমান হয়ে গেছে। নিচের উঠনে একটা পাঁচিলও উঁচু হয়ে নেই। ক্যামোফ্লেজ নেটগুলোও রক্ষা পায়নি, পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।

রানা উপলব্ধি করলো, অক্ষত আছে ও। নিজেকে ভাগ্যবান মনে হলো ওর। মনে হলো, জায়গাটা আগের চেয়ে নিরাপদ ওর জন্যে। ট্রেনিং পাওয়া একদল লোকের সাথে লড়তে হবে না ওকে। এখন শুধু একটাই চিন্তা—রলফ মুয়েলার।

হেনেরিক মুলার কোথায় লুকিয়ে আছেন জানে রানা। সন্ধ্যার সময় তাঁকে হাঁটতে দেখেছে ও, দেখেছে ঠিক কোনখানটায় অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিলেন তিনি।

সিটাডেল-এর ডান দিকের কোণে।

রলফ মুয়েলার অদৃশ্য হয়ে যাবার পর স্পটার স্কোপ দিয়ে জায়গাটা পরীক্ষা করেছে রানা। রহস্যটা ভেদ করা সম্ভব হয়েছে। ঢালু হয়ে নেমে গেছে একটা ট্রেঞ্চ। মাটি ফুঁড়ে নিচের দিকে নেমে গেছে কংক্রিটের তৈরি একটা র‍্যাম্প। ফেরারি নাৎসী অপরাধী আক্ষরিক অর্থেই আণ্ডারগ্রাউণ্ডে হারিয়ে গেছেন।

এই মুহূর্তে সিটাডেল-এর নিচে রয়েছেন হেনেরিক মুলার। নিজের বাংকারে সম্পূর্ণ নিরাপদ।

চোদ্দ

'হেনেরিক মুলার ?'

'আপনি কে বলছেন, প্লিজ ?'

ইয়ার-মাইক্রোফোনে শান্ত সুরে কথা বলছে রানা। দু'মুখো মাইক্রোফোন ওটা, ট্র্যান্সমিটার ও রিসিভার হিসেবে কাজ করে। মাটির নিচ থেকে যোগাযোগ রাখার জন্যে নিজের লোকদের মধ্যে যন্ত্রটা বিলি করেছেন মুলার। বোঝা যায়, অত্যন্ত শক্তিশালী। 'আমি মাসুদ রানা,' বললো ও। 'নামটা আপনি জানতেও পারেন।'

মুলার জানেন। এই লোকই খুন করেছে তাঁর ছেলে ববি মুয়েলারকে। প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে মাসুদ রানাকে খুন করার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। কিন্তু তাঁর নির্দেশ এখনো পালন করা হয়নি। থেমে থেমে কথা বললেন তিনি, গলাটা একজন বুড়ো লোকের, সামান্য জার্মান টান থাকলেও সুরটা আক্রমণাত্মক নয়। 'বলুন, মিঃ রানা।'

'আপনার অপারেশন ব্যর্থ হয়ে গেছে, মুলার। হোয়াইট গামাকে আরেকটা হেডকোয়ার্টার ও গোডাউন খুঁজে নিতে হবে। নতুন একজন নেতাও দরকার হবে। দরকার হবে আরেকজন উপদেষ্টা, মাস্টার-

মাইণ্ডের।'

ইয়ার-মাইক্রোফোনে কোনো শব্দ হলো না।

'বিরাট একটা সশস্ত্র বাহিনী যে-কোনো মুহূর্তে পৌঁছে যাবে এখানে,' বললো রানা। 'আপনার পালানোর কোনো উপায় নেই। এই কথাটা বলবার জন্যে আপনার সাথে যোগাযোগ করেছি। বাংকারের ঢোকার পথে বিস্ফোরক বসানো হয়েছে। আপনি আত্মসমর্পণ না করলে দশ সেকেণ্ডের মধ্যে চার্জগুলো ডিটোনেট করবো আমি।'

'আপনার কাজে কোনো খুঁত থাকে না, মিঃ রানা।'

'চেষ্টা করি যাতে না থাকে।'

'ঠিক আছে,' বললেন মুলার, মনে হলো সেকেণ্ড গোনা শেষ করলেন এইমাত্র। 'আপনি নিচে আসতে পারেন।'

রানা ভাবতে পারেনি এতো সহজে ভেতরে ঢোকার সুযোগ পাওয়া যাবে। আশা করেছিল মুলার বেরিয়ে আসার চেষ্টা করবেন, ডিটোনেটরে চাপ দিয়ে সি-ফোর ফাটিয়ে দেবে ও।

র‍্যাম্পের নিচে প্রেশারাইজড্ দরজা খুলে গেল, বাংকারে একা নেমে এলো রানা। পরিস্থিতিটা নিজের নিয়ন্ত্রণে আনার সুযোগটা হাতছাড়া করতে ইচ্ছে হলো না। যতোক্ষণ চোখের আড়ালে থাকবেন মুলার, পরিস্থিতিটা তাঁর নিয়ন্ত্রণে থাকবে, ফলে একের পর এক প্রস্তাব দেয়ার সুযোগ পাবেন তিনি। যেমন, বলতে পারেন, তিনি আত্মহত্যা করবেন। চল্লিশ বছর আগে বিধ্বস্ত বার্লিনে দাঁড়িয়ে আত্মহত্যা করার ইচ্ছেটা দমন করেছিলেন গেস্টাপো প্রধান, কারণ তখন তাঁর সামনে পালাবার পথ খোলা ছিলো। আজ তাঁর সামনে আত্মহত্যা করা ছাড়া আর মাত্র একটা পথ খোলা আছে, আত্মসমর্পণ করা। কিন্তু পুরনো পাপী, ধরা দেয়ার চাইতে আত্মহত্যাটাই পছন্দ করবেন তিনি। তাঁর

মতো একজন নর্দমার কীটকে এভাবে মরে গিয়ে বেঁচে যেতে দেবে না রানা। ঝুঁকি নিয়ে হলেও, হেনেরিক মুলারকে জীবিত ধরতে হবে। ধরা না দিয়ে আত্মহত্যা করার মধ্যে এক ধরনের সন্তুষ্টি আছে, সেটা রানা তাঁকে পেতে দিতে চায় না।

বাংকারে ঢোকার পর বিস্মিত হলো ও। স্বস্তিকা বা প্রাচীন টিউটনিক বর্ণমালার অক্ষর দিয়ে সাজানো প্রতীক চিহ্ন আশা করেনি ও, আশা করেনি এতো সব আধুনিক যোগাযোগ সরঞ্জাম। বাংকারটা চৌকো, ওপরের চার্চের আদলে তৈরি করা। মিল বলতে ওইটকুই। একদিকের দেয়ালে অনেকগুলো র‍্যাকে এমন সব কমিউনিকেশন ইকুইপমেণ্ট আর কমপিউটার রয়েছে, ব্যবহার করার সুযোগ পেলে গর্ব বোধ করতো বি. সি. আই.। অপর দিকের দেয়ালে রয়েছে অ্যাকুয়ারিয়াম আর সাপের খাঁচা। খাঁচার ভেতর একজোড়া নমুনা দেখে মনে হলো, বথরপস জারারাকুকু সিটাডেলিস।

এই অদ্ভুত পরিবেশের মাঝখানে, অন্য কোনো গ্রহ থেকে আসা আগন্তুকের মতো, বসে আছেন হেনেরিক মুলার। কালো একটা নোমেক্স স্যুট পরে আছেন তিনি, হাঁটু আর কনুইয়ের কাছে চামড়ার অতিরিক্ত আবরণ। জুতো পরেছেন কালো। তাঁর সামনের ডেস্কে পড়ে থাকা হেলমেটটাও কালো, স্বচ্ছ প্লাস্টিকের শীল্ড সহ। আধুনিক অ্যান্টি-টেরোরিস্ট ইউনিটের সদস্যরা ব্যবহার করে ওটা, গভীর জঙ্গলের ভেতর একজন টেরোরিস্টের কাছে জিনিসটা রয়েছে দেখে খানিকটা অবাকই হলো রানা। তবে, মুলারের মতো একজন সারভাইভালিস্ট যে যে-কোনো পরিস্থিতির জন্যে প্রস্তুত থাকবেন তাতে আর আশ্চর্য কি। ছোটোখাটো যুদ্ধ করার ক্ষমতা তাঁর তো থাকতেই হবে।

'আপনি অনেক দূর চলে এসেছেন, গ্রুপেনফুয়েরার,' বললো

রানা। 'কংগ্রাচুলেশন্স।'

মাথা ঝাঁকালেন মুলার, স্যুটের হাফ-হুড আর দাগবহুল মুখের জীর্ণ ত্বক তাকে একটা প্রাচীন সরীসৃপের চেহারা পাইয়ে দিলো। চোখ দুটো উজ্জ্বল, কিন্তু বড়বেশি অনড়, যেন চোখের পিছনে মাথাটা দ্রুত কাজ করছে না। চুলবিহীন একজন মানুষ বলা যায় তাঁকে। ঠোঁট বলতে কিছু নেই। 'আপনি খুব জেদি লোক, মিঃ রানা। তার কারণ সম্ভবত এই যে আপনি আমেরিকান নন। ব্যাপারটা আমি বুঝি না তা নয়—দরিদ্র একটা দেশের প্রতিনিধিকে জেদি হতে হয়, তার আর সব অভাব পূরণ করে ওটা। ঠিক জানি না, আপনার বোধ-হয় আরো কিছু গুণ আছে, যা একজন আমেরিকান বা ধনী কোনো দেশের এসপিওনাজ এজেন্টের মধ্যে পাওয়া যাবে না।'

'আপনি সি. আই. এ.-র সাথে কাজ করেছেন,' বললো রানা। 'ক্ল্যানডেসটিন অপারেশন বলতে কি বোঝায় ওরা জানে না। সবচেয়ে খারাপ জিনিসটা কিনে ওরা মনে করে সবচেয়ে ভালোটা কিনতে পেরেছে। এ-সব তো আমার চেয়েও ভালো জানেন আপনি।'

হাসলেন মুলার, দাঁতগুলো নকল হলেও অত্যন্ত সুন্দর। 'আপনার কোর্স চার্ট করার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি আমি,' বললেন তিনি। 'কিন্তু আপনি বোগোটা থেকে ফ্লাইট প্ল্যান ফাইল না করে রওনা হলেন, সেই থেকে আপনাকে আমি হারিয়ে ফেললাম।'

'আমিও আপনার ট্রেইল বেশ কয়েকবার হারিয়ে ফেলি,' বললো রানা। 'কখনো কখনো এমন সময়ও গেছে, পুরো এক হপ্তা কোনো ধারণা ছিলো না আপনি বেঁচে আছেন কিনা।'

'কি দেখে আপনি আমার অস্তিত্ব সম্পর্কে নিশ্চিত হলেন?'

'সাপ,' বললো রানা। 'ওগুলোর ওপর রয়েছে আপনার স্বাক্ষর।

ফেরারি একজন মানুষকে প্রতিটি দুর্বলতার জন্যে খেসারত দিতে হয়।'

আবার মাথা ঝাঁকালেন মুলার, তাঁর কোটের হাফ-হুড ঘাড় আর গলার বিবর্ণ চামড়া ফুলিয়ে দিলো। রানা বাংকারে ঢোকার পর থেকে তাঁর চোখ একবারও অন্য দিকে সরেনি, সরাসরি ওর চোখে তাকিয়ে আছেন, ভুলেও একবার পলক ফেলেননি। 'নিজের ক্ষেত্র ছেড়ে যা-ই করতে যাই আমরা, অ্যামেচার হয়ে উঠি,' বললেন তিনি। 'ওরা আমাকে বললো, আমি নাকি নতুন একটা নমুনা আবিষ্কার করেছি। শুনে উত্তেজিত হয়ে উঠলাম। বিজ্ঞানে এটা আমার প্রথম অভিযান। ভাগ্যগুণে নমুনাটা পেয়ে যাই। আমাদের বোঝা উচিত, ভাগ্য বারবার সহায়তা করে না, নানাদিক থেকে তো নয়ই।'

'ভাগ্যের সহায়তা পাননি বা যা-ই বলুন, কাজটা আপনি নেহাতই বোকার মতো করেছেন,' বললো রানা। 'এধরনের বোকামি খুব একটা করেননি আপনি। দুনিয়ার সবচেয়ে শক্তিশালী একটা দেশের ইন্টেলিজেন্স এজেন্সির প্রধান ছিলেন। একটা পুতুলকে দম দিয়ে ছেড়ে দিয়েছিলেন, কলম্বিয়ান রাজনীতিতে একটা শক্তি হিসেবে উদয় হতে পারতো সে। লোকটা মরার জন্যে তৈরি ছিলো না বলে নিজেকে দোষ দেবেন না।'

চোখের চারপাশে কুঁচকে ফুলে থাকা মাংসে ঢিল দিলেন মুলার। 'আমি কোথায় আছি তা কি আপনাকে ভিক্টর জানিয়েছে?'

'যতোটা সম্ভব কম জানিয়েছে সে,' বললো রানা। 'আপনার উচ্চাশাই আমার সূত্র হিসেবে কাজ করেছে, গ্রুপেনফুয়েরার। কোকা পেস্ট অনুসরণ করে আপনার দরজা পর্যন্ত পৌঁছে গেছি আমি। বীমার ব্যবস্থা করতে গিয়ে নিজের অবস্থান প্রকাশ করার ঝুঁকি নিয়েছেন

আপনি। এখানে কোকেন রক আর পেস্ট মউজুদ করে আপনি ভেবেছিলেন, এগুলোর বিনিময়ে যা কিছু হারিয়েছেন সব ফেরত পাবেন। সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দিয়েছেন, প্ল্যান করেছেন বড় মাপের সন্ত্রাস ছড়িয়ে দেবেন, অস্থির করে তুলবেন কলম্বিয়ার জনসাধারণকে। সরকারকে অচল করে দেয়ার পর ভিক্টরকে মুক্ত করার জন্যে সি. আই. এ.-র সাথে দর কষাতে চেয়েছিলেন। সত্যি কথা বলতে কি, প্ল্যানটা সফল হতে পারতো। কণ্ট্রাদের মাঠে রাখার বিনিময়ে যে-কোনো কাজে রাজি হতো সি. আই. এ.। কোন্‌টা যে বেশি খারাপ আমার জানা নেই—ইরানিয়ানদের কাছে মিসাইল বিক্রি, নাকি কার্টেলের কাছ থেকে টাকা নেয়া।'

আবার হাসলেন মুলার। ঠোঁটহীন মুখে যেন একটা ক্ষতের সৃষ্টি হলো। 'আপনি ঠিক জানেন, মিঃ রানা, সুযোগটা হাতছাড়া হয়ে গেছে?'

'আপনার জন্যে হাতছাড়া হয়ে গেছে। আপনার হয়ে যারা কাজ করেছে তারা সবাই মারা পড়বে। ভিক্টরকে বাঁচাতে পারে এমন কিছু আপনি করতে পারবেন না। আপনি এমনকি নিজেকেও বাঁচাতে পারবেন না। এবার হাত দুটো ডেস্কের ওপর রাখুন, তালু ওপর দিকে। হঠাৎ কিছু করবেন না।'

হঠাৎ করে কিছুই করলেন না মুলার, তবে হাত দুটো ডেস্কের পিছন থেকে তোলার পর দেখা গেল, তিনি একটা ফ্র্যাগমেন্টেশন গ্রেনেড ধরে রয়েছেন।

গুলি করতে গেল রানা। আধ সেকেণ্ড দেরি করলো, বদ্ধ বাংকারের ভেতর বিস্ফোরণের প্রতিক্রিয়া কি হতে পারে হিসেব করলো, সিদ্ধান্ত নিলো গুলি না করার। বয়স যতোই হোক, অত্যন্ত সতর্ক মুলার, কি

সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে বুঝতে দেরি করলেন না। তারপর মুখ খুললেন তিনি, 'না, মিঃ রানা, এ-ব্যাপারে আপনার সাথে আমি একমত— আপনিও বাঁচবেন না।'

উত্তর দিলো না রানা, নানা রকম সম্ভাবনা নিয়ে চিন্তা করছে ও। কোনোটাই গ্রহণযোগ্য বলে মনে হলো না। সময় না দিয়ে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিলেন মুলার।

'এখন আমি দরজার দিকে এগোবো, মিঃ রানা।' চেয়ার ছেড়ে দাঁড়ালেন মুলার, এক হাতে গ্রেনেড, অপর হাতে হেলমেট।

'যদি দেখি মাথায় হেলমেট তুলছেন,' বললো রানা, 'আপনাকে আমি খুন করবো।'

থামলেন মুলার। সব খেলারই নির্দিষ্ট নিয়ম আছে, এমনকি কিস্তি-মাত-এর সময়েও। বড় করে, একবার, মাথা ঝাঁকালেন তিনি। মেনে নিলেন। 'দরজার দিকে হাঁটবো আমি,' অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে, জোরালো গলায় বললেন।

এগোলেন মুলার। আত্মবিশ্বাসের সাথে, দৃঢ় ভঙ্গিতে পা ফেললেন, ধীরে ধীরে। তাঁর হাবভাবের মধ্যে শিথিলতার কোনো লক্ষণ নেই, নেই বুড়ো মানুষের জড়তা। রোবটসুলভ একটা আড়ষ্ট ভাব নিয়ে এগোলেন তিনি। একটা মাত্র উপায় আছে রানার, সরাসরি মুলারের মুখে গুলি করা। গুলি করেই ডাইভ দিয়ে ডেস্কের পিছনে পড়বে। বাকিটা ছেড়ে দেবে ভাগ্যের ওপর।

না, স্রেফ বোকামি হবে কাজটা।

ও নিজেই বরং দরজার দিকে ছুটুক।

মন্দ নয়, তবে ভালোও নয়।

বুড়োকে তাহলে চলে যেতে দিক।

আপনি। এখানে কোকেন রক আর পেস্ট মউজুদ করে আপনি ভেবেছিলেন, এগুলোর বিনিময়ে যা কিছু হারিয়েছেন সব ফেরত পাবেন। সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দিয়েছেন, প্ল্যান করেছেন বড় মাপের সন্ত্রাস ছড়িয়ে দেবেন, অস্থির করে তুলবেন কলম্বিয়ার জনসাধারণকে। সরকারকে অচল করে দেয়ার পর ভিক্টরকে মুক্ত করার জন্যে সি. আই. এ.-র সাথে দর কষাতে চেয়েছিলেন। সত্যি কথা বলতে কি, প্ল্যানটা সফল হতে পারতো। কণ্ট্রাদের মাঠে রাখার বিনিময়ে যে-কোনো কাজে রাজি হতো সি. আই. এ.। কোন্‌টা যে বেশি খারাপ আমার জানা নেই—ইরানিয়ানদের কাছে মিসাইল বিক্রি, নাকি কার্টেলের কাছ থেকে টাকা নেয়া।'

আবার হাসলেন মুলার। ঠোঁটহীন মুখে যেন একটা ক্ষতের সৃষ্টি হলো। 'আপনি ঠিক জানেন, মিঃ রানা, সুযোগটা হাতছাড়া হয়ে গেছে?'

'আপনার জন্যে হাতছাড়া হয়ে গেছে। আপনার হয়ে যারা কাজ করেছে তারা সবাই মারা পড়বে। ভিক্টরকে বাঁচাতে পারে এমন কিছু আপনি করতে পারবেন না। আপনি এমনকি নিজেকেও বাঁচাতে পারবেন না। এবার হাত দুটো ডেস্কের ওপর রাখুন, তালু ওপর দিকে। হঠাৎ কিছু করবেন না।'

হঠাৎ করে কিছুই করলেন না মুলার, তবে হাত দুটো ডেস্কের পিছন থেকে তোলার পর দেখা গেল, তিনি একটা ফ্র্যাগমেন্টেশন গ্রেনেড ধরে রয়েছেন।

গুলি করতে গেল রানা। আধ সেকেণ্ড দেরি করলো, বদ্ধ বাংকারের ভেতর বিস্ফোরণের প্রতিক্রিয়া কি হতে পারে হিসেব করলো, সিদ্ধান্ত নিলো গুলি না করার। বয়স যতোই হোক, অত্যন্ত সতর্ক মুলার, কি

সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে বুঝতে দেরি করলেন না। তারপর মুখ খুললেন তিনি, 'না, মিঃ রানা, এ-ব্যাপারে আপনার সাথে আমি একমত— আপনিও বাঁচবেন না।'

উত্তর দিলো না রানা, নানা রকম সম্ভাবনা নিয়ে চিন্তা করছে ও। কোনোটাই গ্রহণযোগ্য বলে মনে হলো না। সময় না দিয়ে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিলেন মুলার।

'এখন আমি দরজার দিকে এগোবো, মিঃ রানা।' চেয়ার ছেড়ে দাঁড়ালেন মুলার, এক হাতে গ্রেনেড, অপর হাতে হেলমেট।

'যদি দেখি মাথায় হেলমেট তুলছেন,' বললো রানা, 'আপনাকে আমি খুন করবো।'

থামলেন মুলার। সব খেলারই নির্দিষ্ট নিয়ম আছে, এমনকি কিস্তি-মাত-এর সময়েও। বড় করে, একবার, মাথা ঝাঁকালেন তিনি। মেনে নিলেন। 'দরজার দিকে হাঁটবো আমি,' অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে, জোরালো গলায় বললেন।

এগোলেন মুলার। আত্মবিশ্বাসের সাথে, দৃঢ় ভঙ্গিতে পা ফেললেন, ধীরে ধীরে। তাঁর হাবভাবের মধ্যে শিথিলতার কোনো লক্ষণ নেই, নেই বুড়ো মানুষের জড়তা। রোবটসুলভ একটা আড়ষ্ট ভাব নিয়ে এগোলেন তিনি। একটা মাত্র উপায় আছে রানার, সরাসরি মুলারের মুখে গুলি করা। গুলি করেই ডাইভ দিয়ে ডেস্কের পিছনে পড়বে। বাকিটা ছেড়ে দেবে ভাগ্যের ওপর।

না, স্রেফ বোকামি হবে কাজটা।

ও নিজেই বরং দরজার দিকে ছুটুক।

মন্দ নয়, তবে ভালোও নয়।

বুড়োকে তাহলে চলে যেতে দিক।

খুলির ভেতর ছুরি চালাবার ব্যথা অনুভব করলো রানা। হাতে পেয়ে মুলারকে ছাড়তে রাজি নয় ও।

আরো এক পা এগোলেন মুলার, পৌঁছে গেলেন দোরগোড়ায়। 'এখন আমি বাংকার থেকে বেরিয়ে যাবো,' আগের মতোই দৃঢ়কণ্ঠে, শান্তভাবে বললেন তিনি। 'আমার পিছনে বন্ধ হয়ে যাবে হ্যাচ। আমরা একমত?'

কিছু বললো না রানা। অটোমেটিক রাইফেল আর মুলারের মাঝখানে দূরত্ব বাড়বে, তাতে রানারই সুবিধে। লংরেঞ্জ থেকে গুলি করলে, মুলারের হাতের গ্রেনেড যদি বিস্ফোরিত হয়, রানার আহত হবার আশংকা খানিকটা হলেও কমবে।

মুলার জানেন, দরজা বন্ধ করতে কয়েক সেকেণ্ড সময় লাগবে তাঁর। তিনি সম্ভবত ধরে নিয়েছেন, বাংকার থেকে বেরিয়ে গিয়ে দরজা বন্ধ করতে পারলেই পালাতে পারবেন। তিনি জানেন, রানা তাঁকে অনুসরণ করে এলে দরজা বন্ধ করা কঠিন হবে। অন্তত কয়েকটা সেকেণ্ড রানা যদি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে না থাকে, দরজা বন্ধ করা যাবে না।

সাবধানে, সতর্কতার সাথে, চৌকাঠের ওদিকে একটা পা ফেললেন তিনি। 'আপাতত বিদায়, মিঃ রানা।'

বেঁচে থাকলে আবার দেখা হবে, অন্য কোথাও। বেঁচে থাকলে আবার সুযোগ পাওয়া যাবে। নিজেকে সান্ত্বনা দিচ্ছে রানা। ভারি দরজাটা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, তাকিয়ে থাকলো ও। ধীরে ধীরে ঘুরছে প্রেশারাইজড হুইল, সীল করে দিচ্ছে বাংকার। হুইলটা ঘোরা বন্ধ হতেই অকস্মাৎ উপলব্ধি করলো রানা, মুলারকে পালাতে দেয়া যায় না।

এক পা এগোলো ও, ডাইভ দিলো ডেস্কের পিছন দিকে। শূন্যে

থাকতেই ডিটোনেটরের সুইচে চাপ দিলো ও।

বিস্ফোরিত হলো বাংকার।

পনেরো

জ্ঞান ফেরার পর রানার মনে হলো, অগভীর পানিতে পড়ে রয়েছে ও, নড়াচড়া করার শক্তি নেই। ভাবলো, জলাভূমিতে এলাম কিভাবে? পিঠে, হাতে আর মাথায় ব্যথা অনুভব করলো। আরো কয়েক সেকেণ্ড পর নগ্ন পায়ের চামড়ায় সুড়সুড়ি লাগলো।

নরম কি যেন একটা। রানার পায়ের ওপর ধীরে ধীরে নড়ছে। ভয় লাগলো, তবে একটা কথা ভেবে খুশিও হলো। স্পর্শ অনুভব করতে পারছে, তারমানে পুরোপুরি প্যারালাইজড হয়নি ও। সম্ভবত জোরালো ধাক্কা খেয়ে আড়ষ্ট হয়ে গেছে পেশীগুলো, তার বেশি কিছু না।

ধীরে ধীরে উপলব্ধি করলো, এখনো বাংকারে রয়েছে ও। বিস্ফোরণের ফলে সবগুলো আলো নিভে গেছে। ওপরতলার চার্চে আগুন লাগায়, বাংকারের ভেতর বাতাস গরম। খোলা হ্যাচওয়ে দিয়ে বনভূমির ঠাণ্ডা বাতাসও ঢুকছে মাঝে-মধ্যে। ওদিক থেকে সামান্য লালচে

আলোও ঢুকছে বাংকারের ভেতর। শুধু লালচে নয়, নাচানাচি করছে আলোটা। তারমানে আগুনের আভা। এখনো জ্বলছে বাইরেটা।

কিছু করার দরকার নেই, ভাবলো রানা। ডি. এ. এস. না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করলেই হবে। দিন দুয়েক বিশ্রাম নিলেই আবার সুস্থ হয়ে উঠবে ও। এই সময় পায়ে আবার সুড়সুড়ি লাগলো।

কি ওটা? এবার যেন আগের চেয়ে ভারি লাগছে। খানিকটা ওপরে উঠে এসেছে জিনিসটা। হাঁটুর নিচে, হাড় ছুঁয়ে সরে যাচ্ছে। হঠাৎ, আতংকের সাথে, বুঝে ফেললো রানা। ধীরগতি, শুকনো··· সাপ! বথরপস জারারাকুকু সিটাডেলিস!

বিস্ফোরণে ডান দিকের দেয়াল থেকে সাপের খাঁচা ভেঙে পড়েছে। পানি সহ মাছগুলো ছিটকে পড়েছে মেঝেতে, খালি হয়ে গেছে সাপের খাঁচা।

দুনিয়ার আর সব সাপের মতো, সিটাডেলিসও উষ্ণতা খুঁজে বেড়ায়। গ্ল্যানড-এর সাহায্যে সন্ধান করে ওগুলো, থেমে থেমে উৎসের দিকে এগোয়। খিদে পেলে, শিকারের অবস্থান জেনে নেয় থার-মাল সেনসর-এর সাহায্যে, তারপর শিকার করে। পেট ভরা থাকলে, সেনসরগুলোকে ব্যবহার করে আশপাশের পরিবেশ সম্পর্কে পরিচিত হবার কাজে, কোনো ভুল করলে তা শুধরে নেয়ার জন্যে নির্ভর করে নিজেদের মারাত্মক বিষের ওপর। মুলারের উপ-প্রজাতির কামড় বিশেষ ভাবে টক্সিক বলে বিবেচিত।

বিষাক্ত সাপের হাত থেকে বাঁচার নিয়ম হলো, শান্ত থাকা, অনড় থাকা।

স্থির থাকা অসম্ভব হয়ে উঠলো রানার। ওর পা বেয়ে ধীরে ধীরে ওপরে উঠে আসছে সাপটা। ওর শরীরের উষ্ণতম অংশ হলো, জানে

ও, দুই উরুর মাঝখানটা—কোল। আগের চেয়ে বেশি ভারি লাগছে ওটাকে, কারণ উরুর ওপর পুরোটা দৈর্ঘ্য নিয়ে উঠে পড়েছে। অনুভব করলো, তলপেটে উঠে এসে থামলো ওটা।

এবার ওগুলো দেখতে পাচ্ছে রানা—চোখগুলো। প্রায় অন্ধকার বাংকারে ভিজে আলোর চকমকে দুটো বিন্দু। হ্যাচওয়ে থেকে আসা ম্লান আলোয় চোখ দুটোর পিছনে সাপটাকে মনে হলো ঘোমটা পরা, কেমন যেন অশ্লীল, বীভৎস আর ভীতিকর।

তলপেটে স্থির হয়ে আছে ওটা। রানাও এক চুল নড়ছে না। বিকল্প-গুলো নিয়ে চিন্তা করতে এক সেকেণ্ডের বেশি সময় নিলো না ও। একটা ব্যাপারেই শুধু লক্ষ্য রাখতে হবে, কোনোভাবে যেন কামড়ে দিতে না পারে। সাপ হিসেবে সিটাডেলিস মারমুখো হলেও, দ্রুতগতি নয়। মাথা ঠাণ্ডা রেখে সুযোগের সন্ধানে থাকলে ওগুলোকে মারা সম্ভব।

নতুন করে চিন্তাভাবনা শুরু করলো রানা। দেখতে হবে ওর দ্বারা, এই আড়ষ্ট শরীর নিয়ে, কোনো প্রাণীকে খুন করা সম্ভব কিনা। বাইরে থেকে দেখা যায় না এমনভাবে ডান হাতের পেশীতে চাপ বাড়ালো ও। প্রচুর সময় নিলো ও। আঙুলগুলো এক করলো। মুঠো পাকালো হাতটা। বোঝা গেল, অন্তত শরীরের ওপরদিকটা প্যারা-লাইজড হয়নি। যে-কারণেই আড়ষ্ট হয়ে থাক পেশীগুলো, এখন আর আড়ষ্ট হয়ে নেই।

ঠিক সময়েই আড়ষ্ট ভাবটা দূর হয়েছে। আবার উষ্ণতার সন্ধানে মাথা তুললো সাপটা। পেট বেয়ে উঠে এলো ওটা, উঠে এলো রানার বুকে। ঠাণ্ডা, পলকহীন চোখ দুটো সরাসরি রানার মুখে তাকিয়ে আছে। যদিও রানা দেখতে পাচ্ছে না, তবে অনুভব করতে পারলো

সাপটার জিভ ঘন ঘন বেরিয়ে আসছে মুখের ভেতর থেকে। জিভের নড়াচড়া পালকের মতো হালকা, ছোবল মারার আগের মুহূর্তের কোনো লক্ষণ প্রকাশ পেলো না, তবু ঝুঁকি নেয়ার কোনো মানে হয় না। আর এক সেকেণ্ডও দেরি করা উচিত নয়।

অক্ষত হাতটা দিয়ে আঘাত করলো রানা। সিটাডেলিসের মাথার পিছনটা আঁকড়ে ধরলো ও, হাতটা লম্বা করে দিয়ে শরীর থেকে যতোটা সম্ভব দূরে সরিয়ে রাখলো, বেল্টের খাপ থেকে ডান হাত দিয়ে বের করে আনলো ছুরিটা। আংশিক কুণ্ডলী পাকিয়ে শরীরের সমস্ত শক্তি এক করলো সিটাডেলিস, তারপর চাবুকের মতো আঘাত করলো রানাকে। সাপের গায়ে এতো জোর, ধারণা ছিল না রানার। ফণা সহ মুখটা মাত্র কয়েক ইঞ্চি মুক্ত, তাসত্ত্বেও রানার হাতে ছোবল মারার চেষ্টা করলো ওটা। সপাং সপাং আওয়াজ তুলে রানার পায়ে বাড়ি খাচ্ছে লেজটা। ছুরির এক কোপে সাপটাকে দু'টুকরো করলো রানা।

এতোক্ষণে কেন যে আতংকিত হলো রানা, বলতে পারবে না। সিটাডেলিসের মাথাটা ছুঁড়ে ফেলে দিলো ও, সিধে হয়ে দাঁড়াতে গিয়ে উপলব্ধি করলো অসুস্থ বোধ করছে। চৈতন্য হারাবার মতো আচ্ছন্ন একটা ভাব গ্রাস করতে চাইছে ওকে। ডেস্কের কিনারায় হেলান দেয়ার সময় ভাবলো, আসলে সাপটার গায়ে অতোটা জোর ছিলো না, নিজে দুর্বল বলে ওরকম মনে হয়েছিল।

ঠিক এই সময় ওর গোড়ালির ওপর কঠিন, তীক্ষ্ণ একটা আঘাত লাগলো। সাথে সাথে বুঝলো রানা, দ্বিতীয় সাপটা কামড়ে দিয়েছে ওকে। ওটাকে দেখেনি ও, এখনো দেখতে পাচ্ছে না, কিন্তু জানে। ভয়ানক জ্বালা করছে ক্ষতটা। ইতোমধ্যে এসআইজি-২১০ টা হোল-

স্টার থেকে বেরিয়ে এসেছে, গুলি করতেও দেরি করলো না রানা। মাজল ফ্ল্যাশ-এর আলোয় দেখা গেল সাপটাকে। আবার গুলি করলো ও।

দ্বিতীয় গুলিটা লাগায় ছিন্নভিন্ন হয়ে ডেস্কের পিছনে সরে গেল দ্বিতীয় সিটাডেলিস। শূন্য থেকে মাথাটা পড়লো ওর ব্যাগের ওপর। উপস্থিত বুদ্ধি হারিয়ে ফেলেছে রানা, আবার একটা সাপকে ছোঁয়ার ইচ্ছে বা সাহস নেই ওর, অথচ ব্যাগটাও ওর দরকার। ঝুঁকলো ও, সাপটার দিকে ছুরি চালালো। আবার ছোবল মারলো ওটা।

কামড়টা মাংসে বিঁধলো না। ছুরির ধারালো ব্লেডে চেপে বসলো সাপের চোয়াল, খুলির দিকে অর্ধেক পথে সেঁধিয়ে গেল। অবিশ্বাস্য একটা দৃশ্য। মনে হলো অসম্ভব। এ যেন মুলারের আত্মা তার পোষা সরীসৃপের ওপর ভর করেছে, অন্ধ আক্রোশে প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে।

কখন ব্যাগটা তুলে নিয়েছে, ধীর পায়ে হাঁটা ধরেছে খোলা হ্যাচ-ওয়ের দিকে, বলতে পরবে না রানা। বিধ্বস্ত দরজার ওপর বসে পড়লো ও। কারমান আভারোর নির্দেশগুলো মনে করার চেষ্টা করছে ও। তার নির্দেশ মতো ইঞ্জেকশনগুলো নিয়ে এসেছে রানা। ব্যাগে রয়েছে চার ভাইল পোলিভ্যালেন্ট অ্যান্টিভেনিন, সাথে বড় একটা হাইপডার-মিক। শক ঠেকাবার জন্যে ব্যাগে অ্যান্টিহিসটামিনও আছে। যতোটা সম্ভব স্থির ও অনড় থাকতে হবে ওকে।

দ্রুত কাজ করতে চাইলেও, রানা উপলব্ধি করলো, কোনো কাজই ঠিকমতো করতে পারছে না। এরইমধ্যে শরীরে বিষের প্রতিক্রিয়া অনুভব করছে ও। আরেকটা জিনিস বিঘ্ন সৃষ্টি করলো কাজে। দর-জার বাইরে, ঢালু র‍্যাম্পে, স্বচ্ছ প্লাস্টিকের ফ্ল্যাশ শীল্ডটা পড়ে রয়েছে। দরজা দিয়ে বেরোবার সময় হেনেরিক মুলারের কাছে ছিলো ওটা।

হেলমেটটার ভেতর একটা হাত রয়েছে। আরো সামনে পড়ে রয়েছে একটা বুট, বুটের ওপরে বেরিয়ে রয়েছে সরু মাংসের ফালি আর শিরা। চারদিকে শুধু রক্ত আর রক্ত।

স্বস্তির একটা পরশ অনুভব করলো রানা। মুলারকে জীবিত পেতে চেয়েছিল ও। তবে এ-ও মন্দ হয়নি।

ইঞ্জেকশন নেয়ার পর ব্যাগের ওপর মাথা দিয়ে লম্বা হলো রানা। কারমান আভারোর কথা মনে পড়ে গেল ওর। 'যদি সাথে সাথে অ্যান্টিভেনিন নেয়া যায়, বেঁচে যাবার সম্ভাবনা শতকরা পঞ্চাশ ভাগ।'

বেঁচে থাকার সম্ভাবনা পঞ্চাশ ভাগ, তাই বা মন্দ কি—ভাবলো রানা। ইহলোক বা পরলোক, ওর জন্যে দুটোই সমান। জীবন থাকলে, সেখানে কিছু দায়িত্ব আর কাজ থাকবে। নিজের দায়িত্বের ব্যাপারে সিরিয়াস, সৎ একজন লোকের তাহলে আর চিন্তা কি? জ্ঞান হারাবার আগে একটা শব্দ শুনলো রানা। হেলিকপ্টার?

'আমার ধারণা, বিষক্রিয়ায় আপনার মতিভ্রম ঘটেছিল,' বললেন কর্নেল বেনিন। হাসিখুশি আর তৃপ্তির ভাব ফুটে রয়েছে তাঁর চেহারায়, একজন অসুস্থ লোকের বিছানার পাশে সাধারণত যা দেখা যায় না। 'সাপ কামড় দেয় নিজেকে বাঁচাবার প্রয়োজনে। মরা বা আহত সাপ, ওটা কেন আপনাকে কামড়াতে যাবে? তবে, রেকর্ড আছে, তারও রেকর্ড আছে। গলা কেটে ফেলা হয়েছে, তারপরও কামড়ে দিয়েছে সিটাডেলিস। নাগালের মধ্যে পেলে, খোঁচা মারলে কামড়াবে না? আরো আশ্চর্য কথা হলো, আমি শুনেছি, সাপটা মারা যাবার পঁয়তাল্লিশ মিনিট পরও বিষটা মারাত্মক।'

সাপ আর সাপের বিষ সম্পর্কে এ-ধরনের কতো যে গল্প লেটিসি-

যায় শুনেছে রানা তার ইয়ত্তা নেই। এখন আবার মেডিলিনেও শুনতে হচ্ছে। একটা গল্প বারবার শুনতে হয়েছে ওকে। এক যুবতীর স্বামীকে সিটাডেলিস কামড়ে দেয়। 'ঈশ্বর, আমাকে কেন কামড়ালো না!' বলতে বলতে স্বামীর সেবা করেছে সে। ক্ষতটা পরিষ্কার করার সময় তার আঙুলের ডগায় খানিকটা বিষ লাগে। মশলা পেষার সময় সেই বিষ মিশে যায় হলুদ আর আদায়। সেই হলুদ আর আদা দিয়ে তরকারি রান্না করে খায় বউটা। স্বামী মারা গেল, তার সাথে মারা গেল সে-ও। ঈশ্বর তার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করলেন।

মেডিলিনে আসার পর আগের চেয়ে অনেক সুস্থ বোধ করছে রানা। রক্তবমি বন্ধ হয়েছে। গোড়ালির ওপরের ক্ষতটা এখনো পুরোপুরি শুকায়নি বটে, তবে আগের সেই দগদগে ভাবটা নেই। 'ডাক্তার বলেছে, সাপের বিষে আমার হয়তো আর কখনো ক্ষতি হবে না। ভাবছি ব্যবসায় নেমে পড়বো কিনা। ভয় না পেয়ে সিটাডেলিস নাড়াচাড়া করতে পারে, এমন লোক ক'জন আছে?'

আবার একগাল হাসলেন কর্নেল। গোলাপের তোড়া নিয়ে কেবিনে ঢোকার সময় প্রথম হেসেছিলেন। তোড়াটা এতো বড় যে আর কোনো জায়গা না পেয়ে রাখতে হয়েছে রানার বিছানার ওপর, বিছানার এক চতুর্থাংশ দখল করে রেখেছে ওটা। তোড়াটা পাঠিয়েছেন আলিজান আকরাম, সশরীরে উপস্থিত হতে না পারার জন্যে একটা চিরকুটে দুঃখ প্রকাশ করেছেন তিনি। বৃদ্ধ ভদ্রলোক অনেকদিন থেকে ক্যান্সারে ভুগছেন। ক'দিন হলো হঠাৎ করে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন।

'এদিকের আর সব খবর কি?' জানতে চাইলো রানা।

গড় গড় করে বলে গেলেন কর্নেল বেনিন। অবশেষে ভিক্টর লজেনকে যুক্তরাষ্ট্রে পাঠানো সম্ভব হয়েছে। ডি. ই. এ. নিজেই তাকে একটা

ফোনে করে সরাসরি টাম্পা শহরে নিয়ে গেছে। তবে লাস আনিমাস বিধ্বস্ত হবার কাহিনী কোনো খবরের কাগজে ছাপা হয়নি। কারণটা বুঝতে পারলো না রানা।

'সরকারকে শুধু শুধু বিব্রত হতে হবে,' ব্যাখ্যা করলেন কর্নেল। 'এ-ধরনের বড় সাইজের একটা অপারেশন সরকারী এজেন্সিগুলোর অগোচরে সংঘটিত হলো, স্বীকার করার মধ্যে অসুবিধে আছে। তাই খবরটা চেপে যাওয়া হয়। তবে, চিন্তা করবেন না, আমাজনে আরো অনেক লাশ ভাসবে।'

ডি. এ. এস.-এর প্রতি কৃতজ্ঞ রানা। সময় মতো পৌঁছে ওর প্রাণ বাঁচিয়েছে তারা। তাড়াতাড়ি হাসপাতালের সেবা না পেলে কি ঘটতো বলা যায় না। ইতোমধ্যে সমস্ত আয়োজন শেষ হয়েছে, গুরুতর কিছু ঘটলে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে জীবিত অবস্থায় কলম্বিয়া ত্যাগ করতে পারবে বলে আশা করছে রানা।

'আপনাকে একটা কথা জানানো হয়নি,' বললেন কর্নেল। 'লাস আনিমাসে একটা লাশ আমরা চিনতে পেরেছি। বিস্ফোরণের ধাক্কায় জঙ্গলের কিনারায় গিয়ে পড়েছিল সে। লোকটার নাম ব্রাণ্ট হাইন-ম্যান। সন্ত্রাস সৃষ্টি করার জন্যে ইটালি সরকার অনেক দিন থেকে খুঁজছিল তাকে। মিলানের রেল-স্টেশন উড়িয়ে দেয়ার অভিযোগ ছিলো তার নামে।'

'কার্টেল আসলে আন্তর্জাতিক সংগঠন,' বললো রানা। 'গোটা দুনিয়া থেকে লোক সংগ্রহ করেছে তারা। জানা কথা, ধর্মঘটের সময় ব্যাপক দাঙ্গা-হাঙ্গামার প্ল্যান করছিল ওরা। এখন বোধহয় আর তা করতে পারবে না।'

'কার্টেল মুখ থুবড়ে পড়বে, ভাবতে ভালোই লাগে,' বললেন

কর্নেল। 'কিন্তু ধর্মঘট প্রত্যাহার করা হয়নি। তবে আশার কথা হলো, সেই লোকটা, ওদের লিডার, বেঁচে নেই।'

'মানুষটা বেঁচে নেই, ঠিক ; কিন্তু তাঁর মেথড বা পদ্ধতিটা তো থাকবে—কারো শিখে নিতে অসুবিধে কি ?'

'কোনো অসুবিধে নেই,' গম্ভীর সুরে বললেন কর্নেল। 'লোকটা যতো না বিপজ্জনক ছিলো, তারচেয়ে অনেক বেশি বিপজ্জনক তার পদ্ধতিটা।'

সমস্যাটা কর্নেল বুঝতে পারছেন দেখে খুশি হলো রানা। কার্টেলের ক্ষমতা কমে গেছে, এ-কথা মনে করার কোনো কারণ নেই। সারা দুনিয়ায় যতো কোকেন সরবরাহ করা হয় তার শতকরা আশিভাগ সরবরাহ করে কার্টেল। কোকেন ছাড়া অন্যান্য ড্রাগও সরবরাহ করে তারা। তাদের টাকা আছে, ক্ষমতা আছে, আছে শক্তিশালী সংগঠন। বিবেকের ধার না ধেরে এ-সব তারা ব্যবহার করতেও আগ্রহী। 'আপনাকে সতর্ক থাকতে হবে, কর্নেল,' বললো রানা। 'আবার ওরা আঘাত করবে।'

'আমি জানি,' চেয়ারে নড়েচড়ে বসলেন কর্নেল। 'হাতটা বাড়িয়ে দিলেন রানার দিকে। 'ধন্যবাদ, মিঃ রানা।'

'গুড বাই, কর্নেল।'

হাসিমুখে কেবিন থেকে বেরিয়ে গেলেন কর্নেল বেনিন।

পরদিন ধর্মঘট। সেদিনই কলম্বিয়া ত্যাগ করলো রানা।

সরকারের বিরুদ্ধে, সরকারের এক্সট্রাডিশন নীতির বিরুদ্ধে একদিনের ধর্মঘট আহ্বান করেছে কার্টেল। মেডিলিন শহরের মাঝখানে কয়েক হাজার দাঙ্গাবাজ লোক জড়ো হলো। ওখান থেকে জঙ্গী মিছিল নিয়ে

সরকারী অফিস পাড়ায় হামলা চালালো তারা। অচল করে দিলো গোটা শহর। শুধু মেডিলিন নয়, অন্যান্য শহর থেকে একই ধরনের রিপোর্ট আসতে লাগলো। কার্টেল দাবি করলো, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে এক্সট্রাডিশন চুক্তি বাতিল করতে হবে।

ধর্মঘট সফল হবার পর আরো শক্তি সঞ্চয় করলো কার্টেল। এরপর তারা সতর্কতার সাথে বাছাই করে একের পর এক খুন করতে শুরু করলো বিচারকদের। এক্সট্রাডিশন চুক্তি বলবৎ হবার পর তেরোজন প্রথমশ্রেণীর ড্রাগ ব্যবসায়ীকে গ্রেফতার করে যুক্তরাষ্ট্রে পাঠানো হলো বিচারের জন্যে। কলম্বিয়ান সুপ্রীম কোর্টেরও তেরোজন বিচারপতি খুন হলেন কার্টেলের হাতে। উনিশ শো সাতাশির মাঝামাঝি সময়ে, কয়েকটা কোর্টের সম্মতি পেয়ে, এক্সট্রাডিশন চুক্তি বাতিল ঘোষণা করলেন কলম্বিয়া সরকার।

কিছুদিন কর্নেল বেনিনের সাথে যোগাযোগ রাখলো রানা। ডি. এ. এস.-এর চাকরিটা ছাড়েননি তিনি, তবে রাজনীতিতে নতুন ক্যারিয়ার গড়ে তোলার জন্যে কাজ করছেন। আগামী বার নির্বাচনে দাঁড়াবেন। জনসভায় দাঁড়িয়ে শপথ নিয়েছেন, নির্বাচিত হতে পারলে কার্টেলের বিরুদ্ধে জীবনমরণ সংগ্রামে অবতীর্ণ হবেন।

তাঁর সম্পর্কে শেষ খবর পেলো রানা, নির্বাচন প্রচারাভিযানে বেরিয়েছিলেন তিনি। বুকারামাঙ্গা শহরে এসে, স্ত্রী ও সন্তানদের সামনে অজ্ঞাতপরিচয় আততায়ীর হাতে প্রাণ হারিয়েছেন।

—ঃ শেষ ঃ—